কবিতা সমগ্র ৩ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতা সমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতাসমগ্র

৩

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৮

ISBN 81-7215-851-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৭৫.০০

শিখা ও সুব্রত রুদ্র-কে

ভূমিকা

এই তৃতীয় খণ্ডে আমার সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'সেই মুহূর্তে নীরা' ব্যতীত আর সব গ্রন্থই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আরও অনেক কবিতা রয়ে গেছে অগ্রন্থিত, তারও কিছু দুষ্প্রাপ্য আর কিছু আমার আর পছন্দ হয় না। এক সময় আমি নানা দেশের বিংশ শতাব্দীর কবিতা অনুবাদ করেছিলাম, সেগুলি সংকলিত হয়েছে 'অন্য দেশের কবিতা' নামে। এই কবিতা সমগ্রের কোনো খণ্ডেই সেই বইটিকে স্থান দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

একটি কথা এখানে নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, এর পরবর্তী খণ্ড সুদূর পরাহত। অন্তত এ শতাব্দীতে নয়।

২৫-৩-৯৮



গ্র ন্থ সূ চি

স্মৃতির শহর ১১
সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে ৪৫
বাতাসে কিসের ডাক, শোনো ৮৭
নীরা, হারিয়ে যেও না ১২৫
সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর ১৭৩
রাত্রির রঁদেভু ২১৭

কাব্যপরিচয় ২৭১
প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি ২৭৩

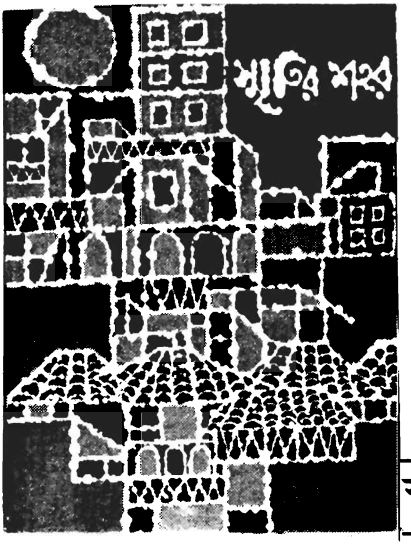

স্মৃতির শহর

স্মৃতির শহর ১

আমাকে টান মারে রাত্রি-জাগা নদী
আমাকে টানে গূঢ় অন্ধকার
আমার ঘুম ভেঙে হঠাৎ খুলে যায়
মধ্যরাত্রির বন্ধ দ্বার।

বাতাসে ছেঁড়া মেঘ, চাঁদের চারপাশে
সহসা দানা বাঁধে নীল সময়
বাইরে এসে,দেখি পৃথিবী শুন্‌শান্‌
রাস্তাগুলি যেন আকাশময়।

প্রথম ডেকেছিল মধ্য কৈশোরে
পাগল করা এক ব্যথার দিন
শরীরে বেজেছিল সমর বিউগ্‌ল
প্রথম স্বপ্নেরা হলো স্বাধীন।

চক্ষে কেউ নেই তবুও বিচ্ছেদ
পাইনি কেন তাকে চিনি না যাকে
তখন মনে পড়ে নিশীথ-সংকেত
দুরাশা ঘুরে ফেরে নদীর বাঁকে।

শাসন বন্ধন তুচ্ছ হয়ে গেল
আমার চেনা পথ গোলক ধাঁধা
দৃষ্টি বিভ্রম সীমানা ছুঁয়ে যায়
খড়্গে কেটে দিই অলীক বাধা।

এদিকে সোনাগাছি কাচের ঝন্‌ঝন
পেরিয়ে চলে যাই আহিরিটোলা
নতুন ঘ্রাণ মাখা শহর কেঁপে ওঠে
পূর্ব পশ্চিমে দুনিয়া খোলা।

এখন জেগে ওঠে কীট ও কুসুমেরা
আঁধার শুষে নেয় দিনের তাপ
জ্যোৎস্না রেণু ওড়ে, ধুলোয় হীরেকুচি
এখন ছুটি নেয় পুণ্য পাপ।

দু'পাশে গলি ঘুঁজি হোঁচট লাগে পায়
পল্‌কা সংসার এখানে কার?
জন্ম মৃত্যুর প্রগাঢ় কৌতুকে
হাসি ও কান্নার সারাৎসার।

এ যেন নিশিডাক, মৃতের হাতছানি
এ যেন কুহকের অজানা বীজ
এমন মোহময় কিছুই কিছু নয়
হৃদয় খুঁড়ে তোলা মায়া-খনিজ।

আমাকে যেতে হবে এখনো যেতে হবে
রয়েছে অশরীরী অপেক্ষায়
যেখানে ব্যাকুলতা ঢেউয়ের তালে দোলে
যেখানে ধ্বনিগুলি স্মৃতিকে খায়।

পথের রাজা এক নগ্ন মহাকাল
ধরেছে মুদারায় ডাগর গান
হেঁতাল দণ্ডটি আকাশে তুলে ধ'রে
সে যেন নিতে চায় সাগর-ঘ্রাণ।

একটু নিচু হয়ে দিয়েছি সম্মান
আবার সরে গেছি অপর দিকে
পারিয়া কুকুরেরা অবাক চোখে দেখে
গাছের মতো এই মানুষটিকে।

দুদিকে মন্দির, গরাদে ভীমতালা
কালীর স্তনঘেরা পিঁপড়ে রাশি
প্রদীপে মৃদু আলো, সিঁড়িতে বেজে ওঠে
কুষ্ঠরোগিণীর শুকনো কাশি।

একলা শালপাতা আপন মনে ওড়ে
পুজোর গাঁদা ফুল ধুলোয় মাখা
একটি ঘুমচোখ বালক হিসি করে
দেয়ালে রমণীর শরীর আঁকা।

এবারে দেখা যায় শ্মশানে উৎসব
আগুন জবা রং, গুঞ্জরন
ছায়ার কোলাহল, ছায়ার ঘোরাফেরা
ব্যস্ত নিরাকার মানুষজন।

এখানে রাত নেই, এখানে দিন নেই
থেমেছে চুম্বকে আয়ুর ঘড়ি
মৃতেরা হেসে ওঠে, জীবিত উদাসীরা
হেলায় ছুঁড়ে দেয় পারের কড়ি।

গাঁজার বীজ ফাটে, শিবের শিষ্যেরা
বৃত্তে বসে আছে ছবির প্রায়
যমজ ত্রিভুজের চূড়ায় লাল আলো
জোনাকি ফুটে ওঠে নদীর গায়।

চোখের চেয়ে আরও অনেক বড় দেখা
দৃশ্য ঘুরে যায়, ঘোরে বাতাস
ধোঁয়ার মৃদু জ্বালা শোকের রলরোল
বাষ্প-অশ্রুতে রুদ্ধশ্বাস।

জলের কাছে যাই, সেখানে কেউ নেই
সেখানে শুয়ে আছে নদীর কায়া
আমাকে ডেকেছিল স্বপ্ন ছেঁড়া এক
পাহাড়-কুন্তলা গভীর ছায়া।

ছায়াও জেগে ওঠে জলের সশরীর
শহর বিস্মৃত আকাশলীনা
আমার করতল দেয় ও নেয় কিছু
জীবন কেটে যায় তাকে ভুলি না।

স্মৃতির শহর ২

দুপুরে শুনশান্ হয়ে পড়ে থাকে হরি ঘোষ স্ট্রিট
যেন সাঁওতাল পরগনার কোনো ঘোলাটে জলের নদী
বাড়িগুলো বালিয়াড়ি, ভেতরে ধিকধিক করে জ্বলছে আগুন
তিন বাড়ির তিন ঝি মেছেতা পরা মুখে পরস্পরকে দুয়ো দেয়
তাদের হাতের ছোঁয়ায় অসভ্য বালকের মতন চিৎকার করে টিউকলটা
বাতাস দমকা হয়েই আবার ঝিমোয়, একটা শালপাতার ঠোঙা গড়িয়ে গেল
ভীম ঘোষ লেনে, স্বেচ্ছায় থামলো ঠিক আঁস্তাকুড়ের পাশে
অভয় গুহ রোড থেকে বাঁ দিকে বেঁকলো দুই রাজপুতানী বাসনওয়ালী
তাদের শাড়ির রঙের ঝলমলে ধাঁধিয়ে গেল সূর্যের চোখ
গোয়াবাগানের একটা কুকুর বেপাড়ায় চলে আসতেই দর্জিপাড়ার
মাস্তান কুকুরেরা তেড়ে গলে তাকে, সে বললো, আচ্ছা, দেখে নেবো!

দু'দিক থেকে দুটো গাড়ি আর তিনটে রিকশা চলে যাবার পর আর কেউ নেই
শ্রীরঙ্গম থেকে বেরিয়ে এলো দুজন মানুষ, ধীর গম্ভীর পা ফেলে
এসে দাঁড়ালো রেলের সিটি বুকিং অফিসের সামনে, একজন ফর্সা ও বলিষ্ঠকায়
বাঁ হাতে ধুতির কোঁচা, অন্য হাতের সিগারেট ছুঁয়ে আছে অহংকারী ঠোঁট
অন্যজন বেশ লম্বা ও হাসিমাখা মুখ, চোখ দুটি অন্ধ
জুন মাসের রোদ ধুয়ে দিতে লাগলো সেই দুটি মানুষের শরীর
রূপবাণীর পাশের পানের দোকানে ঝ্যানঝ্যান করছে বেসুরো গান
দোতলা সবুজ বাসের পাঞ্জাবি কন্ডাকটর বাজিয়ে গেল বিকট বাজনা
সেই দু'জন মানুষ যেন কিছুই পছন্দ করছে না, তারা অন্য দেশের মানুষ
দু'জনে দু'দিকে চলে যাবার আগে শিশির ভাদুড়ী বললেন কানা কেষ্টকে
কালকের দিনটা একটু দেখে নাও, তারপর পরশুর কথা ভাবা যাবে।
পাশেই দাঁড়ানো একটি এগারো বছরের ছেলের বুকে সেই কথা গেঁথে গেল
সারা জীবনের জন্য।

স্মৃতির শহর ৩

সস্তায় পেলেন তাই যমজ ইলিশ নিয়ে
বাবা ফিরলেন বাড়ি রাত্তির নটায়।
কয়লার উনুন নিবু নিবু, আমাদের চোখ ঘুম ঘুম

নরেশ সেনগুপ্তকে নিয়ে শুয়ে রয়েছেন মা
বাথরুমের কল থেকে টিপ টিপ জল পড়ছে লোহার বালতিতে
ছাদে এরিয়ালে একটা সাদা প্যাঁচা
আজও বসে আছে
বিউগ্‌ল বাজাচ্ছে কেউ কোম্পানি বাগানে
আর যাই হোক, এ সময় ইলিশের নয়।

নিশ্চয়ই তুমুল সুখ ছিল রাত বারোটা পর্যন্ত
গন্ধ ও গোলমাল মেশা ভাড়াটে একতলা
সমস্ত ছাপিয়ে কেন মনে পড়ে বৃষ্টির মদির
দুনিয়া কাঁপানো বৃষ্টি, জানলার দাপাদাপি
উঠোনে কল্লোল
পাতাল থেকেও যেন উঠে আসে জল
শুনি জলপ্রপাতের শব্দ, পাহাড়ের ঢল
রান্নাঘর মাখামাখি, উনুন বাঁচিয়ে
ছাতা মেলে ধরেছেন বাবা
গম্ভীর ডম্বরু ধ্বনি, ফেটে যায় আকাশের চোখ
যুদ্ধের তাঁবুর মতো যেন এই বিশাল শহর আজ রাতে
হঠাৎ কোথাও উড়ে যাবে
এঁটো হাতে ঢুলতে ঢুলতে মনে হয়
প্রমত্ত গঙ্গাও আজ হয়ে গেছে আড়িয়েল খাঁ
ঝুপঝুপ জমি খেয়ে জোরে ধেয়ে আসছে এই দিকে।

স্মৃতির শহর ৪

ছাতুবাবুর বাজারে চড়কের মেলার মাঝখানে
হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লো বর্গীর মতন বৃষ্টি
একজন মানুষ শূন্যে ঝুলছে
আকাশের বুক ফাটানো বজ্র গর্জনের পর
সে নীচে পড়লো, না উপরে উঠে গেল
কেউ দেখে নি
অকস্মাৎ সেই সন্ধ্যাটির বিদ্যুৎ প্রতিভা
সব দৃশ্যগুলি অদৃশ্য করে দেয়

পলাতক পায়রার সঙ্গে মিশে যায় মানুষ
সকলেই যে-যার রাস্তায় হারিয়ে গিয়ে
খুঁজছে আর একজনকে
খাতায় খাতায় মেয়েমানুষেরা ছুটে যাচ্ছে
রামবাগানের দিকে
আসলে সেটা নিরুদ্দেশের পথ
সেখানে এখন লরি ও ঠেলাগাড়িতে ট্র্যাফিক জ্যাম
লণ্ডভণ্ড মেলা প্রাঙ্গণের বর্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে
এক কিশোরী গলা চিরে ডাকছে, বাবা, বাবা!
কেউ সাড়া দেয় না
বাঁশবাজির নায়ক ততক্ষণে
ছিটকে চলে গেছে অন্য এক শতাব্দীতে!

স্মৃতির শহর ৫

দীপেন বলে গেল, জলটুঙ্গিতে যাচ্ছি,
চলে আসিস!

তখন আমার সময় হয়নি
তখন আমি ঈষৎ ব্যস্ত ছিলুম যোষিৎ-চর্চায়
কফি হাউসের ধোঁয়া ও গুঞ্জরনের মধ্যে বসে থেকেও
নিরুদ্দেশে যাবার কোনো বাধা ছিল না
বাইরে দু' চারটে বোমার শব্দ শুনলেও মনে হয়
ও কিছু নয়!
নদীর স্রোতের মতন মিছিল আসে ও যায়
আমিও এক মিছিল থেকে
ঘাটের পৈঠায় উঠে বসেছি
পায়ে এখনো লেগে রয়েছে ঝিনুক-ভাঙা রক্ত
শিরদাঁড়ায় শোঁয়াপোকার মতন ঘাম
এই সময় পোশাক বদলাবার মতন
চরিত্রটাও কিছুক্ষণের জন্য বদলে নিতে হয়!
কফি হাউসের সবচেয়ে রূপবান পরিচারকটি
ডেকে তুললো আমায়
ঈষৎ হেসে বললো, আর কেউ নেই

সময় চলে গেছে।
আমি কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম?
চোখ-মেলা শূন্যতায় শুধু চোখে পড়লো
আমায় ঘিরে রয়েছে পাতলা সবুজ বাতাবরণ
এবং এক চতুষ্কোণ অন্ধকার সীমারেখা
সমস্ত চেয়ার ও টেবিলগুলি নগ্ন
শত শত বিশ্বাস ও কলস্বর বিবর্জিত
এই স্থানে আমি আগে কখনো আসিনি
যেন আমাকে নির্বাসন দিয়ে সবাই
আত্মগোপন করেছে
আমার পকেটে একটি পয়সা নেই
সিগারেট-দেশলাই নেই
কোনও ঠিকানা লেখা কাগজ নেই
বুক পকেটের অতি পরিচিত কলমটি নেই
এমনকি কপাল থেকে হিজিবিজি মুছে ফেলবার জন্য
রুমালটি পর্যন্ত নেই
সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে পা-জামা ও পাঞ্জাবি পরা
আমার একুশ বছরের শরীর
দরজার কাছে সেই চেনা মুখটিও নেই
দোকান বন্ধ করে ইসমাইল চলে গেছে কোথাও
ধোঁয়ার মুখশুদ্ধি এখন কেউ ধারও দেবে না
আমার হাতে ঘড়ি নেই
আকাশে চন্দ্র-নক্ষত্র নেই
পথের বাতিগুলো নেভানো
যেন এক খণ্ডযুদ্ধের পর কবরখানায় নিস্তব্ধতা।

এই রকম সময়ে নিঃস্বতাও এক রকম অহংকার
এনে দেয়
যেন এই জনশূন্য কলেজ স্ট্রিটের আমিই রাজা
আমি এখন হাততালি দিয়ে বলতে পারি,
কোই হ্যায়?
আমার নির্দেশে এখানে শুরু হতে পারে বহ্ন্যুৎসব
ঝাঁপফেলা দোকানগুলোর ভেতর থেকে
মৃত গ্রন্থকারেরা কৌতূহল মেশানো ভয়ে
উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছেন আমাকে
ছাপা অক্ষর ও শব্দের এই জগৎটিকে একটুখানি

ঝাঁকিয়ে দেবার জন্য
আমি ডান হাত উঁচু করতেই
আমার সামনে এসে দাঁড়ায় একটি পুলিশের গাড়ি
আমি প্রেতাত্মার মতন হেসে উঠি
তারা আমাকে প্রকৃত প্রেতাত্মাই মনে করে হয়তো
তাদেরই হাতে নিহত কোনো শব থেকে
যে উঠে এসেছে
বস্তুত আমারই সম্মানে যে ঘোষিত হয়েছে সান্ধ্য আইন
তা তারাই জানিয়ে দেয়
পুলিশের পোশাক পরা চারখানা মানুষের
বুক থেকে শব্দ ওঠে হাপরের মতন
তারা প্রত্যেকেই কারুর পিতা কিংবা ভাই কিংবা পুত্র
এই নির্জনতায় হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেই কথা
অতি দ্রুত বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তারা ব্যস্ত
তাদের গাড়ির ইঞ্জিনে অবিকল কান্নার শব্দ।

গোলদিঘির রেলিং-এ কিছুকাল ভর দিয়ে
দাঁড়িয়ে থাকার পর
স্মৃতিতে কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ ফিরে আসে
দীপেন বলেছিল
জলটুঙ্গিতে দেখা হবে।
কোথায় সেই জলটুঙ্গি, কত দূরে?
ভালোবাসার মতন প্রচ্ছন্ন এক জলাভূমি
রয়েছে এই শহরের হৃৎপিণ্ডে
তার মাঝখানে কাঠের টঙের মাথায় ছোট কুঠুরি
সেখানে বন্ধুরা বসে আছে গোপন বৈঠকে
সিগারেটের ধোঁয়ায় কারুর মুখ দেখা যায় না
সেখানে সাবলীল চা আসে কবিতার লাইনের মতন
পারস্পরিক উষ্ণতায় কেটে যায় শীত
আমার বুক মুচড়ে উঠলো
এক যৌবনব্যাপী উত্তেজনা
আমায় যেতে হবে, যেতে হবে
আমি রাস্তা চিনি না, আমায় যেতে হবে
আমার অন্য আস্তানা নেই,
পৃথিবীতে আর কোনো আত্মীয় নেই
আমায় সেই জলটুঙ্গিতে যেতে হবে!

স্মৃতির শহর ৬

মাঠের ভিতরে এত পরিশুদ্ধ ঘর বাড়ি, এ সব কাদের?
কাঠবিড়ালি ও ভোমরা, সদ্য বিবাহিত পাখিদের!
মাঠের কি স্মৃতি নেই, মনে নেই তার বাল্যকাল
এইখানে শুয়ে ছিল বাপ-মা খেদানো এক
উদাসী রাখাল
কিছুটা জঙ্গলও ছিল, পাতা-ঝরা গান হতো শীতে
একটি জারুল সব লিখে গেছে আত্মজীবনীতে।
পাথর-পূজারী এক সন্ন্যাসীর স্বপ্ন ছিল, ঘুম ছিল,
দুঃখ ছিল বেশি
জ্যোৎস্নার মতন হাসি সঙ্গিনীটি বিশ্বাসঘাতিনী এলোকেশী!
সেই পাথরেরও ছিল অনেক জমানো গুপ্ত কথা
পিঁপড়েরা সব জানে, মাটির গভীরে আজও জমে আছে
ওদের ভাষার নীরবতা.....

এ সবই পুরোনো ইতিকথা, সেই দুঃখী সন্ন্যাসীর বংশধর
এখন তোফায় আছে, পগেয়াপট্টির এক নিত্য
সওদাগর
রাখালেরও উত্তরাধিকার আছে, রাজমিস্ত্রি,
মজুর জোগাড়ে
লাল-নীল-সোনালি হর্ম্যেরা জাগে কয়েকটি
মহিষরুক্ষ ঘাড়ে
প্রতিটি জানলায় পর্দা, আজও বারান্দার টবে রয়েছে প্রকৃতি
কাঠবিড়ালিরা ঘোরে সাইকেলে, ভোমরার গুঞ্জনে রাষ্ট্রনীতি
পাহাড়ের পাঁজরা ভাজা মোরামের রাজপথ, আর কিছু
খুন্‌সুটি গলি
সংসারী পাখিরা ছোটে ভোর বেলা, ঠোঁটে ঝোলে
বাজারের থলি!

স্মৃতির শহর ৭

জানলা ছুঁয়ে একটুখানি দেখিয়ে দিলে চাঁদ
হায় কুয়াশা, সর্বনাশী মায়া
এ যে বিষম দৃষ্টিভুলো, এ যে বিষম জ্বালা
হায় দুরাশা, অনুদ্ধারণীয়া!

অনেকদিন ছন্নছাড়া নদীর ধারে বাসা
শরীর যেন বেড়াতে গেছে দ্বীপে
ছিল অনেক প্রজাপতির পাখ্না ঝাড়া ধুলো
কথার ছলে কপাল খুলে রেখে।

ভেবেছিলাম চাঁদ মেখেছে ধুতরো ফুলের আঠা
যারা নেবার তাদের জিভে সুখ
এ যে আগুন পুষ্পবৃষ্টি, এ যে কঠিন কুহক
হায় নিয়তি, অয়স্কান্ত মণি!

স্মৃতির শহর ৮

মধ্যরাত্রির খটখটে জেগে ওঠার মধ্যে তোমার স্বপ্ন দেখি
হে গাঢ় নীল জ্যোৎস্নার মতন বিচ্ছেদ-বেদনা
হে বরাকর বাংলোর মতন ঝুঁকে পড়া অপরাহ্ন
হে প্রচ্ছন্ন অভিমান!

মনে পড়ে ওভার ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে হলুদ হাতছানি
দেবী সরস্বতীর স্তনের মতন রাঙা-রাঙা চাঁদ
একটি টিট্টিভের ডাক
দেবদারু পাতার সরসর শব্দে জেগে ওঠে যৌবনের একটি দিন
একটি বৃন্তচ্যুত অনিত্য
কলেজ-পালানো কিছু ভালো-না-লাগা রাস্তা
আমায় নিয়ে যায় ছন্নছাড়া দেশে
যেখানে হঠাৎ ঝলসে ওঠে অলৌকিক বাস্তব
দিগন্তের পাহাড় মেলে দিয়েছে তার ঐশ্বর্যময়ী উরু

বুক জ্বলা নেশা নয়, এমনই একাকিত্ব
লণ্ঠন দুলিয়ে দুলিয়ে একজন কেউ চলে যায়, সে আর ফিরবে না
কালোর হৃদয় চেরা কালো, তারও ভেতরের নিবিড় সরল কালো
অবিকল একটি শিশুর মতন
লাফিয়ে পড়ে নদীর জলে
সে আমার বাতাসে উদাস করা মন-খারাপ!

সমস্ত নিস্তব্ধতার ভেতর থেকে ঐরাবতের মতন উঠে আসে
আমার পরাজয়
হে আমার দিগন্ত কুন্তলা মৃত্যু, হে ভোগবতী
সেই টিলার শিয়রে সন্ধ্যায় সর্বাঙ্গে বৃষ্টির মতন শিহরন
বড় প্রিয়, যেন শুধু চোখে চোখ রাখা
জেগে উঠি মধ্যরাত্রে, যাকে না-দেখার
তাকে স্বপ্নে দেখি।

স্মৃতির শহর ৯

তেলীপাড়া লেনের ভূতের বাড়িটার তিন তলার জানলা খোলা
কাল বন্ধ ছিল, সারা জীবনই বন্ধ দেখেছি।
শীতের রাত্তিরে বাইরে আঁচাবার সময় কে যেন আঁচড়ে দিল বাহু
সাদা সাদা সমান্তরাল দাগ কিন্তু ব্যথা লাগে না
আজ রাত্রে লেপতোশক ভিজে যাবে
ঠিক রাত আড়াইটেয় ডেকে উঠবে নিশি, অরুণ! অরুণ!
উত্তেজিত পুরুষাঙ্গে হাফ প্যান্ট তাঁবু হয়ে যায়,
তবু ভয় যায় না—

অরুণকে আর দেখিনি, তাকে ডেকে নিয়ে গেল জব্বলপুর
সে কী রকম দেশ যেখান থেকে আসে না কোনো চিঠি
কেউ জানে না আমি অরুণকে কত ভালোবাসি
চোখের জলের রেখা পড়ে বালিশে।
ঘণ্টাওয়ালা বাড়ি থেকে ভোরবেলা বেজে উঠলো পাগলা ঘন্টি
দমকলের চেয়েও অবিরাম ঢং ঢং শব্দ
কে যেন বললো, পাগল হয়ে গেছে রামশরন

ইস্কুল যাবার পথে ওদের বাগানে উঁকি দিয়ে দেখলুম
সেই ডানাওয়ালা শ্বেত পাথরের পরীটি নেই
সে নিশ্চয়ই উড়ে গেছে জব্বলপুরে, অরুণের কাছে।

স্মৃতির শহর ১০

চীনে পাড়ায় আমাদের বন্ধু ছিল শেখ সুলেমান
তার বিবির নাম ওয়ালিং
একটি লাল কাগজ মোড়া লণ্ঠন ঝুলতো তাদের সংসারে
এরা নিশীথ মানুষ
সূর্যের সঙ্গে এদের বিশেষ চেনাশুনো নেই
এরা জাঁ পল সার্ত্র-এর নাম শোনে নি
কিন্তু সার্ত্র-এর দর্শনকে জীবন্ত করে
এরা দিব্যি বেঁচে চলেছে
সুলেমানের কোনো বাল্যকাল নেই, আগামী কাল নেই
ওয়ালিং-এর আছে একটি ছোট বৃত্ত
এবং সুলেমান, একটি ছাগল ও একটি বাঁদর
এরা বৃষ্টি এবং অন্ধকারকে
অবিকল বৃষ্টি ও অন্ধকারের মতন দেখে
এদের দু'পাশ দিয়ে
নদী এবং নর্দমা সমান ভাবে বয়ে যায়
মনুসংহিতা, হাদিস ও মার্কসের বাণী
ঘুর ঘুর করে এদের খাটিয়ার নীচে।

বেতের মতন ছিপছিপে চেহারা সুলেমানের
তার বয়েসের গাছ পাথর নেই
পুরুষের এমন মেদহীন কোমর আমি আর
দ্বিতীয় দেখিনি
অনায়াসেই সে প্রাচীন গ্রীসের কোনো দেবতা হতে পারতো
কিংবা সে ছিলও তাই
ইদানিং সে কলকাতার ধুলোকে
বারুদ করার কাজে ব্যস্ত
দাড়ি গোঁফ নেই, তার মাথার চুল পাতলা

তার চোখ দুটি প্রকৃত খুনির মতন ঝকঝকে
খালি গা, বারবার লুঙ্গিতে গিঁট বাঁধা তার মুদ্রাদোষ
চিড়িক করে লম্বা থুতু ফেলে সে সমস্ত
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে
আমরা মুখোমুখি দুই খাটিয়ায় বসি
সে আমাদের গেলাসে ঢেলে দেয় সামসু
তখন টিনের চালের ওপর থেকে চ্যাঁচামেচি করে
ওয়ালিং-এর বাঁদর
সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতন প্রথম সে
লাফ দিয়ে ওঠে ল্যাম্প পোস্টে
তারপর সরসরিয়ে নেমে এসে সে দেখায় তার চতুর মুখ
আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে সমান হয়
এবং হাত বাড়ায়
তাকেও দেওয়া হয় একটি গেলাস
ওয়ালিং-এর ছাগলও ডাকাডাকি শুরু করলে
গেলাসের বদলে তাকে দেওয়া হয় টিনের বাটি
ওয়ালিং এক এক সময় আলোয়
এক এক সময় অন্ধকারে
সে আমাদের জন্য চিংড়িমাছের বড়া ভেজে আনে
সেই কর্কশ মদ্য পান করতে করতে
আমাদের অতি আপন সন্ধে
মধ্য রাতের দিকে ছোটে

সুলেমানের দু'একটি কথা শুনলেই বোঝা যায়
সে অনেক রকম আগুনে মুখ আচমন করেছে
সে হাতে মেখেছে মানুষের রক্ত
শরীর হজম করেছে ইস্পাত

এবং সে জানে
খিদে জিনিসটা অতি অপবিত্র এবং
ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই
মৃত্যু তার দূর বিদেশের আত্মীয়
আর জীবন তার পান্তা ভাত ও ডালের বড়া
সে কোনো ধর্মের নাম শোনে নি
যেমন সে কখনো সিল্কের জামা পরে নি
এবং সিল্কের জামারাও সুলেমানকে চেনে না

মাঝে মাঝে ওয়ালিং কী খেয়ালে থমকে গিয়ে
তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ায়
যেন পারিবারিক চিত্র তোলবার জন্য
উল্টো দিকে রয়েছে বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের ক্যামেরা
বাঁদরটি তখন ঈর্ষা জানায়
সে মাথা ঘষতে থাকে ওয়ালিং-এর নিম্ন উদরে
দু'জনের নিজস্ব ভাষায় চলে প্রেম বিনিময়
সুলেমান শুরু করে দেয় পুলিশের গল্প
প্রসঙ্গত এসে যায় বেশ্যা, ফড়ে, চোলাইকারী ও
ছদ্মবেশী উন্মাদেরা।

প্রতিটি বোতল শেষ হলে
ওয়ালিং দাম নিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে
সেই সঙ্গে সে দেয় আশ্চর্য সুন্দর বিনে পয়সার হাসি
খাটিয়ায় পা দোলাতে দোলাতে
আমরা তিন বন্ধু ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠি
একটু নেশা হলেই বাঁদরটি কান্না শুরু করে
ছাগলটি গান গায়
যতই রাত বাড়ে ততই ওয়ালিং-এর
হাসিতে ফোটে খই
চীনা মেয়েদের তুলনায় বেশ বড় তার স্তনদ্বয়
হাসির সঙ্গে তাল রেখে দোলে
মধ্য কলকাতায় বসে আমরা পৌঁছে যাই
সাঁওতাল পরগনায়
প্রাণ যেখানে তরুণ শাল গাছের মতন আকাশমুখী
খুশি যেখানে পলাশ গাছে ঝড়
এরই মধ্যে কখন সেই ঘরের সামনে এসে থামে
ব্লাক মারিয়া
তার থেকে নামে সুলেমানের গল্পেরই কোনো চরিত্র
সে সুলেমান ও ওয়ালিং-এর বদলে
আমাদের দিকেই নজর দেয় বেশি
আর আমরা তিন বন্ধু এমনই গ্রেফতার-পরায়ণ যে
সাব ইনস্পেকটার দেখলে একটুও অস্থির হই না
তার দিকেও আমরা গেলাস বাড়িয়ে দিই
অথবা পাঁচ টাকার নোট
এক একদিন অবশ্য গোঁয়ারের মতন আমাদের

নিয়ে যায় ফাঁড়িতে
পরের সন্ধ্যেবেলা সুলেমান জিজ্ঞেস করে,
দেশলাই ফেলে গেলে,
আগুন ঠিক মতন পেয়েছিলে তো?

এখান থেকে আধ মাইলের মধ্যে রয়েছে
ফাট্‌কা বাজার ও বারোয়ারি মহাকরণ
সুসজ্জিত দাস-ব্যবসায়ীদের হল্লা চলে ওখানে সারাদিন
লাইফইনসিওরেন্স ও প্রভিডেন্ট ফান্ড
গুলিচালনা ও দুর্ঘটনা
জন্মান্ধদের হাস্য পরিহাস
পরগাছা ও পরভৃতিকদের সাঙ্কেতিক সংলাপ
অলীকের উত্থান-পতন
সকলেই অন্যের তাওয়ায় রুটি সেঁকে নিতে চায়
অথচ প্রতিদিন ভোরে বিলি হয়
কপাল কোঁচকানো খবরের কাগজ
বিমান উড়ে যায়, মাতৃগর্ভের শিশুও
সেই গর্জন শোনে
চাঁদের দিকে ছুটে চলে
লক্ষ লক্ষ বাদলা পোকা
নদীর দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে যায় দুঃখী ধীবরদের
পৃথিবী চলেছে তার নিজের নিয়মে।

আসলে তিনজন সুলেমানের মধ্যে
একজনই শুধু বেঁচে আছে
অন্য দু'জনকে খুন করে।

তিনজন ওয়ালিং-এর মধ্যে একজনই শুধু
পেয়েছে তার নির্ভরযোগ্য পুরুষকে
বাঁদর ও ছাগলদের সে সমস্যা নেই
কে মরে কে বাঁচে ওরা তা জানে না
সুলেমান উরু খুলে তার ছুরিটি শান দেয়
ওয়ালিং-এর বুক চাটে লাল লণ্ঠনের আলো
ওরা দু'জনে মিলে এক বিশাল বেঁচে থাকার
বিজ্ঞাপন
পাকা বাড়ির তিনটি কাঁচা ছেলে ওদের দেখে

তারপর তাদের নাম বদলাবদলি হয়
ওদের বিভ্রান্ত মাথায় লাগে রাত্রির শুশ্রূষা
অট্টহাসির সঙ্গে মিশে যায় কান্না
সুলেমান পৃথিবীর উচ্চতম চূড়ায় উঠে
ওড়ায় তার পতাকা
ওয়ালিং দ্বিতীয় বসুন্ধরা হয়ে নাচ শুরু করে
যেন আর সময় নেই
এখনই অদৃশ্য হয়ে যাবে ওরা
ওদের মায়াবী অস্তিত্ব দুলছে হাওয়ার স্তম্ভে
আমরা উঠে তিন দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াই
আমাদের ওষ্ঠে ঝলসে ওঠে বর্ণমালার অস্ত্র
অসীম মহাশূন্যের দিকে ছুঁড়ে দিই
আমাদের বুক ফাটা অনুক্ত গান।

স্মৃতির শহর ১১

উত্তর চল্লিশে হলো দেখা
এত তাড়াতাড়ি? আর সয় না বিরহ?
এই বুঝি তোমার এলাকা
কাঁকর বেছানো পথ বড় স্পর্শসহ।

এঁকেছি অসংখ্যবার মনে
মোহময় মুখখানি, সান্ত্বনা-অঙ্গুলি
জঙ্গলে বা বারান্দার কোণে
মনে আছে, দ্রুত লেখা তীব্র চিঠিগুলি?

ভুল করে এসেছি এখানে
যেন অন্য কারো খোঁজে, অচেনা ঠিকানা
সহসা উঠেছে শূন্য যানে
নীলকে সবুজ ভেবে এক বর্ণ কানা

উত্তর চল্লিশে হলো দেখা
এত তাড়াতাড়ি? আর সয় না বিরহ?
চোখের গভীরে কালো রেখা
মিলনের স্থান শেষে এই কালিদহ!

স্মৃতির শহর ১২

পুরোনো দুঃখগুলো আজকাল মৃদু ঢেউ হয়ে
সুখের মতন ফিরে আসে
তাদের বয়েস ও শরীর আছে
ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে
তারা দেখা হলেও কথা বলে না
তারা নীল সমুদ্রের ধবল আকাঙ্ক্ষার মতন ঘুরে বেড়ায়
তারা মৌসুমী বাতাসকে উড়িয়ে দেয় পাহাড়ের দিকে
রাত্রির নিঃশব্দ দিগন্তে শোনা যায় তাদের মৃদুস্বর
রাজনর্তকীর খসে পড়া ঘুঙুর তারা তুলে দেয়
এক ভিখারির হাতে
আমাকেও তারা ডুবিয়ে দেয় হাজার হাজার হলুদ অক্ষরে
ঘুমের মধ্যে ঘটে যায় বিস্ফোরণ।

স্মৃতির শহর ১৩

সীমান্ত এলাকার মানুষ গদ্যে কথা বলে
বস্তি ও কলকারখানার মানুষ গদ্যে কথা বলে
দিনের বেলায় শহর গদ্যে কথা বলে
সমস্ত সমসাময়িক দুঃখ গদ্যে কথা বলে
শুকনো মাঠ ও রুখু দাড়িওয়ালা মানুষটি গদ্যে কথা বলে
গোটা ছুরি-কাঁচির সভ্যতা গদ্যে কথা বলে
তা হলে কী নিয়ে কবিতা লেখা হবে?

স্মৃতির শহর ১৪

যদি কবিতা লিখে মাঠ-ভর্তি ধান ফলানো যেত
আমি রক্ত দিয়ে লিখতুম সেই কবিতা
যদি কবিতার ছন্দে তৃষ্ণার্ত ভূমিতে ধারা-বর্ষণ হতো
আমি আমার হাড় মজ্জার নির্যাস মিশিয়ে
রচনা করতুম বৃষ্টির বন্দনা স্তোত্র
যদি কবিতা লিখে...
হায়, যদি কবিতা লিখে...
অনেকক্ষণ কান্নার পর ঘুমিয়ে পড়েছে যে শিশু
তার মতন দুঃখ-ছবি আমি আর কিছু দেখিনি জীবনে
যদি কবিতা লিখে...
নিভে যাওয়া উনুনের সামনে কেউ বসে আছে পেটের আগুন জ্বেলে
যদি কবিতা লিখে...
তিল ফুলের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে শোঁয়াপোকার ঝাঁক
যদি কবিতা লিখে...
ম্লান ছায়ায় উড়ে যাচ্ছে যার যার নিজস্ব পৃথিবী
শহর ছেড়ে যখনই যাই পল্লী আঘ্রাণ নিতে
মনে হয় আমি অন্য গ্রহের মানুষ
তোমার কষ্টে আমি গোপনে রোদন করতে পারি
কিন্তু তা কবিতা হবে না
তোমার দুর্দশায় আমি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রাগে গর্জে উঠতে পারি
কিন্তু তা কবিতা হবে না
এ এক মায়া-দর্পণ, কবিতা, এই নিয়ে বিরলে কিছু খেলা
আমায় ক্ষমা ক'রো!

স্মৃতির শহর ১৫

একদিন কেউ এসে বলবে
তোমার বসবার ঘরে একটা চৌকি পাতবার জায়গা আছে
আমি ঐখানে আমার খাটিয়া এনে শোবো
আমার গাছতলা আর ভাল্লাগে না!

একদিন কেউ এসে বলবে
তোমার ভাতের থালা থেকে আমি তিন গ্রাস তুলে নেবো
কারণ আমার কোনো থালাই নেই
আমার অনাহার একঘেয়েমির মতন ধিকধিক করে জ্বলছে
আর আমার ভাল্লাগে না।

গাড়ি বারান্দার তলা থেকে ধুলো মাখা তিনটে বাচ্চা ছুটে এসে বলবে
ওগো, আমরা বাসি রুটি চাই না, পাঁচ নয়া চাই না
আমাদের ছাই রঙের হাফ প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরিয়ে
চুল আঁচড়ে দাও
আমাদের গাল টিপে দিয়ে বলো, সাবধানে—
আমরাও ইস্কুলে যাবো!

একদিন কয়লাখনির অন্ধকার থেকে উঠে আসবে
একজন কালো রঙের মানুষ
সে অবাক হয়ে বলবে
একি, আমার জন্য শোকসভা নেই কেন?
ডিনামাইট নিয়ে আমি গিয়েছিলুম গভীর থেকে আরও গভীরে
আমি ফিরিনি, কিন্তু তোমাদের জন্য আগুন এসেছে
আমার নামে তোমরা কেন নাম রাখো নি শহরের রাস্তার
তবে এসব রাস্তা কাদের নামে, তাদের তো চিনি না।

একদিন ধান খেতে কাদা জল মেখে দাঁড়ানো একজন মানুষ
নিজের চেয়ে আরও অনেক লম্বা হয়ে উঠে গলা তুলে বলবে,
তোমরা যারা কোনোদিন কাদা জল মাখো নি,
মাটিতে শোনো নি কোনো আওয়াজ
জানো না ঘাম-রক্ত-উৎকণ্ঠায় সবুজ হয় সোনালি
সেই তোমরাই শস্য নিয়ে রাহাজানি করো
আর আমার সন্তানরা থাকে উপবাসী, তোমাদের লজ্জা করে না?
আমি আসছি...।

স্মৃতির শহর ১৬

সরস্বতী হাইস্কুলের পেছনের বাড়িটার কলঘরে
ঢুকে বসেছিল একটা শেয়াল
সে কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না
কী করে সে পেরিয়ে এলো শ্যামবাজারের মোড়
কিংবা শোভাবাজারের বিরাট হৈ হল্লা?
কুণ্ডলী পাকানো ল্যাজে মুখ গুঁজে শেয়ালটি কাঁদছিল
অনুতাপের কান্না!

বেলগাছিয়া রেলস্টেশনের কাছে হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো
মহিষাসুরেরই মতন একটা মোষ,
নাদ ব্রহ্মের মতন তার গর্জন, তোলপাড় করতে লাগলো সারা পাড়া
যেন তার হঠাৎ অরণ্যের কথা মনে পড়ে গেছে
যেন সে ফিরে যাবার রাস্তা খুঁজছে!
ঠনঠনের কালীমন্দিরের সামনের নদীতে
মোচার খোলার মতন ভাসছে দুটি নৌকো
খল খল করে হাসছে কাজল-রঙা শিশুরা
একজন ঝুপ করে জলে পড়ে গেল আর উঠলো না
সে পাতালপুরীতে নিজের দেশে ফিরে গেছে।

স্মৃতির শহর ১৭

সদ্য-তরুণটির প্রথম কবিতার বই আমি
হাতে তুলে নিই
ঈষৎ কাঁচা প্রচ্ছদে সবুজ সবুজ গন্ধ
প্রজাপতির মতন হাল্‌কা পাতাগুলি চলমান
অক্ষরে ভরা
শিরোনাম উড়ে যেতে যায়, শব্দগুলি জায়গা বদলাবার
জন্য ব্যাকুল
ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অহংকার-ভয়-লজ্জা-স্পর্ধা
সে কথা বলে না, তার নীরবতা অত্যন্ত বাঙ্‌ময়

আমাকে সে কী চোখে দেখে তা আমি জানি না
কিন্তু আমি তার মধ্যে দেখতে পাই অবিকল আমাকে
চোরা চোখে লক্ষ করি তার জামার কলারের পাশটা
ফাটা কিনা
প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে সে নিশ্চয়ই খুচরো পয়সা গুনছে
আমার ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে জায়গা বদলাবদলি
করে নিতে, এক্ষুনি...

স্মৃতির শহর ১৮

চোখে লেগেছিল কুমারী শবের ধোঁয়া
ডালপালা মেলে কেঁদেছিল নিমগাছ
মধ্যরাতের বাতাস পাগল হলো
কাঠকয়লায় কেউ লেখে ইতিহাস।

তৃতীয় প্রহরে শীত জেঁকে আসে খুব
চিতার আগুনে আমরা পোহাই ওম্
কোনো কথা নেই, কথা গেছে গহ্বরে
মাথার ভিতর রঙিন মেঘের খেলা।

কাউকে চিনি না, কেউ আমাদের নয়
চণ্ডাল এসে ধার দিল কম্বল
ভালোবাসা দিয়ে কেনা যায় সিগারেট
ভালোবাসা দিয়ে জয় হলো সব ঘুম।

সে কি পেয়েছিল, সে কি জেনেছিল সবই
কালো নদীটির জলে নেমে গেল কে?
চোখে চোখে এক চাঁদ ঘুরে ফিরে যায়
চাঁদে ঠিক্‌রোয় আলতা পরানো পা।

স্মৃতির শহর ১৯

আটচল্লিশ হঠাৎ ঝাঁপ দিল ঊনত্রিশের গনগনে আগুনে
ভূমিকম্প বয়ে গেল শ্যামপুকুর স্ট্রিটে
ভেঙে পড়লো মিত্তির বাড়ির নিজস্ব আকাশ
একটা চাঁপাফুল গাছ নাচ শুরু করলে
পাথরের রমণী একটু হাসলো
তখন প্রচণ্ড খিদের দুপুর
তখন সমস্ত প্রতিশোধের বিশাল সুসময়
তখন মাটি থেকে কুড়িয়ে ধুলো বালি মুছে
আমার নশ্বরতাকে আদর করি।

স্মৃতির শহর ২০

কফি হাউসে বসে আমরা একটা পাহাড় ভেঙে পড়ার
শব্দ পাই
আকাশে লাল ধুলো...

পয়ারে ন' মাত্রার পর্ব হয় কি না এই নিয়ে
টেবিল চাপড়ানো তর্ক হঠাৎ থেমে যায়
একটা বারুদ-রঙা নিস্তব্ধতা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়
আমরা সকলেই ভাঙনের প্রবক্তা, ধ্বংসেই আমাদের উল্লাস
ঈশ্বর থেকে সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব বসুর ছন্দ পর্যন্ত
আমরা ভাঙতে ভাঙতে এসেছি
কৃষ্ণনগরের পুতুলের মতন আমরা ভেঙেছি বাবা ও মাকে
প্রেমকে ভেঙেছি অতিরিক্ত শরীর মিশিয়ে
শরীরকে ভেঙেছি আত্মহননের নেশায়
দেশকে যারা ভেঙেছে আমরা মহানন্দে ভেঙেছি তাদের ভাবমূর্তি
কাচের গেলাস ভাঙার মতন সুমধুর শব্দে
আমাদের পায়ের তলায় গুঁড়ো হয়েছে এক-একটা মূল্যবোধ
কিন্তু কলেজ স্ট্রিটের এই পাহাড়টি ভাঙা
আমরা সহ্য করতে পারি না, সহ্য করতে পারি না
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মূর্তির মতন আমাদের মুখেও ম্লান ছায়া

শুধু রাগ ঝলসে ওঠে পূর্ণেন্দু পত্রীর মুখে
ছবির সরঞ্জাম নিয়ে সে উড়ে যায় আকাশে
ক্যামেরার লেন্সে লেগে থাকে তার চোখের জল।

স্মৃতির শহর ২১

নৌকোর গলুইতে পা ঝুলিয়ে বসার মতন প্রিয়
বাল্যকাল ছেড়ে একদিন এসেছিল কৈশোরে
বাবার হাত শক্ত করে চেপে ধরে নিজের চোখের চেয়েও
অনেক বড় চোখ মেলে
পা দিয়েছিলাম এই শহরের বাঁধানো রাস্তায়
ছোট ছোট স্টিমারের মতো ট্রাম, মুখ-না-চেনা এত মানুষ
আর এত সাইনবোর্ড, এত হরফ, দেয়ালের এত পোশাক, ভোরের
কুয়াশার মধ্যেও যেন সব কিছুর জ্যোতি ঠিকরে আসে
আমার চোখে

ঘোড়াগাড়ির জানলা দিয়ে দেখা মুহুর্মুহু ব্যাকুল উন্মোচন
কেউ জানে না আমি এসেছি, তবু চতুর্দিকে এত সমারোহ
মায়ের গা ঘেঁষে বসা উষ্ণ আসনটি থেকে যেন আমি ছিটকে
পড়ে যাবো বাইরে, বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন
বাঁক ঘোরবার মুখেই হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠলো, গুলাবি রেউড়ি, গুলাবি রেউড়ি
কেউ বললো, পাথরে নাম লেখাবেন, কেউ বললো, জয় হোক
তার সঙ্গে মিশে গেল হ্রেষা ও লৌহ শব্দ
সদ্য কাটা রক্তাক্ত মাংসের মতন টাটকা স্মৃতির সেই বয়েস...

তারপর
একদিন আমি নিজেই ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম বাবার হাত
বাবা আমাকে ধরতে এসেছেন
আমি আড়ালে লুকিয়েছি
বাবা আমাকে রাস্তা চেনাতে গেলে
আমি ইচ্ছে করে গেছি ভুল রাস্তায়
তাঁর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে আমার ভয় ভাঙা
তাঁর বাৎসল্যকে ঠকিয়েছে আমার সব অজানা অঙ্কুর

তিনি বারবার আমায় কঠিন শাস্তি দিলে আমি তাঁকে
শাস্তি দিয়েছি কঠিনতর
আমি অনেক দূরে সরে গেছি...

প্রথম প্রথম এই শহর আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল তার
শিহরন জাগানো গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
ছেলে ভোলানো দৃশ্যের মতন আমি দেখেছিলাম রঙিন ময়দান
গঙ্গার ধারের বিখ্যাত সূর্যাস্তে দারুণ জমকালো সব
সারবন্দী জাহাজ
ইডেন বাগানে প্যাগোডার চূড়ায় ক্যালেন্ডারের ছবির মতন রোদ
পরেশনাথ মন্দিরের দীঘিতে নিরামিষ মাছেদের খেলা
বাসের জানলায় কাঠের হাত, দোকানের কাচে সাজানো
কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বই
প্রভাত ফেরীর সরল গান, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বাঁদরদের সঙ্গে পিকনিক
দু' মাসে একবার মামা-বাড়িতে বেড়াতে যাবার উৎসব...

ক্রমশ আমি নিজেই খুঁজে বার করি গোপন সব
ছোট ছোট নরক
কলাবাগান, গোয়াবাগান, পঞ্চাননতলা, রাজাবাজার
চিৎপুরের সুড়ঙ্গ, চীনে পাড়ার গোলোকধাম, সোনাগাছি, ওয়াটগঞ্জ, মেটেবুরুজ
একটু বেশি রাতে দেখা অজস্র ফুটপাথের সংসার
হাওড়া ব্রীজের ওপর দাঁড়ানো বলিষ্ঠ উলঙ্গ পাগলের
প্রাণ খোলা বুক কাঁপানো হাসি
চীনাবাদাম-ভাঙা গড়ের মাঠের গল্পের শেষে হঠাৎ কোনো
হিজড়ের অনুনয় করা কর্কশ কণ্ঠস্বর
আমায় তাড়া করে ফেরে বহুদিন

দশকর্ম ভাণ্ডারের পাশে গাড়িবারান্দার নীচে তিনটে কুকুর ছানার সঙ্গে
লাফালাফি করে একটি শিশু
কুকুরগুলোর চেয়ে শিশুটিই আগে দৌড়ে যায় ঝড়ের মতন লরির তলায়
সে তো যাবেই, যাবার জন্যই সে এসেছিল, আশ্চর্য কিছু না
কিন্তু পরের বছর তার মা অবিকল সেই শিশুটিকেই আবার
স্তন্য দেয় সেখানে
এইসব দেখে, শুনে, দৌড়িয়ে, জিরিয়ে
আমার কণ্ঠস্বর ভাঙে, হাফ প্যান্টের নীচে বেরিয়ে থাকে
এক জোড়া বিসদৃশ ঠ্যাঙ

গান্ধী হত্যার বিকট টেলিগ্রাম যখন কাঁপিয়ে দেয় পাড়া
তখন আমি বাটখারা নিয়ে পাশের বস্তির ছেলেদের সঙ্গে
ছিপি খেলছিলাম...

ভেবেছিলাম আসবো, দেখবো, বেড়াবো, ফিরে যাবো, আবার আসবো
ভেবেছিলাম দূরত্বের অপরিচয় ঘুচবে না কখনো
ভেবেছিলাম এই বিশাল মহান, গম্ভীর সুদূর শহর
গা ছমছমে অচেনা হয়েই থাকবে
জেলেরা যেমন সমুদ্রকে, শেরপারা যেমন পাহাড়কে, তেমন ভাবে
এই শহরকে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিতে চাইনি
এক সময় দুপুর ছিল দিকহীন চিলের ছায়ার সঙ্গে ছুটে যাওয়া

শৈশব মেশানো আলপথ, পুকুরের ধারে ঝুঁকে থাকা খেজুর গাছ
এক সময় ভোর ছিল শিউলির গন্ধ মাখা, চোখে স্থলপদ্মের স্নেহ
এক সময় বিকেল ছিল গাব গাছে লাল পিঁপড়ের কামড়
অথবা মন্দিরের দূরাগত টুংটাং
অথবা পাটক্ষেতে কচি অসভ্যতা
এক সময় সকাল ছিল নদীর ধারে স্কুল-নৌকোর প্রতীক্ষায়
বসে থাকা
অথবা জারুল বাগানে হঠাৎ ভয় দেখানো গোসাপের হাঁ
এক সময় সন্ধ্যা ছিল বাঁশ ঝাড়ে শাকচুন্নীদের
নাকিসুর শুনে আপ্রাণ দৌড়
অথবা বঞ্চিত রাজপুত্রদের কাহিনী
অথবা জামরুল গাছের নীচে
চিকন বৃষ্টিতে ভেজা
এক সময় রাত্রি ছিল প্রগাঢ় অকৃত্রিম নিস্তব্ধতা
মৃত্যুর খুব কাছাকাছি ঘুম, অথবা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে
আস্তে আস্তে ডুবে যাওয়া এক জাহাজ
গন্ধ লেবুর বাগানে শিশির পাতেরও কোনো শব্দ নেই
কোনো শব্দ নেই দীঘির জলে একা একা চাঁদের
অবিশ্রান্ত লুটোপুটির
চরাচর জুড়ে এক শান্ত ছবি, গ্রাম বাংলার
মেয়েলি আমেজ মাখা সুখ
তার মধ্যে একদিন সব নৈঃশব্দ্য খান খান করে ভেঙে
সমস্ত সুখের নিলাম করা সুরে
জেগে উঠতো নিশির ডাক:
সস্তা না মূল? সস্তা না মূল...

স্মৃতির শহর ২২

কৈশোর ভেঙেছে তার একমাত্র গোপন কার্নিস
কৈশোরই ভেঙেছে
ভেঙে গেছে যত ঢেউ ছিল দূর আকাশ গঙ্গায়
শত টুকরো হয়ে গেছে সোনালি পিরিচ
সে ভেঙেছে, সে নিজে ভেঙেছে
পাথরকুচির আঠা দুই চোখে লেগেছিল তার
রক্ত ঝরে পড়েছিল হাতে
তবুও সমস্ত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এসে
পা সেঁকে নিয়েছে গাঢ় আগুনের আঁচে
কৈশোর ভেঙেছে সব ফেরার নিয়ম
যে-রকম জলস্তম্ভ ভাঙে
কৈশোর ভেঙেছে তার নীল মখমলে ঢাকা অতিপ্রিয় পুতুলের দেশ
সে ভেঙেছে অনুপম তাঁত
চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চুন, সুর্কি ধুলো
মৃত পাখিদের কলকণ্ঠস্বর উড়ে গেছে হাওয়ার ঝাপটে
যেখানে বরফ ছিল সেখানেই জ্বলছে মশাল
যেখানে কুহক ছিল সেখানে কান্নার শুকনো দাগ
এখনো স্নেহের পাশে লেগে আছে ক্ষীণ অভিমান
আয়নায় যাকে দেখা, তাকেই সে ভেঙেছিল বেশি
কৈশোর ভেঙেছে সব, কৈশোরই ভেঙেছে
যখন সবাই তাকে সমস্বরে বলে উঠেছিল, মা নিষাদ
সেইক্ষণে সে ভেঙেছে, তার নিজ হাতে গড়া ঈশ্বরের মুখ...

স্মৃতির শহর ২৩

আমরা যারা এই শহরে হুড়মুড় করে বেড়ে উঠেছি
আমরা যারা ইট চাপা হলুদ ঘাসের মতন একদিন ইট ঠেলে
মাথা তুলেছি আকাশের দিকে
আমরা যারা চৌকোকে করেছি গোল আর গোলকে করেছি জলের মতন সমতল
আমরা যারা রোদ্দুর মিশিয়েছি জ্যোৎস্নায় আর
নদীর কাছে বসে থেকেছি গাঢ় তমসায়

আমরা যারা চালের বদলে খেয়েছি কাঁকর, চিনির বদলে কাচ
আর তেলের বদলে শিয়ালকাঁটা
আমরা যারা রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা
মৃতদেহগুলিকে দেখেছি
আস্তে আস্তে উঠে বসতে
আমরা যারা লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলির মাঝখান দিয়ে
ছুটে গেছি এঁকেবেঁকে
আমরা যারা হৃদয়ে ও জঠরে জ্বালিয়েছি আগুন
সেই আমরাই এক একদিন ইতিহাস বিস্মৃত সন্ধ্যায়
আচমকা হুল্লোড়ে বলে উঠেছি, আঃ,
বেঁচে থাকা কি সুন্দর!
আমরা ধূসরকে বলেছি রক্তিম হতে, হেমন্তের আকাশে
এনেছি বিদ্যুৎ
আমরা ঠনঠনের রাস্তায় হাঁটু-সমান জল ভেঙে ভেঙে
পৌঁছে গেছি স্বর্গের দরজায়
আমরা নাচের তাণ্ডব তুলে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলেছি মধ্যরাত্রিকে
আমরা নিঃসঙ্গ কুষ্ঠরোগীকে, পথভ্রান্ত জন্মান্ধকে, হাড়কাটার
বাতিল বেশ্যাকে বলেছি, বেঁচে থাকো
বেঁচে থাকো
হে ধর্মঘটী, হে অনশনী, হে চণ্ডাল, হে কবরখানার ফুল চোর
বেঁচে থাকো
হে সন্তানহীনা ধাইমা, তুমিও বেঁচে থাকো, হে ব্যর্থ কবি, তুমিও
বাঁচো, বাঁচো, হে আতুর, হে বিরহী, হে আগুনে পোড়া সর্বস্বান্ত, বাঁচো
বাঁচো জেলখানায় তোমরা সবাই, বাঁচো হাসপাতালে তোমরা
বাঁচো বাঁচো, বেঁচে থাকো, উড়তে থাক নিশান, জ্বলুক বাতিস্তম্ভ
হাড় পাঁজরায় লেপটে থাক শেষ মুহূর্ত
ভূমিকম্প অথবা বজ্রপাতের মতন আমরা তুলেছি বেঁচে থাকার তুমুল হুংকার
ধ্বংসের নেশায়, ধ্বংসকে ভালোবেসে আমরা চেয়েছি জন্মজয়ের প্রবল উত্থান।

স্মৃতির শহর ২৪

একে ওকে নষ্ট করে চলে গেল প্রেম
যদি বা যাবার ছিল
তবে কেন থেমেছিল সহসা এখানে?
পৃথিবী উত্তাল আজ প্রেমভ্রষ্ট মানুষের ভিড়ে।

*

বহুদিন বৃষ্টি হয়নি, মাটি তাই রক্ত চুষে খেল
আমার ভাইয়ের রক্ত
তোমার ভাইয়ের রক্ত
তুমি আমি আরও কিছু রক্তবীজ
নগরীকে ছুঁড়ে দিয়ে যাবো।

*

রাস্তায় তুমুল রব, একদল ক্রোধী ছুটে গেল
চমকে উঠি
এ কি সেই? এই তবে শুরু?
দরজায় ছুটে যাই; বুক কাঁপে, প্রতীক্ষাও কাঁপে
কিছু নয়।
এ সব বিপ্লব নয়, চোর চোর খেলা!

স্মৃতির শহর ২৫

কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাবো—
আমি একে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে যাবো হলদিয়া বন্দরে
নারকোল নাড়ুর সঙ্গে সেঁকোবিষ মিশিয়ে খাওয়াবো
কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে।
কলকাতা চাঁদের আলো জাল করে, চুম্বনে শিয়ালকাঁটা অথবা কাঁকর
আজ মেশাতে শিখেছে
চোখের জলের মতো চায়ে তুমি চিনি দিতে ভুলে যাও, এত উপপতি
তোমার দিনে-দুপুরে, উরুতে সম্মতি!
দিল্লির সুপ্রিমকোর্টে, সুন্দরী, তোমাকে আমি এমন সহজে
যেতে দিতে পারি? তার বদলে হৃদয়ে সুগন্ধ মেখে সন্ধ্যেবেলা

প্রখর গরজে
তোমার দু' বাহু চেপে ট্যাকসিতে বাতাস খেতে নিয়ে যাবো—
হোটেলে টুইস্ট নাচবে, হিল্লোলে আঁচল খুলে বুকে রাখবে দু'দুটো ক্যামেরা
যদু...মধু এবং শ্যামেরা তুড়ি দেবে;
শরীরে অমন বাজনা, আয়নার ভিতরে অতি মহার্ঘ আলোর মতো
তুমি, তোমার চরণে
বিশুদ্ধ কবিতাময় স্তাবকতা দক্ষিণ শহর থেকে এনে দিতে পারি
সোনার থালায় স্থলপদ্ম চাও দুই হাতে?
তুমি খুন হবে মধ্যরাতে।
কলকাতা, আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যাবে, তুমি
কিছুতে ক্যানিং স্ট্রিটে লুকোতে পারবে না—
চীনে-পাড়া-ভাঙা রাস্তা দিয়ে ছুটলে, আমিও বাঘের মতো
ছুটে যাবো তোমার পিছনে
ডিঙিয়ে ট্রাফিক বাতি, দুঃখের বড়বাজার, রোগীর পথ্যের মতো
চৌরঙ্গি পেরিয়ে
আমার অনুসরণ, বায়ুভূত নিরালম্ব আত্মার মতন ভঙ্গি
কাতর ভালোবাসার, প্রতিশোধে—
কোথায় পালাবে তুমি? গঙ্গা থেকে সব ক'টা জাহাজের মুখগুলো
ফিরিয়ে
অন্ধকারে ময়দানে প্রচণ্ড সার্চলাইট ফেলে
টুঁটি চেপে ধরবো তোমার—
তোমার শরীর-ভরা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বারুদ ছড়িয়ে
আমার গোপন যাত্রা, একদিন শ্রোণীযুগে জ্বালবো দেশলাই
উড়ে যাবে হর্ম্যসারি, ছেটকাবে ইটকাঠ, ধ্বংস হবে
সব লাস্য, অলঙ্কার, চিৎপুরের অমর ভুবন
আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলে যদি, তোমার সহমরণ
তবে কে বাঁচাবে?

স্মৃতির শহর ২৬

পাতলা কাচের গেলাশে জল, এক একদিন মনে হয়,
বাঃ জল কী সুন্দর
যেমন আকাশের এক পাশ থেকে অন্য পাশে

চলে যাচ্ছেন রূপবান সূর্য
রোজ মনে পড়ে না, এক একদিন মনে পড়ে
এক একদিন মনে পড়ে ছেলেবেলায় সেই কি তুমুল
বারুদ রঙের ঝড় উঠেছিল
রোজই তো কত চোখের দিকে তাকাই, শুধু
এক একদিন চোখে পড়ে পৃথিবীর চোখ
বাতাসে ভেসে বেড়ায় প্রাণপাখি, শুধু একদিন
টের পাই সব বাতাসই বিনামূল্যে
মহাশূন্যে ছুটে যাচ্ছে একটা ঢিল, তাতে জড়িয়ে আছে
সাতশো কোটি অ্যামিবা
শুধু একদিনই টের পাই মহাশূন্যের চেয়ে কত বিরাট
এই বুকের শূন্যতা
হঠাৎ এক সকালবেলা একটা ঘাসফড়িং লাফিয়ে এসে
দারুণ বিস্মিতভাবে
চেয়ে থাকে আমার দিকে, সে কী যে দ্যাখে
কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে একটা কাঁই বিচি,
তার থেকে উঠে এসেছে ঝিরিঝিরি
পবিত্র এক তেঁতুল চারা, কাল তো ছিল না
বিশ্বাস করো বা না করো, খবরের কাগজে ছাপা হয় না এমন এক
বিশাল দুনিয়া ছড়িয়ে পড়ে আছে বাইরে
তার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে গিয়ে যেদিন
দেখতে পাই জল-ঝিনুকের
লাবণ্যের মতো একটি দিন
সেদিন মনে হয়, শুধু সেই দিনের জন্য,
বড় সার্থক ভাবে বেঁচে আছি।

স্মৃতির শহর ২৭

জোব চার্ণকের সমাধির ওপর ফুটেছে
এক থোকা কালকাসুন্দি ফুল
একটি সেপাই-বুলবুলি রং বদলাচ্ছে সেখানে বসে
মেঘশূন্য আকাশে ঝলসায় চিন্ময় রোদ্দুর
পাখিটি উড়ে যাবে, ফুল ঝরে পড়বে

ওরা ইতিহাসের ধার ধারে না
বাতাস তবু ঘুরে ঘুরে খবর রটায়, আছে, আছে, আছে!

চার্চ লেনের চার পাশ ঘিরে শোনা যায়
কোটি কোটি সোনা-রুপোর টুকরোর জলতরঙ্গ ধ্বনি
ভুল হিসেবের মহোৎসব ও হাস্য পরিহাস
এক কোণে শতাব্দীর ধুলোমাখা ধর্মাধিকরণ
তার খুব কাছেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লম্বা লাইন
সেখানে দাঁড়িয়ে আছে হুবহু এক রকম
আত্মসমর্পণকালীন যোদ্ধা যেন সব
নিরস্ত্র, দণ্ডিতের মতন মুখ
আমি দেখতে পাই আমাকে, তীব্র অনুতপ্ত
জুতোর পেরেক বিঁধলে মনে পড়ে, এখনো বেঁচে আছি।

হঠকারী এক ছোকরা নবাবের অস্থায়ী আস্তানায়
এখন ছিঁচকে চোর ও বিবর্ণ-কোট উকিলেরা
কানামাছি খেলে প্রত্যেক দিন
যেন এই মুহূর্তটাই অনন্ত মুহূর্ত, নইলে
আর বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই
তবু হঠাৎ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় অশথ গাছের নীচে
অশথ গাছ দীর্ঘজীবী, ওরা জানে
ওরা অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছে
বড় বড় দস্যু ও বড় বড় আইন ধন্ধবাজদের
ওরা পাড়ি দিতে দেখেছে দিল্লিতে
দুটি গাঙ্ শালিখ ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর ভূমিকা নেয়
পুরোনো কালের গল্পে ওরা ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে
তারপর একটা শব্দ ফেলে রেখে
উড়ে যায় বিখ্যাত নদীর দিকে
এই ছোট-কারণাবলীর বিচারশালায়
একদিন আমরা অনেকে মিলে আওয়াজ তুলেছিলুম
এই আজাদী ঝুটো, ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ
সবাই কি তা ভুলে গেছে, এমনকি স্বাধীনতাও?

বাতাস তবু ঘুরে ঘুরে খবর রটায়, আছে, আছে, আছে
ওরে চঞ্চল, ওরে অবিশ্বাসী, কী আছে? কী আছে?
একটু স্পষ্ট করে বল

আমি ক্ষুধার্ত, আমি বড় স্মৃতি-কাতর
সোনার কৈশোর আর স্বেচ্ছা-কন্টকময় যৌবন
আমি নিবেদন করেছি এখানে
এই অভিমানী, অভিশপ্ত ইঁট-কাঠের আত্মাকে
এর পথে পথে রয়েছে আমার অজস্র ব্যাকুল চুম্বন
তার আর কোনো প্রতিদান চাই না
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো.....।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে

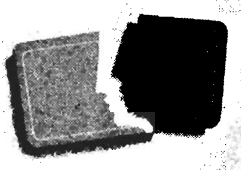

সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে

সূচিপত্র

যাওয়া না-যাওয়া ৪৭, **শব্দ যাকে ভাসায়** ৪৭, মুহূর্তের দেখা ৪৮, তাকে ঐ দিনটি দাও ৪৯, **আমাদের সক্রেটিস** ৫০, **আঙুলের রক্ত** ৫১, স্বাধীনতার জন্য ৫১, উৎসর্গ ৫৩, কৈশোরের ঘরবাড়ি ৫৩, **অর্ধনারীশ্বর** ৫৪, **সাদা পৃষ্ঠা** ৫৫, চণ্ডালডাঙা ৫৬, ডাকপুরুষের দর্পণ ৫৭, হিরণ্ময় পাত্রখানি ৫৮, **একটা উত্তর দাও** ৫৯, **জ্বর** ৬০, দুটি মুখ ৬০, আর এক রকম জীবন ৬২, এলেম নতুন দেশে ৬২, **স্বপ্নের অন্তর্গত** ৬৪, কত না সহজ বলে ৬৪, দু' চারটে পলাতক ৬৫, আর যুদ্ধ নয় ৬৫, এবারের শীতে ৬৬, **সুড়ঙ্গের ওপাশে** ৬৭, আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে ৬৮, অন্ধ, গলা-ভাঙা, **অভিমানী** ৬৯, **ঋণ থাকে** ৭০, **স্থির চিত্র** ৭১, পালাতে পারবে না ৭১, শিল্প-সমালোচক ৭২, নদী জানে ৭২, এক **এক দিন** ৭৩, **দেয়ালে নোনা দাগ** ৭৪, ছবির মানুষ ৭৪, দিব্যি আছি ৭৫, **নদীমাতৃক** ৭৬, এত **সহজেই** ৭৮, **যে আগুন দেখা যায় না** ৭৮, আমার নয় ৭৯, ফেরা না ফেরা ৭৯, একমাত্র **উপমাহীন** ৮০, **এ পৃথিবী জানে** ৮১, মানুষের জন্য নয় ৮১, সে ৮১, দুই কবি: একটি কাল্পনিক **সাক্ষাৎকার** ৮২

যাওয়া না-যাওয়া

এদিকে ওদিকে বিপন্ন ঘর বাড়ি
স্রোতের কুটোয় কাকে রাখি কাকে ছাড়ি
ভালোবাসাময় চিঠিগুলি কুচি কুচি
ছিল লঘুমায়া, ধ্বংসে ছিল না রুচি
আসঙ্গ লোভী স্পর্শকাতর ডানা
যারা খুব চেনা তাদেরও কি ছিল জানা
সবুজ ভিখারী মরুভূমি চোখ টানে
পাহাড় মেতেছে পতনের নির্মাণে
মেঘ তোলপাড়, পাগলাঘণ্টি হাওয়া...

আমার হলো না যাওয়া, যাওয়া হলো না, হলো না যাওয়া!

ব্যাকুলতা ছিল না-চাওয়ার চেয়ে বেশি
আগুন ও জলে যে-রকম রেষারেষি
কথা গেঁথে গেঁথে একটি অধিক কথা
আলিঙ্গনের ভেতরের শূন্যতা
পোড়াটে দুপুর জ্যোৎস্না জ্বালানো রাত
এ পথে সে পথে জানালায় করাঘাত
খুব খিদে পেলে বাতাসের আচমন
তেঁতুল পাতায় শুয়েছি সতেরো জন
কেউ ভালোবেসে চলে গেল খুব দূরে
কেউ বা অস্ত্র জলে ফেলে দিল ছুঁড়ে
কেউ বা মেনেছে স্বপ্নে চরম পাওয়া...

আমার হলো না যাওয়া, যাওয়া হলো না, হলো না যাওয়া!

শব্দ যাকে ভাসায়

শব্দ যাকে ভাঙে তাকে তুলোর মতন ভাঙে
ভাঙতে ভাঙতে ওড়ায় তাকে ধূপের মতন পোড়ায়
ঢেউয়ের মতো ভেসে বেড়ায় নীলিমা-ভাঙা ছবি

চোখের মধ্যে লাল ধুলোর প্রবাস উঁকি মারে
ঘরের মধ্যে ঘুরছে ফিরছে শরীরহীন জ্বালা
শব্দ যাকে খায় তাকে নদীর মতন খায়।

দ্যাখো দ্যুলোক শুয়ে আছে যৎসামান্য রোদে
এমন মায়া হাতে ছুঁলেই ভালোবাসার আঠা
আবার ফের পলক ফেললে কাচের মতন জল
জলের মধ্যে নারী এবং নারীর চোখে আগুন
কিংবা সবই দৃষ্টি-ভুলো শব্দ শব্দ খেলা
শব্দ যাকে ভাসায় তাকে সর্বনাশে ভাসায়!

মুহূর্তের দেখা

টিলার ওদিক থেকে উঠে এলে ওষ্ঠে ভরা
সারণীর কুলুকুলু ধ্বনি
আঁচলে বাতাস বাঁধা যেন সৌর তরণীর পাল
ভূমি থেকে এক ইঞ্চি উঁচু পায়ে দাঁড়ালে দিগন্তখানি জুড়ে
যেন কোনো স্বর্গ-বেশ্যা, অথবা প্রি-র‍্যাফেলাইট পরী...

কিছুদূরে গাছতলায় শুয়ে আমি পড়ছিলুম
মানুষের দাঁতের ইতিহাস
আগুনের বন্দিত্ব ও রুটি কাড়াকাড়ির দলিল
ঘাড় ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকি নিষ্পলক
ও কে? নীরা নয়? কিংবা বুঝি নীরার আদল
কোথা থেকে এলে, কেন এলে, ফের কোথায় পালাবে
শীত দুপুরের আলো সহসা রক্তিম হয়ে ওঠে
তরঙ্গের নানা স্তর, শূন্য ও অসীম, যেন চেতনার
লুকোচুরি খেলা

সবই তো অলীক তবু মুহূর্তের দেখাটাও ঠিক!

তাকে ঐ দিনটি দাও

সেই উজ্জ্বল দিনের শিয়র ছুঁয়ে আছে
চন্দনবর্ণ মেঘ
সারি সারি সার্থবাহ চলেছে প্রমাণিত স্বপ্নগুলি নিয়ে
গোধূলির সেকি অলৌকিক মায়াজাল
শব্দ উড়ে যাচ্ছে এক একটি যুঁই ফুলের মতন
বৃষ্টির শরীর নেই, তবুও সে আছে
এরই মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় সদ্য বলি দেওয়া
মোষের রক্ত ,
দৃশ্যটি সম্পূর্ণ হয়।

তারপর সেই দৃশ্য প্রসব করে তার নিজস্ব প্রতিভা
যেমন নদীর গভীরে গর্জে ওঠে কামান
মাতৃভূমি বিচ্যুত এক কিন্নরের শোকাশ্রুর মতন
কুসুমপাত হয় আকাশ থেকে
সমুদ্র নিশ্বাসে উড়ে যায় পরমাণু ধোঁয়া
ক্ষুধার্ত সত্যগুলি প্রতিশ্রুতির রক্ত মাংস চাটে
পা দিয়ে জল ভাঙার শব্দে ঢেকে যায়
কিছু কিছু ভুল
তখন পাহাড় থেকে নেমে আসে একলা এক পাথর
অন্য কোনো একাকীর কাছে।

উজ্জয়িনী থেকে সেই যে বেরিয়েছিল এক ভ্রাম্যমাণ
খুঁজতে খুঁজতে যার সব কিছু ছোট হয়ে গেল
এই শতাব্দী শেষের আকাশের নীচে
সে দাঁড়িয়ে আছে
চতুর্দিকে অপরিচ্ছন্ন ছায়া ও অবিশ্বাসী হাওয়া
তাকে ঐ দিনটি দাও
একটি দিন, একটি স্বপ্নের সার্থকতা!

আমাদের সক্রেটিস

ওয়েলিংটনের মোড়ে গোল আড্ডার মাঝখানে
দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সক্রেটিস
তিনি একটু আগে হেমলক পান করে এসেছেন, আবার
পান করতে যাবেন।
প্রথমে তিনি ফরাসী ভাষায় উচ্চারণ করলেন
একটি সদ্য ভাঙা পাথরের ভেতরের যে রং
আজও কেউ তার নাম দেয়নি কেন?
তারপরই তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় জানালেন,
একমাত্র মেয়ে মানুষের গতরই ধারণ করতে পারে
একসঙ্গে দুটি আত্মা!

তারপর সক্রেটিস উঁচু করে তুললেন তাঁর দুই ডানা
জাদুকরের মতো তাঁর শরীর কালো আঙরাখায় ঢাকা
তাঁর অনামিকায় রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত আংটি
তাঁর কণ্ঠে ফৈয়াজ খাঁর বাজখাঁই গমক
তিনি এবারে বললেন, চললুম উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির থেকে
প্রদীপের ঘি তুলে আনতে
তোমরা অপেক্ষায় থেকো, ঘুমিয়ে পড়ো না।

বাতাসে ঝাঁপ দেবার আগে
কমলকুমার মজুমদার আমাদের দেখালেন
তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের
নখদর্পণ।

টীকা: উনিশশো ষাট থেকে বাষট্টি সালের কথা। সেই সময় এই সক্রেটিস এসে দাঁড়াতেন ওয়েলিংটনের মোড়ে। সেখানকার ফুটপাথে ছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি আমাদের শেখাতেন কী করে বিষ হজম করতে হয়। তারপর আমরা ধার করে মুর্গীর ঝোল খেতে যেতুম। তিনি আমাদের অপেক্ষা করতে বলে একদিন চলে গেলেন। সেই মুর্গীর ধার আমাদের আজও শোধ করা হয়নি।

আঙুলের রক্ত

ঘর শব্দটি কবিতার মধ্যে এলে আমি তার দরজা দেখতে পাই না
অথচ দরজা শব্দটির একদিকে ঘর, আর একদিকে বারান্দা
বারান্দার পাশেই নিম গাছ
আমার শৈশবের নিম গাছের স্মৃতির ওপর বসে আছে একটা ইস্টিকুটুম পাখি

যদি ঐ পাখিটিকে আমি কখনো কবিতার খাঁচায় বসাই নি
শব্দের নিজস্ব ছবি তা শব্দেরই নিজস্ব ছবি
শরীরের শিহরন যেন মাটির প্রতিমার সর্বক্ষণ চেয়ে থাকা
যেমন পাথর ধুলো হয়ে যায় কিন্তু জল বার বার ফিরে আসে
কবিতায় কে যে কখন আসে জানি না
শুধু আমার আঙুল কেটে রক্ত পড়লে তা নিয়ে কবিতা লেখা হয় না!

স্বাধীনতার জন্য

স্বাধীনতা শব্দটি কৈশোরে বড় প্রিয় ছিল
যেন আবছা দিগন্তের ওপাশেই রয়েছে সেই
ভালোবাসার মতন শিহরনময়
এক গভীর প্রান্তর
বয়ঃসন্ধির মোড় পেরুলেই সেখানে পৌঁছে যাবো
সে কি অধীর প্রতীক্ষাময় রোমাঞ্চ ছিল তখন!

তারপর এলো সেই স্বর্ণময় দিন, এমন একটি
বিন্দুতে এসে দাঁড়ালুম
যার দু' পাশ দিয়ে আকাশ বিভক্ত হয়ে গেছে
সূর্যের সোনালি রশ্মি আশীর্বাদ জানালো
বৃষ্টি দিল সব গ্লানি ধুইয়ে

সবাই বললো এই তো বেশ পবিত্র ও প্রস্তুত হয়েছো
এবারে কয়েদখানার মধ্যে সুড়সড় করে ঢুকে পড়ো!

বাইশ বছরে পা দেবার পর দু'দিকে দু'কান ধরে
টান মারলো

জীবিকা ও সামাজিকতা

পৃথিবীটাকে যে-রকম চেয়েছিলুম তার ওপরে শুধুই কুয়াশা
যেন সব কিছুই আছে, ছুঁতে পারছি না
চেয়েছিলাম মানুষের মুক্তি, কিন্তু আমার হাতে পড়ছে বন্ধন
দূরত্বের আড়াল থেকে কেউ যেন ডাকছে, বুঝতে পারছি না ভাষা
ছোট ছোট আরাম, টুকিটাকি মোহজালে জড়িয়ে দিয়েছে সর্বাঙ্গ
এ রকম কথা ছিল না, এ রকম তো কথা ছিল না!
ক্রমশ একটা বয়েসে পৌঁছে মনে হয়
সামনের দিকে আর কিছু আশা করবার নেই
তবু একটা জেদী অহংকার জেগে থাকে
কার জন্য আশা? শুধু তো আমার জন্য নয়,
যারা নতুন জন্মেছে তাদের জন্যও

কিন্তু বিষণ্ণতা ছুঁয়ে থাকে নিজস্ব দেয়াল
গাঢ় অভিমানে মাঝেমাঝেই গলা চুপসে আসে
চারপাশে শুনতে পাই, প্রকৃত স্বাধীনতা নয়
শুধু স্বাধীনতা শব্দটির দেহতত্ত্ব নিয়ে
চলেছে তুমুল কলরব

মাঝে মাঝে ছেঁড়ার চেষ্টা করে পালিয়েছি
পাহাড়ে, জঙ্গলে, আদিবাসীদের আস্তানায়
কিছু একটা ভাঙার অস্থিরতায় নিজেকেই ভাঙতে চেয়েছি
বারবার
প্রত্যেকবারই কেউ ঝুঁটি ধরে টেনে ফিরিয়ে এনেছে
ঘুমপাড়ানি গানে বুজে গেছে চোখ
জেগে উঠে বুঝেছি, ওসব দু'দিনের মৌখিক ছদ্মবেশ
বুক টনটন করে উঠেছে
মেনে নিতে চাইনি, মনে হয়েছে, আছে, আছে, পথ আছে!

পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে দেখি
স্বাধীনতার পোশাকপরা অস্ত্রধারীদের মহড়া
আমার মন খারাপ আমি কেমন করে বোঝাবো
তবে কি এ পৃথিবী পরিপূর্ণ ধ্বংসের পর
প্রকৃত স্বাধীন হবে?
আমি একজন কিশোরের দিকে তাকাই, সেও
স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায়নি তো?

উৎসর্গ

এই নাও আমার সমস্ত দৃষ্টিপাত
এই নাও সকালের সুখ
এই নাও আশৈশব অতি প্রিয় শব্দগুলি
এই নাও সার্থকতা বাতাসে উড়ন্ত বালিহাঁস
এই নাও কৈশোরের একান্ত নিভৃত শিহরন
এই নাও পাহাড়ী রাস্তার মতো প্রেম
এই নাও প্রবাসের চিঠি
এই নাও , রোদ্দুরে-বৃষ্টিতে গড়া মণিহার
এই নাও নশ্বর রুমাল
এই নাও নদীর স্রোতের মতো সব প্রতিশ্রুতি
এই নাও কালি কলমের বিষণ্ণতা
এই নাও ক্ষমাপ্রার্থী করযুগ
এই নাও বুক ভর্তি তরল আগুন
এই নাও বৈশাখী ঝড়ের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা
এই নাও উজ্জ্বল ব্যর্থতা
এই নাও ভাঙা সুটকেশ ভরা সকল ঐশ্বর্য
এই নাও অরণ্যের হাতছানি
এই নাও অসংখ্য দরজার উন্মোচন
এই নাও শরীরের সব কান্না
এই নাও ছুটি
এই নাও তিলে তিলে জমানো মমতা
এই নাও স্মৃতি ও বিস্মৃতি
এই নাও মৃত্যুর মুহূর্ত
এই নাও স্বর্গের পতাকা...

কিছু দেবে?

কৈশোরের ঘরবাড়ি

নদীর কিনারে ছিল মাটির মমতা মাখা
কৈশোরের বাড়ি
একই লপ্তে বাঁশবাগান। বেগুন-লঙ্কার কুচো খেত

পবিত্র শূন্যতা ছিল চারদিকে, কিছু কিছু ঘাস ফুল ছিল
রাত্রির বাড়িটি ছিল দিনের বেলার বহুদূরে
কখনো অদৃশ্য, ফের চাঁদের উদ্যোগে ভাসমান
কিসের সৌরভ যেন ঘুরে যায় সন্ধেবেলা, ঠিক যে-সময়
নদী ডাকে
আকাশ-বাঁধানো তীর, সন্ন্যাসীর মতো এক নদী
কোথায় যে যাবে বলে বেরিয়েছে, নিজেই জানে না।

কৈশোরের মাঠকোঠায় ছিল না একটুও সোনা,
ইস্পাত, বারুদ
সদ্য রূপকথা ভেঙে জেগে উঠছে মন কেমন করা এক দেশ
পিছনে অস্পষ্ট ধ্বনি, মেঘ-ছেঁড়া চকিতের ছবি
গ্রীষ্মের বাতাসে ভাসে জামরুল ফুলের মিহি কণা
যেন মোহময় মিথ্যে, একা একা জল নিয়ে খেলা
লম্বা গাছটির ডালে এক এক দিন এসে বসে
অবাক অবাক চোখ প্যাঁচা
মৃদু বৃষ্টি, শব্দের জোয়ারে তার ভুরুক্ষেপ নেই
অজস্র সুতোর জাল বাতাস ছড়িয়ে যায় বাতাসের মনে
ধিক্‌ধিকে ক্ষিধের মতো সবদিকে প্রতীক্ষার তীব্র ব্যাকুলতা
লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে মা যাচ্ছেন
কাঁচা রান্নাঘরে
কুপির আলোয় কাঁপে ছোট্ট একটি সংসারের ছায়া
আবার মিলিয়ে যায়, ঝড় ওঠে অতি প্রিয় ধ্বংসের আওয়াজে
আচমকা ঘুম ভেঙে শোনা যায় রুদ্র সন্ন্যাসীর নিশি ডাক।

কৈশোরের ঘরবাড়ি নদীর কিনারে
আজো রয়ে গেছে।

অর্ধনারীশ্বর

নদী বন্ধন উদ্বোধনে এসেছেন এক নৃমুণ্ড শিকারি
গোলাপের পাপড়ি উড়ছে বাতাসে, এখানে শিশুরা হাসে না
এখানে শঙ্খধ্বনি ও সমর ভেঁপু এক সঙ্গে মিলে মিশে যায়

ক্ষ্যাপাটে জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে
এগোচ্ছেন তিনি, ঝুঁকলেন
তাঁর ওষ্ঠে ফুটে উঠছে পাহাড়ী হাসি, কপালে আন্তর্জাতিক ভাঁজ
আসলে তিনি সেতুর নীচে গুঁজে দিচ্ছেন বারুদ
জল বা মাটির মানুষেরা যা জানে না, তিনি তা জানেন
লম্বা হত্যা তালিকার নীচে স্বাক্ষর বসিয়েই তিনি ছুটলেন
বিমানের দিকে
জানলার বাইরে মেঘের মাধুরী তাঁর পছন্দ হলো, তলোয়ারের মতন বিদ্যুৎ
বিভা
তাঁকে যৌন স্মৃতি দিল
হাত বাড়িয়ে তিনি সেবিকার হাত থেকে নিলেন নিজের সন্তানের লহু
তাঁর দুই উরুর অন্তবর্তী আগ্নেয়গিরি জেগে উঠলো, স্বপ্নে।

নির্জন দ্বীপের বাতি-ঘরের শিখরে তার বসতি, তিনি অর্ধনারীশ্বর
দেয়ালে ঝুলছে মালার পর মালা, সব সহাস্য স্থির মুখ
তিনি পোশাক খুললেন, তাঁর বুকে পিঠে সাংবিধানিক মারপ্যাচের
কালসিটে
বাঁ হাতের তালুতে লেখা বাণী, রাষ্ট্র, সে তো আমি!
লোহার গরাদ আঁকড়ে ধরে তিনি দেখতে লাগলেন
অন্ধকার গোলাকার সিঁড়ি
আর কেউ কি উঠে আসছে, শোনা যাচ্ছে অন্য পদশব্দ?
নীচে কি ধাক্কা মারছে জোয়ারের ঢেউ না লক্ষ লক্ষ ফিসফিসানি
তাঁর ঘুম আসে না, তাঁর চোখে জল আসে
তাঁর দীর্ঘশ্বাসে ভরে যায় স্মৃতিকথার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা
পার্থিবদের পরমার্থ-মহাযজ্ঞে তিনি প্রাণপাত করে চলেছেন
কেউ তা বোঝে না, কেউ তা বোঝে না!

সাদা পৃষ্ঠা

সাদা পৃষ্ঠা, তুমি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে
তাকিয়ে রয়েছো কেন
আমি কি সমুদ্র দ্বীপের মতন হঠাৎ অচেনা
পাঠশালার প'ড়োর সঙ্গে বিমান-বন্দরে দেখা

সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে কি আমার যৌন সম্পর্ক
হয়েছিল কোনদিন?

সমস্ত কিছুই হারিয়ে যেতে যেতে একটা কিছু
আঁকড়ে ধরার মতন
বিষণ্ণ বেলায় এক প্রান্তে এসে আমি দাঁড়িয়েছি
ঝড় এসে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে ফুল
খেলাচ্ছলে কেউ অন্ধকার নিয়ে এলো
স্কুল বাড়ির ছাদে
শুকনো নদীর মতন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে শহরের রাস্তা
এর মধ্যে তুমি কেন আমার সামনে নিয়ে এলে
তোমার বৃষ্টিস্নাত মুখ
সাদা পৃষ্ঠা, চলো, তা হলে তোমার সঙ্গেই দেশান্তরে যাই!

চণ্ডালডাঙা

মনে করো এখানে কিছুই নেই, একটা চণ্ডালডাঙা
তারও ভেতরে কোথাও রয়েছে
এক টুকরো হারানো ভালোবাসা
তাই খুঁজতেই তো আসা এখানে, এই ঠা-ঠা দুপুরে
আরও কার কার যেন সঙ্গে আসার কথা ছিল
মাঝপথে তারা খসে পড়লো টুপটাপ
তারা অনেকেই নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে অনেক কিছু
কেউ হয়তো চড়ে বসেছে একটা লম্বা গাছের ডগায়
খুব আরামে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে কর্মফল
কেউ বা ঝাঁটা হাতে নেমে গেছে সমাজ সংস্কারে
কেউ ব্যাধ সেজে উপেক্ষা করেছে প্রতিষ্ঠা
যেখানে কিছুই নেই, এমনকি ভালোবাসাও হারিয়ে গেছে
সেখানে আর কেই-বা আসবে।

একটা বেশ চমৎকার গোলোকধাম খেলা জমে উঠেছিল
নিজেরই আদলে গড়া মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলতে ফেলতে
হাতে বিঁধেছে টুকরো টুকরো স্মৃতি
খিদে তেষ্টা পেলেই গলায় ঢেলে দিয়েছি উচ্চাকাঙ্ক্ষা

নেশার জন্য তো ছিলই প্রচুর অহমিকা
জল ও আগুনের মধ্যে যে ধর্মযুদ্ধ চলেছে অবিরাম
তা আমরা লঘু প্রতীকে ছড়িয়ে দিয়েছি
বিছানায়, নিম্ন শরীরে
সূর্যাস্তের মতন বর্ণাঢ্য উল্লাস ছড়িয়েছে ঘুমের শিখরে
রাতপাখি যেমন অন্ধকারকে বাঙ্ময় করে
সেই রকম আমরা খরচ করেছি সঞ্চিত স্তব্ধতা
কেউ যাতে আচমকা এগিয়ে যেতে না পারে
তাই যখন তখন উল্টো দিকে ফিরে শুধু করেছি পিঠ-দৌড়।

একদিকে পাঁহাড় জঙ্গল, অন্য দিকে নদী-সমুদ্রে
ছিল প্রচুর ডাকাডাকি
দিক শূন্য কাশ ফুলের ওড়াউড়ির মতন হৃৎস্পন্দন
তারই মধ্যে একটি বেদনার রেখা টিট্টিভের ডাকের মতন
তীক্ষ্ণ
উড়ে যায় দিগন্ত ছাড়িয়ে শূন্যতায়
যেন লিখতে লিখতে হঠাৎ শব্দ-রোধ
অতল কালো গহ্বর, একটি বুলেটের আওয়াজ
যেন সহাস্য দীপাবলির মধ্যে অকস্মাৎ যৌন-ধিক্কার
যেন কঠিন সত্যকে চাওয়ার বদলে রক্তের উত্তর
তখন একবার যেতে হয় সেই চণ্ডালডাঙায়
যেখানে আর নেই, কিছু নেই
মধ্যদুপুরে নিজের ছায়াও পড়ে না
সেখানে এক টুকরো ভালোবাসার জন্য খোঁজাখুঁজি
যেন হারিয়ে যেতে যেতে, হারিয়ে যেতে যেতে
জলের মধ্যে, জল-শৈশবের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে
কোমল ফিরে যাওয়া।

ডাকপুরুষের দর্পণ

এই প্রান্তরের উড়াল ছাড়িয়ে যে অন্য প্রান্তরের শূন্যতা
সেখানে কেউ কেউ শুয়ে থাকে
আমি তাদের চিনি না, ডাকপুরুষ চিনতেন।

গড় মন্দারন পেরিয়ে কারা যেন রাতের সমূহ অন্ধকারে
চুপচাপ চলে গেল
কে জানে তারা আর কোনদিন ফিরে এসেছিলো কিনা

মাংসের মতন কাঁচা মাটি উঠে আসছে কোদালের ঘায়ে
একজন বোবা মতন ঝুঁকে পড়া মানুষ
সেখানে ঘাম ফেলেছে, ফেলতে ফেলতে গলে গেল সম্পূর্ণ

গানের ইস্কুলের পর কোঁকড়া চুল এক রহস্যময়ী কিশোরী
ঢুকে যায় পোড়ো বাড়িটার মধ্যে
একবার মাত্র পেছন ফিরে সে তাকায়, পর মুহূর্তেই অদৃশ্য

মাঝে মাঝে আমি দেখতে পাই মধ্যযামে নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে
দুই দীর্ঘ বাহু তুলে
ডাকপুরুষ ওদের সকলের জন্য দর্পণ দেখাচ্ছেন।

হিরণ্ময় পাত্রখানি

হিরণ্ময় পাত্রখানি এতটা উত্তপ্ত কেন
ধরে রাখা যায় না আঙুলে
অতৃপ্তি-দণ্ডিত ওষ্ঠ দূরে যেতে গিয়ে
পুড়ে যায় মুহূর্তের ভুলে।

একাকী অরণ্যে যেন তাঁবু গেড়ে শুয়ে থাকা
কিছু নেই, দুনিয়া রয়েছে
হাড়-পাজরা ফুঁড়ে আসে ক্ষুধার কিরণ ছটা
টের পাই, তবু সুখ বেঁচে।

এ যেন রঙের কৌটো, ফুরোলেও লেগে থাকে
সেই বোধ, টুকরো ইতিহাস
বাসাংসি জীর্ণানি বলে যারা শ্লোক বেঁধেছিল
রয়ে গেছে তাদেরও নিশ্বাস।

হিরণ্ময় পাত্রখানি সহসা লুকিয়ে যায়
অথচ আমারই জন্য ওকে
সমস্ত সমুদ্র ছেঁচে বড় কষ্টে আনা হলো
এখন বিভ্রম জাগে চোখে।

একটা উত্তর দাও

প্রশ্ন করলেই তুমি প্রশ্ন ফিরিয়ে দিও না
একটা উত্তর দাও!
যা কিছু চলে যায় সবই পলিমাটি রেখে যায় না
তোমার বুক ছুঁয়ে দেহে যায় যে বাতাস, তা আমার নিশ্বাস নয়
কেনই বা তা হবে, সারাটা জীবন কি জারুল বাগানে ছেলেমানুষী?
একটা উত্তর দাও!

নর্তকীর পায়ের ব্যথার মতন একটি ব্যর্থ সন্ধ্যা
গড়িয়ে যায় ঝিম ধরা মাঝ রাত্তিরের দিকে
ফাঁকা মাঠে তালগাছের ডগায় উড়ছে চাঁদের ঝাণ্ডা
দলপতির মতন রাশভারি একটি কেঁদো ইঁদুর হঠাৎ থেমে গিয়ে
ডান পাশের নীরবতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে
কিসের প্রতীক্ষায় কাঁপতে থাকে তার মুখের সূক্ষ্ম রোম
পোকা-মাকড়দের সংসারে চলেছে অবিরাম সুখ-দুঃখ
এই-সব-কিছুর মধ্যে শোনা যায় অবিকল একটি অজ্ঞাত শিশুর কান্না
কবিতার খাতাতেই শুধু ফুটে ওঠে এই দৃশ্য, তারপর তা বাস্তব
যেন কিছুটা মায়াজাল ছেঁড়ার মতন এই অতি প্রকৃতি
অন্য কোনো ব্যাকুলতা, অন্য কোনো স্মৃতির চাতুরি।

অসংখ্য সমান্তরালের মধ্যে একটি অশ্বক্ষুর ধ্বনি
পরিকীর্ণ শূন্যতার মধ্যে দুলতে থাকে
বিদ্যুৎ-ছটায় অদৃশ্য হয়ে যায় টুকরো টুকরো অরণ্য
বেদনার দানার মতন আলো ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে পড়ে
বয়ঃসন্ধির আঠা
সশরীর ঢেউগুলি পরস্পরকে ঝাপটা মেরে
মুহূর্তে বিমূর্ত হয়ে যায়
কেউ ডাকে, কেউ ডাকে
অসংখ্য সমান্তরালের মধ্যে দোলে অশ্বক্ষুর
একটা উত্তর দাও!

জ্বর

এমনই রোদের তাপ, লেগে গেল শীত
গুটি গুটি চলে যাই কম্বলের নীচে
একবার উপুড় হই, পুনরায় চিৎ
উত্তর মেরুর স্রোত সূর্যের পিরিচে।

ইজেরের বাল্যকাল ডোবে অভিমানে
আর একটি কম্বল তবু থামে না কাঁপুনি
আকাশে সংঘর্ষ হলো ঈগলে বিমানে
আমি শুধু পিঁপড়েদের পদশব্দ শুনি।

বাঁ হাতকে ডান হাত দেখে নেয় খুঁজে
মনে হয় মাথা ছাড়া কিছু নেই আর
মাথাটিও রাখা হলো কেল্লার বুরুজে
কামানের গোলা হয়ে ফাটাবে আঁধার।

কপালে মায়ের হাত জলের নরম
অকস্মাৎ মা মা গন্ধ ভরে যায় ঘর
এই গন্ধে ভয় আছে, স্নেহ যেরকম
কখনও নির্দয় হয়ে তোলে ঘূর্ণিঝড়।

গভীর সমুদ্র বুঝি, তাই এত নীল
দু'পায়ে পাথর বাঁধা, হু হু নীচে নামে
বন্দি দেবতার সঙ্গে অবিকল মিল
পাতালের দিকে যাই প্রগাঢ় আরামে।

দুটি মুখ

একজন দেখলো শুশুনিয়া পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়া চাঁপা রঙের বিকেল
অন্যজন বললো, এত নিরন্ন মানুষ, এত হাহাকার, তবু মানুষ পিকনিক করতে আসে?

একজন শুনলো লুণ্ঠিত স্বর্ণ সিংহাসন ফিরে পাওয়ার মতন যৌবনের জয়ধ্বনি
অন্যজন বললো, দুটো ভিখিরি বাচ্চার সামনে ওরা মুর্গীর মাংস চুষে চুষে খায় কী করে?

একজন দেখতে পেল ঘোড়সওয়ারের মতন আকাশ ভেদ করে ছুটে যাচ্ছে এক ঝাঁক শঙ্খচিল
অন্যজন বললো, ওগুলো সব শকুন, এত শকুন, গ্রামের পর গ্রাম এখন গো-ভাগাড়

একজন দেখলো নন্দলাল বসুর ছবির মতন এক সাঁওতাল কিশোর, সঙ্গে মূর্তিমান আদরের মতন একটা ছাগলছানা
অন্যজন বললো, ভূমিদখলের ষড়যন্ত্রে আদিবাসী সরল মানুষেরা এখন শিকড়হীন ক্রীতদাস

একজন দেখলো পাখিরা ফিরে আসছে স্নেহ মমতার সংসারে, বাতাস বিলিয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের গন্ধ
অন্যজন বললো, কাজহীন মজুরদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে চোরাকারবারিরা উজাড় করে দিচ্ছে বনসম্পদ

একজন আপন মনে উচ্চারণ করলো, উদাসীন সৌন্দর্যময়ী এই পৃথিবী, মানুষ কেন মানুষকে আনন্দের ভাগ দেয় না?
অন্যজন ঘোষণা করলো, চতুর্দিকে জেগে উঠছে নিপীড়িতের দল, উঁচু হয়েছে মুষ্টিবদ্ধ হাত,
সমাজবদলের দিন আসন্ন!

তারপর পলায়নবাদীর মতন একজন একটা নিরালা গাছতলা খুঁজে নিয়ে শুয়ে রইলো চুপচাপ
অন্যজন জিপ গাড়ি চেপে চলে গেল ডাকবাংলোতে জেলা অফিসারদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে
বুকে-দাগা ইতিহাস নিয়ে দিগন্ত ঢেকে জেগে রইল শুশুনিয়া পাহাড়
নিঝুম নিরেট অন্ধকারে অস্তিত্ববিহীনভাবে ডুবে গেল গ্রামবাংলা...
আবার কি ওদের দু'জনের দেখা হবে কোনোদিন
হাতে হাত মিলিয়ে বুঝবে পরস্পরের সত্য
একসঙ্গে গিয়ে দাঁড়াবে মানুষের সামনে?

আর এক রকম জীবন

দমকা হাওয়ায় এক ঝাঁক পায়রার মতন
উড়ে গেল আমাদের সামার ভ্যাকেশান
বর্ষায় ধুয়ে গেল প্রথম কবিতা লেখার দুঃখ
তলপেটে তীব্র ব্যথার মতন অতি ব্যক্তিগত সেই কবিতা
পুকুরের নীল রঙের মধ্যে পুঁটি মাছের চকিত রুপোলি
আভার মতন
প্রথম প্রেম কিংবা প্রথম প্রেমের মতন কিছু
ঝড়ের দাপটে নুয়ে পড়া সুপুরি গাছের মতন
বুকের মধ্যে একটা বাধ্যতামূলক ব্যর্থতাবোধ
প্যান্টের পকেটের ফুটো দিয়ে হারিয়ে যাওয়া আধুলির মতন
নিভা মাসির বাড়ি থেকে একা একা ফিরে আসা সন্ধ্যা
নাজির সাহেবের ঘুড়ির দোকানে আগুন লাগার মতন
মাঝরাতের চিঠি-ছিঁড়ে-ফেলা হাহাকার
সকালবেলা ঘুম ভেঙে ওঠবার পর সব কিছুই অন্যরকম
আকাশের গায়ে শুয়ে আছে মানস সরোবর
ট্রাম লাইনের ওপাশে জেগে ওঠে পাহাড়
বুঝতে পারি এতদিনের চেনা জগৎ রং বদলাচ্ছে
আমার শরীরের মধ্যে জেগে উঠছে আর একজন
নাম-না-জানা মানুষ

ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরবর্তী আর এক রকম জীবন!

এলেম নতুন দেশে

এ কোন্ নতুন দেশে বেড়াতে এলুম যেখানে সব কিছুই
খুব চেনা চেনা মনে হয়

এই সব উজ্জ্বল লাল চেহারার গাছ আমাদের পাড়াগাঁর
উঠোনতলা আলো করে থাকতো

ছোটবেলা পেরিয়ে আসার আগেই অবশ্য তারা ঝড়ে মুড়িয়ে গিয়েছিল
হাওয়ায় উড়ছে জল-রঙা কুচি কুচি ফুল, ঠিক যেমন দেখেছিলাম
ছোট পিসিমার পাহাড়-ঘেঁষা বাড়িতে
ছোট পিসিমা অগ্নিপরীক্ষার জন্য ঝাঁপ দিয়েছিলেন
আর ফিরে আসেন নি
এই যে দেখছি প্রত্যেকটি পুকুরেই জলস্তম্ভ
এ আর নতুন কথা কী
সেই যে আমাদের প্রথম রেলগাড়ি চেপে পশ্চিম ভ্রমণ
সেবারে আমরা মুহুর্মুহু দেখতে পেয়েছিলুম আকাশগঙ্গা
আবার কোথাও কোথাও মাঠের মধ্যে এক একটা জল-পদবী
উঠে গেছে স্বর্গের দিকে
সেই সেবারেই তো বাবা অন্ধ হয়ে গেলেন, স্পষ্ট মনে আছে
রেলের ইঞ্জিন ড্রাইভার নেমে এসে মায়ের বাহু ছুঁয়ে
বলেছিলেন,
আমি মিত্তিরবাড়ির অতুল...

এই নতুন দেশের রাস্তাঘাটগুলো আলিঙ্গনের জন্য
হাত বাড়িয়ে আছে
কী সহজ সরল অনুবাদে হেসে উঠছে মুখ মনে-না-পড়া
বাল্যসঙ্গীর মতন মানুষেরা
গৃহগুলির ঘুরন্ত সিঁড়ি দিয়ে অনবরত উঠছে নামছে
অনেকগুলি চপল পা
ঠিক যেন নেমন্তন্নবাড়ি, এখনো কেউ কেউ আসে নি
শানাই বাজছে না বটে, তবু কোনো একটি সুরলহরী
ঢেকে দিচ্ছে কান্নার শব্দ
এ রকম কতই তো রোশনি ঝলমল উৎসবের পাছদুয়োরে
আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি
এ কেমন অচেনা রাজ্য যেখানকার প্রতিটি নারীর মুখই
আগে ছবিতে আঁকা হয়ে গেছে
আমার বুক পকেটের এক একটি ছবি আমি মিলিয়ে মিলিয়ে
দেখি
সব মন পড়ে যায়!

স্বপ্নের অন্তর্গত

কারুর আসার কথা ছিল না
কেউ আসে নি
তবু কেন মন খারাপ হয়?
যে-কোনো শব্দ শুনলেই বাইরে উঠে যাই
কেউ নেই—
অদ্ভুত নির্জন হয়ে শুয়ে আছে পৃথিবী
ঘুম ভাঙার ঠিক আগের মুহূর্তের স্বপ্ন নিয়ে...
আমিও কি সেই
স্বপ্নেরই অন্তর্গত?

কত না সহজ বলে

কত না সহজ বলে ভাবা গিয়েছিল
যেমন সহজ ঐ সতেরোই আশ্বিনের সকালের মেঘ
যেমন সুন্দর, শুভ্র, পাতা ঝরা—অবিশ্বাস
নরকের দিকে চাই, মনে হয় এই সেই স্বপ্নময়
লুপ্ত আটলান্টিস
অন্বিষ্ট নদীর কূল, ঢেউ ডানা মেলে আসে, রুপোলি পালকে
সব আধো আধো চেনা
নিষিদ্ধ দক্ষিণ দেশ দ্বার খোলে, ঝলসে ওঠে প্রিয় হাতছানি
কত না সহজ বলে ভাবা গিয়েছিল।

এদিকের খেলা ভেঙে ওদিকের আগুন জ্বলেছে
বনবাস শেষ করে কেউ ফিরে আসে, কেউ
ক্রমশ দুর্গমে চলে যায়
চৌচির ঘরের মধ্যে পড়ে আছে পাণ্ডুলিপি, জীর্ণ মখমল
উরু-সম্মিলনে স্বেদ, জন্ম থেকে জন্মান্তর খোঁজা
সখেদ বন্যার জল, ভেসে যায় সেতুর স্থপতি
সবুজের গায়ে লাগে রক্ত, অসংখ্য হাতের মধ্যে
ভুল বিনিময়...

কত না সহজ বলে ভাবা গিয়েছিল!

দু'চারটে পলাতক

যেদিকে যাবার কোনো পথ নেই, সেই দিকে
ছুটে যাওয়া ছিল আমাদের প্রিয় নেশা
শুকনো নদীর ধারে কাঁটা জংলা, আমূল খাড়াই
কেন এতো ভালো লেগে গেল
গহন রাত্রির বন, একদিকে বিন্দু বিন্দু আলো, দূরে
প্রগাঢ় নৈরাজ্য
তবু কেন সেই আলো পিছু টানলো না?
অন্ধকার নিয়ে গেল, অন্ধকার ভরে গেল হিমে!

সব পথ খোলাখুলি পৃথিবী তো এমনই নিষ্পাপ
যে একা হারিয়ে যেতে চায়, যাক, মানুষেরই
এই স্বাধীনতা
অথচ সবাই বলবে এ জীবন মানচিত্রে গাঁথা
ফিরে এসো, সুস্থ সমাজের জন্য পেতে দাও ঘাড়

যে কথা হাজারবার বলা হয়ে গেছে তাই
পুনঃ পুনঃ বলো
শৌখিন সন্ধ্যায় যাও রঙ্গালয়ে, দারিদ্র্যের জন্য দাও
করতালি ধ্বনি
সকলের সঙ্গে তুমি পায়ে পা মেলাও

দু-চারটে পলাতক তবুও বাইরে ছিটকে
লিখে যাবে অর্থহীন, ব্যক্তিগত, অকেজো কবিতা।

আর যুদ্ধ নয়

'কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!'
তুমি কে, তুমি কি গ্রহান্তরের দল-ছুট?
তোমার কখনো ছিল না কি শৈশব?
তুমি কি কখনো দেখোনি মাটিতে ঘুমন্ত কোনো শিশু?
জানলার ধারে দাঁড়ানো, একলা, শূন্যদৃষ্টি নারী?
কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!

নামাও রাইফেল
এ পৃথিবী তোমার একলার নয়
এ পৃথিবী লোভের, ঘৃণার, উন্মত্ততার নয়
আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে, আমি তোমার দিকে
আর তাকাতে পারছি না।

কী গভীর নিঃশব্দ বন চারদিকে
ওরা জানে, ওরা সব দেখেছে।
ধোঁয়ায় গ্রাস করছে নিষ্পাপ বাচ্চা ও ব্যাকুল মহিলাদের
ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিতদের দিকে উদ্যত মুষ্টি তুলেছে যারা
তারা কে?

কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!

ল্যাটভিয়ার রিগা শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে, জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, আমার মতন কঠোর লোকেরও কান্না এসে গিয়েছিল। চল্লিশ বছর আগে ঐ স্থানটিতে আশী হাজার শিশু-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। আমি কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের অনেক বর্ণনা আগে পড়েছি। কিন্তু বইতে পড়া আর নিজে সেরকম কোনো স্থানে উপস্থিত হওয়ার মধ্যে উপলব্ধির অনেক তফাৎ। সেখানে দাঁড়িয়ে আমার হঠাৎ মনে পড়ল, একটি বিখ্যাত চেকোশ্লোভাক যুদ্ধ-বিরোধী উপন্যাসের লাইন, "কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!" বাকি লাইনগুলি সেই অনুসঙ্গে লেখা। হয়তো ঠিক সুললিত কবিতা হলো না। কিন্তু লাইনগুলি এই ভাবেই আমার মনে এসেছিল। ঠিক সেইরকমই লিখে গেছি।

এবারের শীতে

এবারের শীতে নিরুদ্দেশের ওপারে
কথা দেওয়া আছে যেতে হবে একবার
যেখানে জলের বুক ভরে গেছে আগুনে
যেখানে বাতাস পাথরে লিখেছে মায়া।

এখন গ্রীষ্মে শ্রমের বিষম আড়াল
যেদিকে তাকাই পূর্ণতা জুড়ে খাঁ খাঁ

যেসব রাস্তা ডুব দিয়েছিল নদীতে
তারা ফের উঠে গা ঝাড়া দিয়েছে রোদে।

এবারের শীতে গৃহ-জঙ্গল ছাড়িয়ে
ক্লান্তি কলুষ তমসার জলে ধুয়ে
যেখানে অজানা রচেছে আপন নিরালা
কথা দেওয়া আছে, যেতে হবে একবার!

সুড়ঙ্গের ওপাশে

সুদীর্ঘ সরল একটা সুড়ঙ্গের ওপাশে একটু একটু আলো
কয়েকটি ছায়ামূর্তি হাত-পায়ের ন' দশ রকম
ভঙ্গিমায় খুব ব্যস্ত
অন্ধকারের গায়ে বিদ্যুতের মতন রং, ওরা কাকে ডাকে?
শব্দহীন এক উল্লাস, যেন মুক্তির হাতছানি
আমি কি অত দূরে যাবো, না পিছনে ফিরবো ?

মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য এই দৃশ্য, তারপরই পর্দায়
অন্য ছবি
বই ঘেরা ঘর, টি. ভি., টেলিফোন, মদের গেলাসের সামনে আমি
বাইরের কাটাকুটি রাস্তায় ঝলমলে আলোতে কোলাহল করছে
শহুরে রাতের পৌনে আটটা
ব্রিজ পেরিয়ে মফঃস্বল পর্যন্ত কংক্রিটের টংকার
মানুষের গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষিতে উৎপন্ন হচ্ছে তাপবিদ্যুৎ
আবার এরই মধ্যে চার-দেয়াল ঘেরা একাকিত্ব
অথচ মন খারাপ নেই, মিহিন বৃষ্টির গুঁড়োর মতন
দেখা যায় না এমন ঔদাসীন্য...

সুড়ঙ্গের ওপাশে ওরা ডাকে, ওরা ডাকে...

আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে

আমরা এ কোন ভারতবর্ষে আছি উনিশ শো চুরাশিতে?
লজ্জায় আমার মাথা ঝুঁকে পড়ে
রাগে সারা গায়ে জ্বালা ধরায়
দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়
চিৎকার করে উঠতে চাই কর্কশ গদ্য ভাষায়
আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে আছি...

পরিসংখ্যানে শুনি এদেশে সকলের জন্য খাদ্য আছে
কান্‌কুন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে বিশ্ববাসীকে বলেছিলেন
ভারত আর অন্নভিখারী নয়
তবু এ দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ দু'বেলা খেতে পাওয়ার
স্বপ্নও দেখে না
বাঁধের ওপর আমরা বসে থাকতে দেখেছি
ক্ষুধার্ত শিশুর পিতাদের অসহায় আলগা শরীর
আমরা শহরের ফুটপাথ দেখেছি, গ্রামের গঞ্জ, বাজার
হাটখোলা দেখেছি
আমরা পার্ক স্ট্রিট, বড়বাজার, ওয়াটগঞ্জ দেখেছি
আমরা রাইটার্স বিল্ডিংসের পালাবদল দেখেছি
আমরা দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথ জুড়ে
নপুংসকদের কষের ফেনা গড়াতে দেখেছি
এ কোন্ ভারতবর্ষে আমরা...

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের নিন্দে করার
কোনো অধিকার আমাদের নেই
কারণ, এদেশে হরিজনদের যখন তখন আমরা
পুড়িয়ে মারি
মার্কিন দেশের বর্ণবিদ্বেষ তো কিছুই না
এদেশের কালো মেয়েদের এখনো টাকার ওজনে
বিয়ে হয়
কিংবা হয় না
কিংবা, পরে তারা গায়ে কেরোসিন ঢালে
আমেরিকা রাশিয়ার পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কার চেয়েও ভয়ঙ্কর
আমাদের আত্মপ্রতারক, খালি হাতের,
লাঠি, ছুরি, বোমার গৃহযুদ্ধ

এখনো মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, গুরুদ্বারে বিকট ধ্বনি ওঠে
ধর্মের নামে রাস্তায় রাস্তায় রক্ত
আঃ, ধর্ম শব্দটি একদা কত সুন্দর ছিল, এখন
পুঁজ-রক্ত আর স্বার্থপরতায় মাখা
ধর্ম তো আফিম নয়, জাতীয়তাবাদ নয়,
ব্যক্তিগত শুদ্ধি নয়
শুধু ভেড়ার পালের পরিচালকদের উন্নত লাঠি
আমি দ্বিধাহীন ভাবে শতসহস্র নিঃশব্দ প্রতিবাদকারীর সঙ্গে
কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চায়
যে হিন্দু স্বার্থপরের মতো রোজ পুজোআর্চায় মাতে
যে মুসলমান পারিপার্শ্বিকের প্রতি চোখ বন্ধ করে রোজ পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে
যে খ্রিস্টান অন্য ধর্মের মানুষদের অধঃপতিত মনে করে
যে শিখ শুধু ধর্মের দাবিতে রাজনৈতিক অধিকার চায়
তারা শুধু আত্মপ্রবঞ্চক নয়, তারা অধার্মিক, তারা খুনি
প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তারা মাতৃহত্যা, শিশুহত্যার
জন্য দায়ী
তারা যে অপরের হাতে ক্রীড়নক সেটুকু বুঝবার
ক্ষমতাও তাদের নেই
তারা মানুষের সাম্যের মাঝখানে কাঁটা তারের বেড়া তুলে দিচ্ছে
এ কোন ভারতবর্ষে আমরা...

অন্ধ, গলা-ভাঙা, অভিমানী

অন্ধ, গলা-ভাঙা, অভিমানী
ফিরে এসো!

বসন্তে উড়েছে ছাই
ঝরে গেল নীল শূন্যতার মতো দিন

নক্ষত্রের ধ্বংসস্তূপে দীর্ঘশ্বাস অদৃশ্য নিশান
বাতাসে উন্মাদ সিঁড়ি যেন ঝাউবনে গত এক শতাব্দীর ঝড়

ফিরে এসো
হে অচিন্তনীয়, রাজ্যভাঙা স্বপ্নময়

টুকরো টুকরো অবিশ্বাসী, পলাতক
ফিরে এসো
বারুদ গন্ধের ঢেউ দু' হাতে সরিয়ে ফিরে এসো
দিনমান অন্ধকার, চতুর্দিক সশব্দ নীরব
ফিরে এসো
অন্ধ, গলা-ভাঙা, অভিমানী, হে প্রেমিক

ফিরে এসো।

ঋণ থাকে

কবিতা লেখার জন্য নদী আছে,
নৌকো কিংবা বেহুলার ভেলা, তাও আছে
যে মুহূর্তে লেখা হলো 'চুর্ণী' এই শব্দখানি
তখনই স্রোতের কাছে ঋণ জমা হলো
যার জানবার তাকে জানতে হয়, জানে, ঠিকই জানে।

পাগলা বাতাস এসে উড়িয়েছে ছবি, কিছু রং ফলিয়েছে
মন্দার বা তিল ফুলে সব ফিরে আসে
নিম্ননাভি অলসগমনা কেউ চলে গেল অমন চকিতে
দেওয়ালেও ফিরবে না, যদি ইচ্ছে হয়?
সবলে নারীকে কেউ আজও পায়নি জানা ইতিহাসে।

বকুল গাছের লাস্য, আলিঙ্গনও মুছে ফেলা যায়
প্রেমের তমসা নিয়ে লেখা যায় দুশো তিনশো পাতা
তারপরও বাকি থাকে, আকস্মিক বিস্মৃত মুহূর্ত
যেতে হয়, নদীর কিনারে যেতে হয়
হয়তো বা নৌকো নেই, বেহুলা তো আদপেই নেই
কলার মান্দাসে
আমাকেই একা একা ভেসে যেতে হবে।

স্থির চিত্র

এক একটা সুন্দর রাস্তায় একজনও মানুষ থাকে না
সোনালি রোদের আঁচে রাস্তাটি একাকিত্ব উপভোগ করে।
নানা রকমের সবুজ ছড়িয়ে থাকে দু'পাশে, একটি দুটি হলুদ খসে পড়ে।
দু'তিনটে গোরুর গাড়ি মনোকষ্টের মতন শব্দ করতে করতে অন্যদিকে
চলে যায় এদিকে তাকায় না
ঠিকাদাররা চেনে না এমন পথও রয়ে গেছে এই ব্যস্ত মহীমণ্ডলে?
কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই, মেটে মোরাম বিছানো, সরল বিস্তৃত
কখনো ঘুমোয়, কখনো জাগে
কৈশোর দুপুরের স্মৃতির মতন, আগামী শতাব্দীর স্বপ্নের মতন
কোনো নিষেধ নেই, তবু থমকে দাঁড়িয়ে আমি দেখি
সেই নিঃসঙ্গ পথটির অপরূপ নির্জনতা
পাছে সে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাই চোখ বুঁজি।

পালাতে পারবে না

স্টেশানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন, কাচ তোলা, কুচো কুচো বাচ্চাদের
বিরক্তিকর হাত দেখে মুখ ফেরাও, তুমি দেখতে পাবে
তোমার বাসমতী অন্নের মধ্যে কিলবিল করছে চুল
কলার খোসার মতন ওদের প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে কোথাও পালিয়ে যেতে
পারবে না
দু'পাশে প্রকৃতি নেই, ঐ সব ছোট ছোট হাত উপড়ে নিচ্ছে অরণ্য
ওরাই শুষে নিচ্ছে নদী
রক্তবীজের ঝাড়, প্রতিদিন দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ
দু'চারটে বাঘের পেটে গেলে বাঘও ভেদ বমি করে
কী ঝকঝকে ধারালো দাঁত ওদের, কী সাঙ্ঘাতিক কোমল প্রতিশোধ
খল খল করে হেসে ধেয়ে আসছে অযুত-নিযুত ধুলোমাখা শিশু
পালাতে পারবে না, যদি মানুষ হও, ফিরে দাঁড়াও
প্রভূত অন্যায়ের মধ্য থেকে খুঁজে নাও তোমার আত্মজকে!

শিল্প-সমালোচক

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের দু'বছরের বাচ্চা মেয়েটি
দমকা হাওয়ার মতন যখন তখন তাকে দেখতে পাই
তার পায়ে এখনও রয়েছে টলমল ছন্দ
তার ভাষা আমি সব বুঝি না
বিশ্বব্যাপী দুর্বোধ্যতার ভেতরের সরলতাকে সে
খুলছে একটু একটু করে
এক একটি জিনিস তুলে ধরে সে নিজস্ব নাম দেয়
যা তার পছন্দ হয় না, তা সে অনায়াসে ফেলে দিতে পারে
সে রোদ্দুরকে বলে পাখি
আর আয়নাকে বলে জল
তারপর এক সময় হঠাৎ সে মা মা বলে ডেকে ওঠে
আমি মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করি, কোথায় তোমার মা?
সে দেয়ালে মোনালিসার ছবির দিকে আঙুল তুলে
বলে, ঐ যে!

নদী জানে

নিরালা নদীর প্রান্তে পড়ে আছে
দুঃখী মানুষের নীল জামা
আর কেউ নেই, রোদ নেই
ছায়ামাখা শূন্য দিন
লোকটি কোথায় গেছে?
সে কি জলে নেমে গেল
সহসা হৃদয় জোড়া পাতাল সন্ধানে?
অথবা সে শুয়ে আছে
জঙ্গলের কারুকার্যময় স্তব্ধতায়?
তার নগ্ন শরীরের ওপরে ঝরেছে
শুকনো পাতা
দুঃখী মানুষেরা কোনো চিহ্ন রেখে
যায় না কোথাও
তবু এই নদীতীরে পুঞ্জীভূত নীল সুতো

যেন কারো জীবনকাহিনী
যেন কিছু নিশ্বাসের সারমর্ম
রাজ্যহারা অভিমান, সুখচ্ছিন্ন চিঠি
ও যেন আমারই, আমি একদিন এইখানে
নিঃশব্দে ডুবেছি, নদী জানে।

এক এক দিন

এক এক দিন সুনিশ্চিত চোখ খুলে ঘুম ভাঙে
সে এক অন্যরকম জাগরণ, যেন পাহাড়ী নদীর কিনারায়
একা বসে থাকা
তখন আকাশ আমার দিকে তাকায়
বারান্দার ফুলগাছটার প্রতিটি পাতা আমাকেই দেখে
পৃথিবী নিস্তব্ধ এবং আর কোথাও কোনো মানুষ নেই
এরকম একটা পাতলা অনুভূতি পাখির পালকের মতন
বাতাস কেটে ঘুরতে ঘুরতে নামে
আমার দু'চোখ রক্তিম, শিরা উপশিরায় গত রাত্রির নেশা
ভারী চমৎকার পা ফেলে এগিয়ে যাই অলীকের দিকে
আমি চেনা জায়গায় নেই, আমি কোথায় আমি জানি না
নিশ্বাসে পাই ছেলেবেলার শিউলি ফুলের ঘ্রাণ যেন
কিশোরীর সদ্য-ফোটা, শব্দময় বুক
এইসব দিন এক জীবনে একটি-দুটি বারই আসে
তখন এই বিশ্ব অনায়াসেই অন্য কারুকে
দান করা যায়।

দেয়ালে নোনা দাগ

দেয়ালে নোনা দাগ মেঘের খেলা
শিয়রে বইগুলি পাখির মতো
অলস বিছানায় ছুটির বেলা
বাসনা অশ্বটি অসংযত।

মাথায় ব্যান্ডেজ, দুপুরে তবু
শরীর জেগে ওঠে আকাশময়
দিনের ঈশ্বর রাতের প্রভু
এখন তারা কেউ আমার নয়।

এই যে মেঘরাশি ছোট্ট ঘরে
এখানে অশ্বের তুমুল হ্রেষা
মাতৃবন্ধন ছিন্ন করে
আত্মধ্বংসের নিভৃত নেশা।

সাধের স্বর্গকে এখন পারি
সহসা বলে দিতে, নরকে যাও!
আকুল মূর্ধজা ছবির নারী
দু'হাত তুলে বলে, আমাকে নাও!

ছবির মানুষ

বাক্স ভর্তি একটা পারিবারিক গল্প নিয়ে স্টেশনের
ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে একলা বসে আছে
একজন মানুষ
তিন চার দিনের বাসী দাড়ি, ময়লা হাফ-হাতা টুইলের শার্ট
বিড়ির ধোঁয়ায় মুচড়ে উঠছে তার জীবন
আমার ইচ্ছে করে ওর কাছে গিয়ে বসতে, কিন্তু বসি না...

বাজারের পাশের গয়না-বন্ধকীর দোকানটির কেন্দ্রমণি হয়ে আছে
এক হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ় মাকড়সা

একটি পোড়াটে চেহারার রমণী সেখান দিয়ে যেতে যেতে
একটু আস্তে হাঁটে, থামে না
তিনবার তাকায়
তার মধ্যে একটি চাহনি দশ-বারো বছর লম্বা
গুপ্ত দীর্ঘশ্বাসে সে উড়িয়ে দিয়ে যায় এক বিয়োগান্ত কাহিনী
কেউ টের পায় না...

সদর আদালতের পেছনের জামরুল গাছটার মাথায় থমকে থাকে
বিকেল চারটের উজ্জ্বলতম রোদ
একটা দোয়েল আধখানা গান হঠাৎ ফেলে রেখে কোথায়
মিলিয়ে গেল
ঐ দোয়েলের কোনো গল্প নেই, রোদ্দুরের কোনো গল্প নেই
কিন্তু জামরুল গাছটার নীচে ছাতা সারাইওয়ালার সামনে
উঁচু হয়ে বসে আছে যে লোকটা
এক মনে দেখছে সেলাই-এর সুচ-সুতোর ফোঁড়
তাঁর চোখের নীচে কালো সমুদ্র তটভূমি
সে কি সর্বস্ব ভাসিয়ে দিয়ে এলো এইমাত্র?

দিব্যি আছি

বুকের মধ্যে একটু আধটু দুঃখ পোষা
কিন্তু খুবই ভালো আছি
এই তো বেশ ঘুরছি ফিরছি
লম্ফ-ঝম্পে দিন পেরুচ্ছি
একটু খোঁচা, একটু ব্যথার টনটনানি
তবু বলবো দিব্যি আছি!

উল্টোপাল্টা ঝড়ের ধাক্কা খেয়েছি ঢের
সে সব হলো আগের জন্মে
যখন তখন আয়ুর খর্চা
আগুন হাতে ফুলের চর্চা
এই সবই তো খালিপেটের দুনিয়াদারি
দু'বার কি হয় মানবজন্মে?

নদীমাতৃক

নদীটির নাম সাসকাচুয়ান
দু'দিকে শুভ্র ঢেউ
এপারের আলো ওপারের হিম
ছাড়িয়ে হঠাৎ
পরা-বাস্তব কার যেন মুখ দেখে।
সহসা কিসের শব্দ উঠলো,
কে যেন বললো
বরফ ভাঙছে, শুনলে না কেউ?
বাতাস স্তব্ধ, আকাশের কোনো
চেনাশুনো নেই
শান্ত শায়িত ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যা...

আমি চলে যাই অন্য একটি
নদীর কিনারে
গ্রীষ্মদুপুর,
গয়না নৌকা
মাছধরা জাল
আড়িয়েল খাঁর তীরে বসে আছে
বাল্য মূর্তি
কপিশ মেঘের পটভূমিকায়
চিল সমারোহ
ভাটিয়ালি সুরে কে যেন ডাকছে
কার পুত্রকে
স্টিমারের ভেঁপু
দূরকে করেছে নিকট বন্ধু
মিহি দুঃখের কণা উড়ে যায় মেঘে।

কিসের বিষাদ, কেমন বিষাদ
মনেও পড়ে না
শুধু মনে পড়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকা
একাকিত্বের দারুণ গহন
চক্ষু না মেলে, শ্রবণ না খুলে
জীবনযাপন
এমন সময় নদী ডাকে নাম ধরে!

যাই যাই করে ওঠার আগেই
এ পৃথিবী কাঁপে
হাহা রবে কারা ধেয়েছিল যেন
ধুলোর কুহেলি
এদিকে ফাটল, ওদিকে ফাটল
মাটি খোঁজে জল, জলের শিকল
জলের আগুন,
জল-সংসার
প্লাবনের ধ্বনি
গর্ভ অতলে মিলিয়ে যাবার
প্রাকমুহূর্তে
কেউ যেন হাত ধরে দিয়েছিল টান!

নিপারের কূলে ভেঙে দিল ঘুম
দ্বিপ্রহরের
ক্ষণ আবল্লী
অতি বিখ্যাত সুন্দর চারদিকে
তবুও হঠাৎ আকাশ দু'ভাগ
চড়াৎ শব্দ
রুপালি ঝলক, ক্ষণ বিদ্যুৎ...
সেবারে বর্ষা অজয়ের পাড়
দাপিয়ে অনেক
দূরে ছুটছিল
সেতু উপড়িয়ে
খ্যাতি চেয়েছিল
মুথা ঘাস আর শালজঙ্গল
চাষীর মেয়ের বিবাহবাসর
সব ভেসেছিল ঘোলাটে প্রবল স্রোতে
আমিও গিয়েছি, ডুবেছি, ভেসেছি
এ নদীতে নয়
অন্য জোয়ার
এ দুনিয়া নয়, অন্য দুনিয়া
সে রকম ঘুম স্বপ্নে প্রথম দেখা!

এত সহজেই

ছোটখাটো ঘুম ছড়িয়ে রয়েছে এখানে ওখানে
নদীর কিনারে, বনে
ভোরের আলোর লুতাতন্তুর টুকরো টুকরো চাদর
যে-ছন্নছাড়া সময় উড়েছে, বারুদ পুড়েছে
সমগ্র যৌবনে
একবার তার নিতে সাধ হয় নির্জনতার আদর।
মনে পড়ে যায় কথা দেওয়া আছে বানভাসি গ্রাম
ভাঙা দেউলের কাছে
ফের দেখা হবে, পৃথিবী ঘুরছে, আমিও ফিরবো আবার
চাঁদ উড়ে যায় চৈত্রের ঝড়ে, চোখ ঝল্‌সায়
অহংকারের আঁচে
মুঠোয় বাতাস, এত সহজেই পেয়েছি যা ছিল পাবার!

যে আগুন দেখা যায় না

যে আগুন দেখা যায় না সে পোড়ায় বেশি
অণু-পরমাণু ঘিরে ধিকিধিকি জ্বলে
এ যেন তুলোর রাশি বাতাসের উৎসাহ জেনেছে
বৃষ্টি বা নদীও জানে
তারা সসম্মানে সরে যায়
যে আগুন দেখা যায় না সে পোড়ায় বেশি

জ্বলে তো জ্বলুক, পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে সব ছাই করে দিক।

আমার নয়

পাহাড় ভেঙে ভেঙে তৈরি হচ্ছে রাস্তা, আমার বুক ফেটে যায়
অথচ ঐ পাহাড় আমার নয়
পাহাড়ের ম্যাজেন্টা রঙের হৃৎপিণ্ড উপড়ে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়
কেউ একজন
আর কেউ পাহাড়ের উরুতে রাখে ডিনামাইট
বারুদের ধুলো মাখা মানুষ পিঁপড়ের মতন ছুটছে চতুর্দিকে
মনে হয় আমি মানুষও নই
মহারথী কর্ণের মতন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
মহাবাহু শাল গাছ
সে আমার বন্ধু ছিল না, সে আমার মৃত বন্ধুর মতন
একটু একটু করে এগিয়ে আসছে পথ
সে অনেক দূর যাবে, সে দিগন্তকে ছোঁবে ঠিক করেছে
দিগন্তও এখন ধুলো কাদা মেখে খেলছে
সরলরেখারা প্রতিজ্ঞা করেছে, যা কিছু অসমান সব
সমান করে দেবে
এই পাহাড়ের আড়ালে আর সূর্য লুকোবে না, এখানে
আর নিচু হয়ে আসবে না আকাশ
সূর্য কিংবা আকাশও তো আমার নয়!

ফেরা না ফেরা

ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো
দেখোনি পথের কাঁটা, দেখোনি তমসা?
স্বপ্নের ভেতরে জানো শূল, অপাপবিদ্ধের শুভ্র
অভিশাপ হাসি
প্রতিটি ধ্বংসের পর কারা দেয় এত সকৌতুক করতালি?
আর কেউ নেই, আমি ছাড়া আর কেউ নেই, যে দেবে নিশান
তাহলে কোথায় যাবো, কার কাছে যাওয়া এই না-ফেরার পথে?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো।

দেখোনি স্থাণুর কীট? দেখোনি সমস্ত দিন
ভুলের কাঁকর আর মুখ ভরা অনিন্দার ধুলো?
এ রকম কথা ছিল? যখন তখন সব
প্রয়াগে বিলিয়ে দেওয়া শপথ ছিলো না?
ছিঁড়ে যাই হাজার অদৃশ্য সুতো, আরও কিছু
যার নাম মায়া
যাবো না? এখন না যদি যাই, তবে আর কবে?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো!

একমাত্র উপমাহীন

সারা জীবন খোঁড়াখুঁড়ির শেষ হলো না।
এ যেন সেই বালির নীচে নদী
অথবা নয় নদী, কেননা নারীর মতন নদীরাও
কখনো হয় খুব আপন?
অন্ধকার স্রোতস্বিনী নারীরা নয় অচেনা?
একমাত্র উপমাহীন তুমি আমার বুকের মধ্যে
আমার তুমি, কিংবা আমি তোমার?

রহস্যময় অজানা থেকে একটি দুটি শব্দ হঠাৎ উড়ে আসে।
তারা নিজেই কবিতা হয়ে গড়ে ওঠে,
আবার হয়তো ওঠে না!
আমিই লিখি, আবার তাকে আমিই অপছন্দ করি
নিজের ওপর রেগে উঠি, কে রাগায়?
মধ্যরাতের অস্থিরতা সে কি আমার?
যুক্তিবিহীন ভালোবাসা পাগল করে ছুটিয়ে মারে
অথচ আমি সবই জানি, তুমি জানো না?

এ পৃথিবী জানে

এ পৃথিবী জানে কারো কারো বুক শূন্য
এ পৃথিবী জানে কেউ ভ্রমরের খুনি
কেউ অবেলায় বিজনে হারায়, বিষণ্ন বালিয়াড়ি
এ পৃথিবী জানে, মানুষে মানুষে
আজও চেনাশুনো হয়নি।

মানুষের জন্য নয়

এত ফুল, এর কোনটাই মানুষের জন্য নয়
মানুষের চোখের জন্য নয়, মানুষের ইন্দ্রিয়ের জন্য নয়,
সবই তুচ্ছ কিছু পোকা-মাকড়ের জন্য।
মানুষ তার রূপ দেখেছে, মানুষ তার ঘ্রাণ নিয়েছে
মানুষ লিখেছে কত কাব্য, লিখেছে গান।
জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের মানুষ কুসুমসঙ্গী হতে ভালোবাসে
গোলাপ, গন্ধরাজ, চাঁপা, মল্লিকারা তা গ্রাহ্যও করে না,
তারা শুধু কীট পতঙ্গের জন্য মেলে রাখে সর্বস্ব।
হায় মানুষের জন্য একটাও ফুল ফোটে না।

সে

রেল লাইনে মাথা পেতে যে লোকটা শুয়ে আছে
সে বিশ্বশান্তির কথা চিন্তা করেনি
সে এসেছে অনেক দূর থেকে
অন্ধকার মাঠের মধ্যে বার বার হোঁচট খেতে খেতে
সে একজন কষ্টসহিষ্ণু মানুষ
সে কোন কবিকেও প্রেরণা দিতে চায় না।

দুই কবি: একটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকার

গঙ্গাতীরে এক তীর্থক্ষেত্রে চৈত্র সংক্রান্তির পুণ্যস্নান
এসেছে অসংখ্য মানুষ, বলদর্পী রাজপুরুষ, বহু অকিঞ্চন
অনেক সৌভাগ্যবতী রমণী, তেমনই অনেক অভাগিনী
এসেছে বৃদ্ধ ও শিশুর দঙ্গল, প্রহরী ও পরস্ব-অপহারী
এবং দুই কবি।

একজন বহু খ্যাতিমান, সম্ভ্রান্ত ও মাল্যবান, সার্থকতা মাখা মুখ
এসেছেন পাল্কী-বেহারা ও সাঙ্গোপাঙ্গ, ঐশ্বর্যের বিচ্ছুরণ নিয়ে
মিথিলার রাজকবি ইনি, বিদ্যাপতি।
অন্য কবিটিকে কেউ চেনে না এখানে, অতি সাধারণ
পরিব্রাজী ব্রাহ্মণের মতো, অঙ্গে সেলাই-বিহীন বসন
মুণ্ডিত মস্তকে দীর্ঘ শিখা, ধূলি-ধূসরিত নগ্ন পা
ইনি বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাস।

প্রথম অবগাহনের পর বক্ষ-সমান জলে দাঁড়িয়ে
সূর্যবন্দনা করছেন বিদ্যাপতি।
চণ্ডীদাস জলে নামেন নি এখনো, অল্প দূরে, তীরে দাঁড়িয়ে
মুগ্ধ ভাবে দেখছেন, শুনছেন গভীর অভিনিবেশে
জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, অতি নিখুঁত দেবভাষায় শ্লোক উচ্চারণ।

স্নান সেরে ওপরে এলেন বিদ্যাপতি, শিবিরের দিকে পা বাড়িয়ে
শীর্ণকায় ব্রাহ্মণের উৎসুক নয়ন দেখে থামলেন,
আজ তিনি কোনো প্রার্থীকেই ফেরাবেন না
হাঁক দিয়ে বললেন, ওরে, কে আছিস
এই ভিক্ষুটিকে দে কিছু তণ্ডুল ও স্বর্ণকণা!
চণ্ডীদাস ছুটে এসে নতজানু হয়ে বসলেন
বিদ্যাপতির পায়ের কাছে, আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বললেন,
আপনি যে আমার প্রতি কৃপার দৃষ্টিতে চেয়েছেন
তাতেই ধন্য হয়েছি আমি, হে কবিকুল-তিলক
আমি শুধু দর্শন করতে এসেছি আপনাকে। এ অধমের নাম
দীন চণ্ডীদাস।

বিরক্তিসূচক ভুরু কপালে উঁচিয়ে বিদ্যাপতি
বললেন, সদ্য স্নান করে এসেছি আমি, তুমি অস্নাত,

ব্রাহ্মণ, আমায় তুমি স্পর্শ করলে?
যেন বিদ্যাপতি তাঁকে পদাঘাত করবেন, এই ভেবে
দ্রুত সরে এলেন চণ্ডীদাস, হাত জোড় করে বললেন,
গঙ্গাতীরের বায়ুও পবিত্র, হে মান্যবর, এই বাতাসে
যে আচমন করেছে তার স্পর্শে কিছু অশুচি হয় কি?
এখানের ধারাবর্ষণও তো গঙ্গোদক, আমি সিক্ত ভোরের বৃষ্টিতে।

বিদ্যাপতি : তবু জেনে রেখো, শুচি বা অশুচি যাই হোক
পুরুষের স্পর্শে আমার প্রদাহ হয়, পুরুষেরা পরস্পর
দূরে থাকা ভালো।

চণ্ডীদাস : আমি অপরাধী; দর্শনই যথেষ্ট ছিল, পাদস্পর্শে
আমার অতি ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, ক্ষমা করুন।

দুই ভৃত্য দুই দিক থেকে মুছে দিতে লাগলো বিদ্যাপতির
গৌর তনু, তিনি ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে
অকস্মাৎ দৃষ্টি নামিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি, কী নাম বললে হে,
চণ্ডীদাস? যেন চেনা চেনা
তুমি কিছু গীত রচেছো নাকি?
চণ্ডীদাস আপ্লুত স্বরে উত্তর দিলেন,
স্বয়ং রচনা করি এমন সাধ্য কি আমার!
দেবী বাশুলীর দয়া, কখনো আমাকে দিয়ে
কিছু কাব্যলহরীর প্রকাশ ঘটান!

বিদ্যাপতি : 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ', তুমি...মহাশয়,
আপনি কি সেই চণ্ডীদাস?

চণ্ডীদাস আছেন অসংখ্য কবি, তার মধ্যে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক
চণ্ডীদাস। আমি সে-ই বটে!

ভৃত্য দু'জনকে সরে যাবার ইঙ্গিত করলেন বিদ্যাপতি
তার প্রশস্ত ললাট হলো সীমাবদ্ধ
উন্নত মুখশ্রীতে পড়লো বিষাদের ছায়া
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এবারে বুঝেছি!
আমার স্মৃতি-বিভ্রম, ঊষাকাল থেকেই আমি রয়েছি বিষম অন্যমনা
সেই সুযোগে আপনি
বিদ্রূপের কশাঘাত হানতে এসেছেন আমাকে।
আপনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি
আর আমি এক রাজভৃত্য মাত্র!

চণ্ডীদাস : এ কী কথা বলছেন, হে কবি-অগ্রগণ্য

আপনার খ্যাতি এ ভারতমণ্ডলে কে না জানে?
স্বয়ং মহারাজ শিব সিংহ আপনার কাব্যসুধার অনুরক্ত
এমনকি দিল্লির বাদশাহ পর্যন্ত দিয়েছেন জায়গির...

বিদ্যাপতি অবশ্যই! রাজসভায় যত আছে বেতনভুক পাঠক
তারা উচ্চৈস্বরে গায় আমার অলংকারবহুল কাহিনী-গাথা
অভিজাতবৃন্দ তা শোনে, বুঝুক বা না-বুঝুক আহা আহা করে
আর, আপনার গীত আস্বাদন করে
আপামর জনসাধারণ দূর দূরান্তরে
আমি জানি, বাতাস-বৃষ্টি ও রৌদ্রের মতন স্বতঃস্ফূর্ত
আপনার পদাবলী সমগ্র রাঢ়-বঙ্গে
অতি সাবলীল ভ্রমণ-স্বপনে যায়
আপনি ধন্য, আমি বন্দী!

চণ্ডীদাস কাব্যকলার অধীশ্বর, আপনি, আমাদের গুরু
আপনার রসজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান গঙ্গা-যমুনার
মতো মিলে মিশে আছে
আপনার শব্দ ঝংকার, চকিত রঙিন উপমার ব্যবহার
আপনার নব রসের অতি নিপুণ সুষ্ঠু প্রয়োগ
এসব কোথায় পাবো আমি
আমি শিক্ষাহীন, দীন হীন অভাজন।

বিদ্যাপতি অনেক জেনেছি, তাই আমি সারল্য ভুলেছি।
সুষ্ঠু নব-রস নয়, প্রথম রসেরই স্রোত বইয়ে দিয়েছি বেশি
কেননা নপুংসক রাজবর্গ শুধু ও রসেই তৃপ্তি পায়।

চণ্ডীদাস : আপনি অমর প্রেম-সঙ্গীতের উদ্গাতা

বিদ্যাপতি : আর আপনি, বিপ্র চণ্ডীদাস, প্রণয়ের সঙ্গে
অবাধে মেশাতে পেরেছেন উদাসীনতা
আপনি গান বেঁধেছেন কানু ও রাইকে নিয়ে
আমার কাব্যে ওরা রাধা-কৃষ্ণ, যেন অন্য মানুষ
আমার কৃষ্ণের সঙ্গে লালসাময় বয়স্ক রাজার আদল
আর আপনার কানু যে-কোনো রাখাল।

চণ্ডীদাস আপনি পেয়েছেন প্রতিষ্ঠা

বিদ্যাপতি আপনি পেয়েছেন নাম-না-জানা অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা

চণ্ডীদাস কী যে বলেন, মহাকবি! আমি অভাজন
দুবেলা জোটে না অন্ন, হট্টমন্দিরে শুয়ে থাকি
যদি পেতাম আপনার মতন স্বাচ্ছন্দ্য, সুখের আশ্রয়
হয়তো আর একটু মন দিতে পারতুম কাব্য-সরস্বতীর
সাধনায়!

বিদ্যাপতি আমার অন্ন ও বস্ত্র প্রয়োজনের অনেক বেশি, তাই
এসেছে অরুচি!
পার্থিব কিছুরই নেই অভাব, হায়, তবু
অপার্থিব কোনো চিন্তা মস্তিষ্কে আসে না!

চণ্ডীদাস আপনি পেয়েছেন রাজমহিষী লছিমা দেবীর প্রশ্রয়
এমন সৌভাগ্য হয় কোন কবির?

বিদ্যাপতি আমিও শুনেছি, রজকিনী রামতারা, নারী শ্রেষ্ঠা,
আপনার সাধনসঙ্গিনী

চণ্ডীদাস : সে যে অতি নগণ্যা

বিদ্যাপতি : তবু সে-ই জানে প্রণয়ের গূঢ় মর্ম, তাই আপনার কবিতার
প্রতিটি চরণে এত সুধা-সরোবর!
রাজমহিষীর আলিঙ্গন
আমাকে দিয়েছে শুধু সোনার শৃঙ্খল!

চণ্ডীদাস কবি বিদ্যাপতি, আপনি মিছে আত্মগ্লানি করছেন
যে জীবন অনিশ্চিত, পদে পদে অন্নচিন্তা, প্রতিবেশীদের
অবহেলা
সে জীবন সুখের মোটেই নয়, বড় জ্বালা, পথে পথে
অনেক কণ্টক
অনেক সয়েছি আমি, আজ ক্লান্ত, পেতে ইচ্ছে হয়
কিছু স্বস্তি, কিছু আরামের দ্রব্য, কিছু উপভোগ।

বিদ্যাপতি : আমার তো ইচ্ছে হয় সর্বস্ব দিতে বিসর্জন!
এখনো সময় আছে...

চণ্ডীদাস কী আশ্চর্য, আপনি স্বেচ্ছায় বরণ করতে চান দারিদ্র্য?
অথচ দরিদ্র আমি, মনে ছিল সুপ্ত অভিলাষ
আপনার সূত্র ধরে পাই যদি কোনো রাজ-অনুগ্রহকণা
একখানি নিজস্ব কুটির, কিছু শস্যভূমি

বিদ্যাপতি থমকে রইলেন ক্ষণকাল, বুঝি অশ্রুবাষ্পে
রুদ্ধ হয়ে এসেছে তাঁর কণ্ঠ
পুনরায় মুখ তুলে বললেন, ভ্রাতঃ, তা হলে আসুন
এখুনি বদল করি আমাদের দু'জনের জীবনের গতি
নিন সব মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, দাসদাসী
ভিক্ষা দিন আপনার ছিন্ন উত্তরীয়
আসন গ্রহণ করুন আপনি রাজসভায়
আমি ভ্রাম্যমাণ হবো উন্মুক্ত প্রান্তরে
রানী লছিমার বক্ষ আপনার আশ্রয় হোক,

আমি যাবো রামী ধোপানীর কাছে, চাইবো তার দয়া
আপনি ভোগ করুন পলান্ন ও সোম
আমি উপভোগ করবো নুন-ভাত, ঝর্ণার পানীয়
শুরু হোক আমাদের বিপরীত নতুন জীবন...

তারপর দুই কবি আবেগ-ধাবিত হয়ে
এরকম ভাবে আলিঙ্গন করলেন পরস্পরকে যেন
দু'জনের শরীর মিশে একটি শরীর হয়ে গেল।

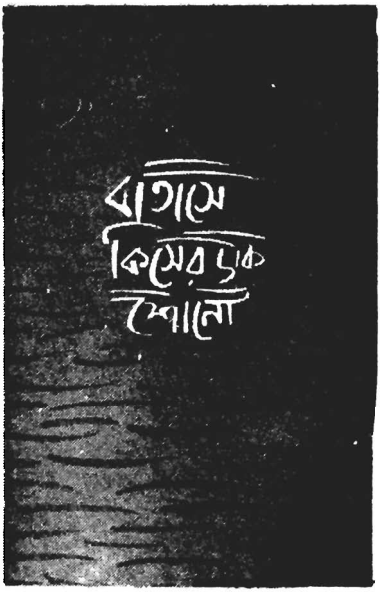

বাতাসে কিসের ডাক, শোনো

সূচিপত্র

আড়ালে, আড়ালে ৮৯, তবু আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা ৯১, পিছুটান ৯১, কাছাকাছি মানুষের ৯২, এক ঝলক ৯২, বীর্য ৯৩, স্বয়মাগতা ৯৩, দাও সামান্য ৯৪, বাতাসে কিসের ডাক, শোনো ৯৫, বান্ধবগড়ের ধ্বংসস্তূপে ৯৬, অন্য কেউ দেবে ৯৭, নীরা, তুমি কালের মন্দিরে ৯৮, এই সব দেখে শুনে ৯৮, এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে ৯৯, শুধু যে হারিয়ে গেছে ১০৪, ঘোরায় কেন একটি বিন্দু ১০৫, আমায় ডাকছে ১০৫, ব্রিজের ওপর থেকে নদী ১০৬, নীরা, গৌতম বুদ্ধ ১০৬, পিঁপড়ের এপিটাফ ১০৭, মাত্র এই এক জীবনে ১০৮, মানুষ রইলে না ১০৯, দিগন্ত কি কিছু কাছে ১০৯, শান্তি শান্তি ১১০, দেরি করা যাবে না ১১০, দেরি ১১১, জলের মধ্যে মিশে আছে ১১১, আমি আসছি, আসছি ১১২, সরল গাছের ছায়া ১১২, তার আগে, তার আগে ১১৩, দ্বিধা ১১৩, ভালোবাসতে চাই ১১৪, কতদূরে ১১৫, মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে...১১৫, রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা ১১৬, মেস্কালীন ১১৭, আপলিনেয়ারের সমাধিতে ১২০

আড়ালে, আড়ালে

পিঠের চামড়ায় একটু একটু করে কাঁপছে
ভয়
যেন পদশব্দের আড়ালে
অন্য শব্দ
যেন অজানা আশঙ্কা বাঁশি বাজাচ্ছে গাছের ডালে বসে
যেন কেউ থামতে বলছে
যেন কেউ বললো,
বড় দেরি হয়ে গেল
ফিরে তাকালেই ধূল্যবলুণ্ঠিত জ্যোৎস্নার নিস্তব্ধতা
কে ওখানে?
পাতার আড়ালে তুমি কে?
বনভূমি সাড়া দেয় না, যেমন রাত্রিও নির্নিমেষ!

বারুদের কারখানা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি
তবু দেখা গেল না বাল্য সঙ্গীদের
নদীর খাতের মধ্যে নদী
নেই
যেন মানুষ ঘুমোচ্ছে অথচ স্বপ্ন দেখছে
না
একটা শুকনো প্রান্তরে কাঁচা কাঠের আনমনা আগুন জ্বেলে
মনস্বীরা গোল হয়ে বসে পুড়িয়ে খাচ্ছেন ইতিহাস
আকাশে চতুর্বর্ণ মেঘ, তার নীচে রক্তিম সুতোর
ওড়াউড়ি
ঢেউয়ের মতন দুলতে দুলতে
ঢেউয়ের মতন মুখ বদলাতে বদলাতে
আসছে ঝড়, খেলতে এলো ঝড়
মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে, বন পেরিয়ে পাহাড়ে
কে ওখানে?
গুহার আড়ালে তুমি কে?
পাহাড় মানুষের সঙ্গে কথা বলে না, ঝড়ও না!

যেখানে একটা রাস্তা ছিল, সেখানে কাগজের স্তূপ
অক্ষর অনেক মুছে গেছে, বৃষ্টিতে ধুয়েছে
অবশ্য নানা রকম সেলাইগুলি বেশ মজবুত

এই রাস্তায় একটি করমচা রঙের কিশোরী
একদিন
একটি গাছের কাছে মনের কথা বলতে গিয়ে
প্রথম স্তনস্পন্দন টের পেয়েছিল
গাছটি মিলিয়ে গেছে সভ্যতায়
কিশোরীটি টুকরো টুকরো হয়েছে ছাপাখানার জঠরে
তার ধবল হাঁসের মতন উরুতে মাথা রেখে
যে কেঁদেছিল
সে পরে মাথা ঘামিয়েছে অসংখ্য উপমায়
বজ্র পতনের শব্দে পাথর ফাটে, কাগজের মণ্ড
নড়ে না
কে ওখানে?
বৃষ্টির মধ্যে কে যায়?
কেউ না, কাগজ হাসছে, ভাসছে কাগজের নৌকো!

বাউলের গায়ের নানা রকম রঙের জামার মতন
এই অরণ্য
দিনাবসানের আসন্ন বেলায় হাতছানি দিল
দিগন্ত এমন লাল
যেন বন্ধুকে ছুরি মেরেছে বন্ধু
যেন সমস্ত নিভৃত কথা ভুলে যাবার লজ্জা
মিহিন হয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে এই আকাশ থেকে
অন্য আকাশে
কেউ আসন পেতে রেখেছিল
আমি যাইনি
এখন আমি এসেছি, কেউ নেই
কেউ নেই, তবু কেন নিস্তব্ধতার এমন প্রবল শব্দ
কে ওখানে?
নিঃসঙ্গতার আড়ালে তুমি কে?
আকাশ লুটিয়ে পড়ে, গাছপালা কাঁপিয়ে দেয় হাওয়া!

তবু আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা

এক এক রকম অন্যায় আছে, যা আয়নার উল্টোপিঠের মতন
খুব কাছে কিন্তু কেউ উঁকি মেরে দেখে না
এক এক রকম মাকড়সার জাল আছে, যা উৎসব বাড়ির সন্ধেবেলায়
হিসিভেজা পোষাকের মতন, প্রকাশ্যে খুলে ফেলা যায় না
এক এক রকম কুমিরের কান্না আছে যা শুধু খবরের কাগজের
পৃষ্ঠা ভাসিয়ে দেয়
এক এক রকম ভালোবাসা আছে যা নদীর কিনারে ভাসমান
শবের মতন
কেউ চেনে না, চিনতেও চায় না
এক এক রকম বন্ধুত্ব শুধু দরজার পর দরজা বন্ধ করে দেয়
এক এক রকম প্রকৃতি আছে যা শুধু দুঃস্বপ্নেই সুন্দর
এক এক রকম ধ্বংস আছে যা রাত্রির বিছানায় প্রমত্ত
সুখের মতন
অথচ চায় গাঢ় প্রতিশোধ
এক এক রকম জীবন আছে যা অলীক কেল্লার বিশ্বস্ত
প্রহরীর মতন
তবু আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা ভরে যায়।

পিছুটান

মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখি আকাশে লাল মেঘ
আসবে, যে কোন সময়ে সে এসে পড়বে, সে আসবে
তার আগে সেরে নিতে হবে কি অসমাপ্ত কবিতার কাজ?
কাগজের মাথায় আলপিন, বুকে পাথর
মেঝেতে ছড়ানো টুকরো টুকরো বাল্যস্মৃতি
উড়ছে ধূসর রঙের ঘোড়া। শুনতে পাচ্ছি হ্রেষা
বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মতন নাদ ব্রহ্ম, অসংখ্য নিশান
কী যেন বাকি রয়ে গেল, কী যেন, আঃ এত পিছুটান!

কাছাকাছি মানুষের

যারা খুব কাছাকাছি তাদের গভীরে যেতে যেতে
একদিন থেমে যাই, কেননা এমন দূর পথ
যেতে হবে, তাও তো ছিল না জানা, যারা খুব চেনা
তাদের হৃদয় খুব জানাশোনা ভেবে বসে আছি
যত ভালোবাসা স্নেহ পাবার নিয়মে পেয়ে গেছি
কখনো ভাবিনি তার প্রত্যেকের ভিন্ন বর্ণচ্ছটা
প্রত্যেক হৃদয়ে বহু কুয়াশার ইন্দ্রজাল, মৃদু অভিমান
কাছাকাছি মানুষের বিশাল দূরত্ব দেখে থমকে গিয়ে দেখি
ফেরার রাস্তাও যেন মুছে গেছে, সেই থেকে আমি
কাছাকাছি মানুষের সুদূর রহস্যে মিশে আছি।

এক ঝলক

পাট পচা পাংশু জলে স্নান করছে এক জোড়া অপ্সরী
অবনত সন্ধেবেলা অপরূপ অলীকের আব্রু ঘিরে ছিল
গোরুর পায়ের ধুলো, দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি তাও মায়াজাল
অদূরেই ট্রেন লাইন, প্রতীক্ষার শোঁ শোঁ শব্দ উন্মার্গ বাতাসে।

খিদের মতন ধোঁয়া এ বাড়ি ও বাড়ি ঘোরে, যায় না তবুও
ছাইগাদায় শুয়ে থাকা পুঁয়ে পাওয়া কুত্তাটির চোখ বুঁজে আসে
যেমন ঘুমের মধ্যে চলে যাওয়া, যেমন ঘুমের মধ্যে ফেরা
মানুষও আসে যায়, কারা এলো, কারা গেল, কিবা যায় আসে!

ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছে রোগা রোগা পাখিদের শব্দ-অভিমান।
ওদের প্রপিতামহ এই দেশে সুখে ছিল তাকি ওরা জানে?
রেলের খালের ধারে যে শিশুটি হিসি করে সে কিছু জানে না
হিজল ডালের বাঁকা দুটি উরু, মুখখানি নষ্টচাঁদ।

আঁচল গুছিয়ে দুই অপ্সরী কি উড়ে যাবে, জল তবু টানে
ভিতু জল খুশি হয়ে চাটে নিম্ন উদরের রক্তিম লাবণ্য
দুই সখী খলখলিয়ে হাসে, বুক খুলে দেয়, দেরি হয় হোক
চতুর্দিকে এত অসুন্দর তবু এক ঝলক হঠাৎ সুন্দর।

বীর্য

যাও নতুন উপনিবেশে, নতুন রাস্তায় বাড়ি হাঁকো
ডিপ টিউবওয়েলে ভেজাও বালিয়াড়ি
লাগাও ম্যাজিকের কৃষ্ণচূড়া গাছ
গর্ত থেকে টেনে তোলো সাপ, এখানে শিশুদের পার্ক হবে
মহেঞ্জোদারো থেকে শিখে নাওনি ভূগর্ভ পয়ঃপ্রণালী?

কীট-পতঙ্গের সংসার ভাঙো, এখানে
শুরু হবে মানুষের সংসার
মানুষের জন্য আরও চাই, আরও চাই, সব ভূমি চাই
প্লট ভাগ করো, দক্ষিণ খোলা নিজের জন্য নাও
ভিত্ পুজোর জন্য দু'ঘণ্টা
তারপর খোঁড়াখুঁড়ি, ইঁট-কাঠ-লোহা...

এখনো যেখানে শূন্য সেই তিনতলায় একদিন
সুখ শয্যায় শুয়ে তোমার নারীর গর্ভে বীর্য নিষেক করবে
হ্যাঁ, বীর্য যেন থাকে, যেন থাকে, শুকিয়ে না যায়
তার মধ্যে!

স্বয়মাগতা

স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারাদিন
সবার চোখের সামনে দিয়ে মায়ার মতন আড়াল করা জীবন
কিংবা যেমন ত্রিবেণী সংগমের সরস্বতী নদীর ধারা
স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারা দিন।

একটু একটু দগ্ধ করে শেষ করেছি সব আরব্ধ যজ্ঞ
হাড়ের বাঁশি সুর সেধেছে ও কিছু নয়, কিছুই যেন কিছু না
চামড়া-পোড়া গন্ধ নিয়ে গর্ব ভরে গেছি সভার মধ্যে
আঙুল কাটা রক্ত চুষে বলেছিলাম, দ্যাখো কেমন পাওয়া!

আমার ঘরে জমানো সব টুকরো-টাকরা, যেন মুণ্ডমালা
ভালোবাসায় ছাই উড়েছে, মহাদলিলখানায় জ্বললো আগুন
যেন আকাশ নেই, অথচ সূদূর সীমা ডেকে বললো, এসো
স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারা দিন

স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারাদিন
দিনের মধ্যে আল-জাঙাল, দু' হাতে কান চাপার মধ্যে হাসি
রূপ কিংবা সিংহাসন বা ধুলোর মধ্যে ছড়িয়ে থাকা স্বপ্ন
স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারা দিন।

দাও সামান্য

আর কিছু নয়, দু' আঙুলের ডগায় নুন তোলার মতন
দাও ভালোবাসা!

কবে লিখেছিলাম এমন, পঁচিশ বছর আগে?
কাকে, কার উদ্দেশে, মনে নেই।
আমার শরীরময় মারকিউরোক্রোম ছাপের মতন ক্ষত
কিংবা স্মৃতি
আমি দুঃখ-টুঃখ পুড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছি
আলিঙ্গনের উষ্ণতা পেয়েছি বলেই টকাটক উড়িয়েছি গরলের পাত্র
কতবার কৌতুকহাস্যে অপরের চোখের জল চেটেছি জিভে
শরীর চেয়েছে শরীর, দিয়েছি, নিয়েছি
শরীর ডানা মেলে উড়ে গেছে, বিছানায় কয়েক ফোঁটা
ভিজে দাগ
বিষাদপন্থীদের মতন যাইনি প্রকৃতি-বন্দনা ছন্দে মেলাতে
তবু আজ মেঘলা আকাশ ও ঘুমন্ত পৃথিবীর মাঝখানে
একলা দাঁড়িয়ে আবার বলতে চাই
দু' আঙুলের ডগায় নুন তোলার মতন দাও,
দাও সামান্য ভালোবাসা!

বাতাসে কিসের ডাক, শোনো

যাবে?
ক্ষণেক দাঁড়াও, আগে ট্যাকের গিঁটটা কষে বাঁধি
যাবে?
কে বললে যাবো না, একটু দিগন্তকে ওড়াই ফুঁ দিয়ে
যাবে?
তিনটে পঞ্চান্নর ট্রেন, হাতে কিছু হকার্স মার্কেটে কেনাকাটি
যাবে?
যাওয়ার জন্যই আসা, তবে এত ব্যস্ততা কিসের
যাবে?
চেয়ে দ্যাখো, সোনা ভেঙে ধুলো হচ্ছে, ধুলোয় গড়াচ্ছে স্বাধীনতা
যাবে?
যে যেখানে খুশি যাক, আমার এ ভাঙা ঘরে প্রিয় অন্ধকার
যাবে?
পা বাড়িয়ে বসে আছি, চীন থেকে আসুক বারুদ
যাবে?
যাবো কি যাবো না আমি নিজে বুঝবো, তুমি কে হে ফোঁপর
দালাল
যাবে?
আজকে র‍্যাশান কার্ড দেবে, আজ অন্য সব ঝুট-ঝামেলা বাদ
যাবে?
দুপুরে শ্মশানে যাবো, রাত্রে এক বিয়ে বাড়ি, না গেলেই নয়
যাবে?
কোথায় যাবে হে, এসো, সস্তায় জোটানো গেছে এক বোতল
রাম
যাবে?
যমও ফিরে গেছে দু'দুবার খালি হাতে, তুমি নাও এক টুকরো
বাতাসা
যাবে?
লিবিডো প্রবল, শুধু মনে হয় বাকি রয়ে গেল অর্ধরতি
যাবে?
ছেলেটার উচ্চ মাধ্যমিক, এ বছর প্রশ্নই ওঠে না
যাবে?
পুরুষ সাম্রাজ্য আগে ভেঙে যাক, ঘাসবন থেকে হোক সভ্যতার
শুরু

যাবে?
ঘা শুকোচ্ছি। গতবার যেতে গিয়ে যা যা হলো কিছুই ভুলিনি
যাবে?
আমার নিজস্ব পথে যাবো, তাই পাথর ও কংক্রিটের অর্ডার
দিয়েছি।
যাবে?
গুরুমন্ত্র কানে আছে, আর সবই লাল-নীল সোনালি লালসা
যাবে?
মূর্খরাই কামানের খাদ্য হয়, সেনাপতি থাকে ঠাণ্ডা ঘরে
যাবে?
নিয়তি রেখেছে বেঁধে ভালোবাসা-অশ্রু-রক্ত মাখা এক নিশানের
নীচে
যাবে?
মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, ভাই বোন...আমার তো ইচ্ছে ছিল খুবই
যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে?
যাবে? যাবে? যাবে?.....

বান্ধবগড়ের ধ্বংসস্তূপে

দেয়ালই ছিল না ফাটলের কথা কী করে বা মনে আসবে
সেসব দিনের হৃৎস্পন্দনে ঝড়ো হাওয়া ছিল সঙ্গী
ছেঁড়া চপ্পলে ভিখারির হাসি, কার্পাস বীজ সন্ধ্যা
ধুলো সুন্দর, খিদে সুন্দর, পায়ের ব্যথায় সুন্দর
দেয়ালই ছিল না ফাটলের কথা কী করে বা মনে আসবে।

টুকরো আগুন যে-যেমন চায় ফুলকি উড়েছে নদীতে
গরল-শাসনে সুধা কৌতুক, আয়ু বাজি রাখা উৎসব
প্রিয় নিশিডাক, নিত্য নতুন পথ ছুটে গেছে স্বর্গে
ধুলো সুন্দর, খিদে সুন্দর, পায়ের ব্যথায় সুন্দর
তবুও তৃষ্ণা মেটেনি এখানে ধ্বংসের মরীচিকা!

দেয়ালই ছিল না ফাটলের কথা কী করে বা মনে আসবে
কার অরণ্য কোন অরণ্য এসবই আমার অচেনা

পটভূমি নীল বাঁধের ওপাশে পীতাভ রঙের অশ্ব
কিছু না থাকার স্মৃতি গম্বুজে দোয়েল পাখির শিস
ধুলো সুন্দর, খিদে সুন্দর, পায়ের ব্যথায় সুন্দর!

অন্য কেউ দেবে

অর্জুন বৃক্ষটি থেকে একটি পাতা খসে পড়লো, জানি
এ আমারই জন্য শুধু, নববর্ষ চিঠি

ওপরের বারুদ আকাশ
কিছুই বলেনি মুখ ফিরিয়ে রয়েছে
এই বন, সরল অনিলময়, প্রাক্তন বৃষ্টির গন্ধ মাখা
এখানে আসার কথা ছিল না তো, আমি
নারীদের ঠিকানা হারিয়ে পথ ভুলে...
বিমান গর্জন থেকে এত দূরে, এখানে রয়েছে খুব শান্তি
একটু বসি
এর আগে কতবার জঙ্গলে গিয়েছে এক অশান্ত উন্মাদ
রাক্ষসের মতো তার ক্ষুধা ও জয়ের নেশা
কবিদের মতো তার হিংস্র, সঘন আত্মরতি
সে কি শুয়ে আছে ঐ মরা নদীটার খাতে
ঘাসের চাবড়ার নীচে

যার ইচ্ছে যেখানে যেদিকে খুশি যাক
কখনো বুঝিনি আগে একা একা আলিঙ্গন
এমন মধুর
দাও, যা কিছু না-পাওয়া ছিল, সব দাও
ঘাসের সবুজ আর ভ্রমরের কালো, দোয়েল ও বুলবুলির
পাগলাটে সঙ্গীত
কিছু কি নেবার আছে, নাও
অনাগত শতাব্দীর হে বালিকা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছো
তোমার চিঠির আজও লিখিনি উত্তর, ক্ষমা করো
অন্য কেউ দেবে, অন্য কোনো উন্মাদ, রাক্ষস,
কিংবা কবি।

নীরা, তুমি কালের মন্দিরে

চাঁদের নীলাভ রং, ওইখানে লেগে আছে নীরার বিষাদ
ও এমন কিছু নয়, ফুঁ দিলেই চাঁদ উড়ে যাবে
যে রকম সমুদ্রের মৌসুমিতা, যে রকম
প্রবাসের চিঠি

অরণ্যের এক প্রান্তে হাত রেখে নীরা কাকে বিদায় জানালো
আঁচলে বৃষ্টির শব্দ, ভুরুর বিভঙ্গে লতা পাতা
ও যে বহুদূর,
পীত অন্ধকারে ডোবে হরিৎ প্রান্তর
ওখানে কী করে যাবো, কী করে নীরাকে
খুঁজে পাবো?

অক্ষরবৃত্তের মধ্যে তুমি থাকো, তোমাকে মানায়
মন্দাক্রান্তা, মুক্ত ছন্দ, এমনকি চাও শ্বাসাঘাত
দিতে পারি, অনেক সহজ
কলমের যে-টুকু পরিধি তুমি তাও তুচ্ছ করে
যদি যাও, নীরা, তুমি কালের মন্দিরে
ঘণ্টাধ্বনি হয়ে খেলা করো, তুমি সহাস্য নদীর
জলের সবুজে মিশে থাকো, সে যে দূরত্বের চেয়ে বহুদূর
তোমার নাভির কাছে জাদুদণ্ড, এ কেমন খেলা
জাদুকরী, জাদুকরী, এখন আমাকে নিয়ে কোন রঙ্গ
নিয়ে এলি চোখ-বাঁধা গোলোক ধাঁধায়!

এই সব দেখে শুনে

একটা প্রচণ্ড পরিব্যাপ্ততা হাঁ করে আছে, আমি খুঁজছি
একটা পালাবার সুড়ঙ্গ
কাছাকাছি রয়েছে দু'একটা চেনা বাড়ি, সব জানলা বন্ধ,
দরজায় নেকড়ে
সংস্কৃতি কর্মীরা ঝাণ্ডা সেলাই করছে, তারাও ক্ষুধার্ত

যেমন ক্ষুধার্ত পলাশপুরের মাঠ, যেমন ক্ষুধার্ত দামোদরের গর্ভ
তুলোর বীজের মতন উড়ছে মানুষ, এদেশে ওদেশে
বারুদ দিয়ে দাঁত মাজছে
শান্তিচুক্তির তুলসী মঞ্চে পেচ্ছাপ করে যাচ্ছে
বড় সাহেবদের কুকুর
যে মায়ের বুকে স্তন্য নেই, শিশুটি খাচ্ছে তার রক্ত
শিল্পী বাহবা কুড়োচ্ছেন সেই ছবি এঁকে
ছেলে-ধরা বড় বড় সাঁড়াশি নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন
ইনি আর উনি
বিপুল হাততালি, শোনা যাচ্ছে সুতো কল, চট কল
চা-বাগান আর মন্দির মসজিদ থেকে
আমি কেউ না, একজন সামান্য মানুষ, এইসব দেখে শুনে
মুখ বেঁকিয়ে, থুঃ করে চলে যাচ্ছি,
পাতাল গর্ভে
পেছনে কি কোনো ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল?

এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে

একজন মানুষ খোলা আকাশের নীচে
মঞ্চে ওঠার আগে
সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে আপন মনে
বললো,
জিততে হবে, জয়টাই বড় কথা,
আর কিছুই কিছু না
তারপর বিজয়ীর ভূমিকায় অভিনেতার মতন
কাঁধের কার্নিস উঁচু করে
হাতে অদৃশ্য অস্ত্র, চোখে সেই অস্ত্রের রশ্মি
উঠতে লাগলো ওপরে
যদিও তলপেটে ক্ষণিকের জন্য একটা প্রজাপতি
হাঁটুতে দু'এক টুকরো ভয়, ওষ্ঠে অভ্যেসমতন অহংকার
জন-উপসাগরের সামনে দাঁড়িয়ে
আবার বিড়বিড় করলো সেই বীজ মন্ত্র

জয়ী হতে হবে
আর কিছুই কিছু না
তারপর দুকূলপ্লাবী অবিশ্বাস ও দখিনা বাতাসের মতন আশ্বাস
নিয়ে
কালো কালো অসংখ্য মাথাগুলির দিকে তাকিয়ে
সে উঁচিয়ে ধরলো তার তৃতীয় পা
কিছুটা দূরে একটি শিশু পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে
হিসি করছে
কেউ দেখছে না তাকে
কেউ জানে না, তাকে কক্ষনো জয় করা যাবে না
সে অপরাজেয়

একটা আয়নার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ
কিন্তু যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার নয়
চুড়ো চুল বাঁধা ও ধারালো অলংকার পরা
রমণীটি আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো
এ কী? এ কে?
ওটা একটা পাঁজির বিজ্ঞাপনের জাদু দর্পণ
কাঞ্জিভরম শাড়ি পরা যুবতীটি দেখলো এক
পাগলিনীকে
বাথরুমে অন্য কারণে গিয়ে একজন হু হু করে কাঁদলো
যে কখনো ভালোবাসে নি, সে কাতর হলো
ভালোবাসায়
একজন যোদ্ধা দেখতে পেল ভূমি ভর্তি ইঁদুরের গর্ত
একজন মহিলা বিচারক সহসা বন্দি হলো
গুপ্ত কক্ষের বিছানায়
কঠিন গারদে
এমনকি দু'একটি চন্দ্র তারকা হয়ে গেল
আধখানা নোখের যোগ্য
কোনো ষড়ৈশ্বর্যশালিনীর শিকলের ঝন ঝন শব্দ থেকে
ঝরে পড়লো
মর্চে পড়া অশ্রু
একটি স্তনবৃন্তের কম্পন যেন তার
আলাদা ইচ্ছে-অনিচ্ছের জীবন
যদিও মায়া আয়নায় এসব কিছুই নেই, সবই অলীক
শুধু রাত্রি-জাগা দুঃস্বপ্ন

সেই রাত্রির জানলার ওপাশে যে রাস্তা
তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে
একটি ন্যাংটো বাচ্চা
সে-ই চোখ টানছে!

আসলে, পরেশের দাড়ি-না-কামানো থুতনিতে
ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে
একটা ঠোক্করই যথেষ্ট
তবে, গোরস্তানের পাশের থানায় গিয়ে
আগে জিজ্ঞেস করতে হবে
পায়ের নোখ ও ধুলো বিষয়ক খবরাখবর
পরেশ হঠাৎ ইসমাইল হয়ে যায় নি তো,
ছোটে মিঞা কিংবা ছোটে লাল
কি ইদানীং
বড়ে মিঞা কিংবা বড়ে লাল
পরেশের নাম হাবুল হওয়াও অস্বাভাবিক নয়
যার বুড়ো আঙুল অন্যের থুতনি ভোঁতা করার মতন
কিছু গুরুত্বর দায়িত্ব নিয়েছে
তার নামও শুধু বুড়ো হলে
আপত্তির কিছু নেই
রেল লাইনের পাশে একটা আলাদা জগৎ
যেখানে হাবুল খুঁজছে পরেশকে, কখনো
হাবুল শুয়ে থাকছে পিঠ উল্টে
কখনো পরেশ ঢুকে যাচ্ছে
শুকিয়ে যাওয়া খালের খুব নিচু গর্তে
আর ইসমাইলের হাঁ-করা মুখের মধ্যে বুলেট
শিশির মাখা ঘাসের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে
এগিয়ে যাচ্ছে একটি বহুরূপী
গিরগিটি

সে জানে, আবার পরেশ আসবে, আবার
হাবুল-ইসমাইল বুড়োদের খেলা
শুরু হবে একটু পরেই
ওদের কেউ সুতো ধরে টানছে, কত রঙের সুতো
মধ্য রাত্রির নিশুতি মাঠে ঐ সব খেলার মধ্যে হঠাৎ
থেমে গেল ট্রেন

ইঞ্জিনের জোরালো আলোয় ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতন
ফুটে উঠলো
ন্যাড়া মাথা একটি নেংটি বাচ্চা
তার ঠোঁটে পুঁচকে পুঁচকে হাসি...

মৌমাছিরা মধু জমায় মানুষের জন্য
হাঁস-মুর্গীরা ডিম পাড়ে মানুষের জন্য
স্বয়ং ব্রহ্মাও পাঁঠা-গরু-ছাগলদের কোনো
সান্ত্বনা দিতে পারেন নি
পুকুরে শালুক ফুটছে মানুষের জন্য
পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসছে নদী মানুষের জন্য
ধুলোর মধ্যে খসে পড়া বীজ একদিন মহীরুহ হচ্ছে
মানুষের জন্য
মরুভূমি কাছে এগিয়ে আসছে মানুষের জন্য
বিন্নি ঘাস ও তলতা বাঁশ বুক পেতে দিচ্ছে
মানুষের জন্য
ধরিত্রী স্বেচ্ছায় ফালা ফালা হচ্ছেন মানুষের জন্য
তবু একটি তীক্ষ্ণ স্বর, সব কিছু ঢেকে দেয়
একটি শিশুর কান্না
একটি কালো রঙের ব্রজের দুলাল যেন
তার ফোলা পেট থেকে ঠিকরে আসছে নাভি
পা দুটি ধনুকের জ্যা-এর মতন
বাঁকা
তার বুকে এক আকাশ জোড়া তৃষ্ণা
এক বসুন্ধরা জোড়া খিদে
তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হাউই...

যারা ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান গড়েছিল
যারা সমুদ্রের বুকে নির্মাণ করেছিল সপ্ত মিশেলের টিলা
যারা শূন্যের পটভূমিকায় সাজিয়েছে তাজমহল
যারা সোনালি সেতু দিয়ে ছুঁয়েছিল দূরতর দ্বীপ
যারা হারমিটেজ সংগ্রহশালায় জাজ্বল্যমান করেছে
মানুষের
হৃদয় ও মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি
যারা বাষ্পকে করেছে ভৃত্য, বিদ্যুতকে আলাদীনের প্রদীপের
দৈত্য

যারা চাঁদের বুকে পা দিয়ে টেলিফোনে বার্তা পাঠিয়েছিল
পৃথিবীকে
যারা ভাঙতে চেয়েছিল দেশ-সীমার দেয়াল
তারা নিজের সন্তানদের আদর করতে করতে কোন ছবি দেখেছিল
আগামী কালের
গ্যালিলিও কি মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে ভেবেছিলেন
তাঁর উত্তর পুরুষেরা
রাজনীতির পাশা খেলোয়াড়দের ক্রীতদাস হবে
লুই পাস্তুর কি জানতেন পাগলা কুকুরে কামড়ানো
যে কিশোরটিকে তিনি বাঁচালেন
তাঁর জীবন-মরণ বাজি ধরা চেষ্টায়
সে অকারণে এক মুহূর্তে মরে যাবে একটি সৈনিকের
গুলির ফুৎকারে
সহস্র সূর্যের দীপ্তিতেও কি ওপেনহাইমার
দেখতে পান নি
সেই টলটলে পায়ে
হেঁটে যাওয়া শিশুটিকে...
সমস্ত আগুন নিভে যাওয়ার পর আকাশ ছেয়ে আছে
ছাই রঙের অন্ধকারে
যেখানে প্রাসাদমালা ছিল সেখানে
একটি বিরাট দগদগে ঘা
যেখানে নদী ছিল সেখানে নদী নেই
যেখানে পাহাড় ছিল সেখানে নেই এক টুকরো পাথর
যেখানে ভালোবাসা ছিল, সেখানে দীর্ঘশ্বাসও শোনা যায় না
যায়া জয় চেয়েছিল, তাদের কঙ্কালও মাটি পায় নি
যারা রূপ চেয়েছিল, যারা স্বপ্নে সৌধ গড়েছিল
যারা লড়েছিল মানুষে মানুষে সাম্যের জন্য,
যারা আরাধনা করেছিল অমরত্বের
যারা প্রতিদিন জল দিয়ে, স্নেহ-মমতায় বানিয়েছিল
ছোট ছোট সাংসারিক উদ্যান
তারা আজ কেউ নেই
পরাক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বীরা একই সঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে
চরাচর জুড়ে এক নিবাত নিষ্কম্প নিস্তব্ধতা
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শিশু
সমস্ত ঘৃণা ও অবিশ্বাসের গরল মন্থন করে
সে ঠিক উঠে এসেছে আবার

এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে সে হাঁটছে
আস্তে আস্তে পা ফেলে
তার শীত করছে
শুধু তার জন্যই আবার জাগতে হবে সূর্যকে।

শুধু যে হারিয়ে গেছে

নদীটিকে বুকে তুলে নাও
ডানা ভাঙা হলুদ কপোতী হয়ে উল্টে পড়ে আছে গিরিখাদে
ও একটু আদর চায়, বুকের গরম চায়, দাও!
লাবণ্য কণিকা চেয়ে কাঙাল হয়েছে এক রাজ-রাজেশ্বর
তাকে কিছু দেবে, ভেবে দ্যাখো!
অরণ্য পেয়েছে ওম, পথের সংসার সব তোমারি প্রশ্রয়
এই যে সন্ধ্যার অশ্রু, যার মন রোদে ভরা সেকি কিছু বোঝে?

মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়
স্তব্ধতার চেয়ে আরও অনেক নিঃশব্দ, হিম, চুপ
কে যেন পুকুর ঘাটে দুপুরের অবেলায় বলেছিল, যাও
তাই শুনে চলে গেল ইস্কুল-বাতাস, গেল খুশিময় ছবি
লোহা ভাঙা শব্দ এসে ভরে দিল অর্ধেক জীবন!
তবু, মাটির মূর্তির মতো, যারা যায় সব ঘুরে ফিরে আসে
বাগানের ফুল হয়ে ওঠে ফুটে ওঠে গুপ্ত অভিমান
উষ্ণ চাদরের মধ্যে লুকিয়ে আরাম করে কৈশোরের স্মৃতি
ওষধি ঘাসেরা সব জানে।

দাও, যাকে যা দেবার সব দাও
শীতের বৃক্ষকে দাও সবুজাভা, জলে-জলাঙ্গনে হাতছানি
মেঘ-মৃত্তিকায় দাও ছন্দ, আগুনকে অগ্নিতর করো
কোমরের খাঁজ থেকে বিচ্ছুরিত আলো দেবে নিশুতি রাত্রিকে
তাও জানি, সমুদ্রও কিছু কি পাবে না?
শুধু যে হারিয়ে গেছে, হীরে নয়, দ্যুতি
তারই জন্য এত কাণ্ড, ছন্দ-ছেঁড়া এসব কবিতা!

ঘোরায় কেন একটি বিন্দু

ভেবেছিলাম অভ্র-আড়াল, ফঙ্গবেনে; যখন তখন
যেমন খুশি যাওয়া
চোখে আমার কিসের আঠা, হাতে আমার
কিসের দড়ি, মা
পাতাল ঘেরা বুকে এমন কাতর ঢেউ কখনো কেউ
শুনতে পেলে না
ঝড় উঠেছে, ঝড়ের নাভি খুঁজতে খুঁজতে শ্মশানঘাটে
দগ্ধরেণু পাওয়া!

বৃষ্টি যেন মায়ের মা, সে সব কোন্ আদ্যিকালের
ছেলেবেলার কথা
সত্যি আমি জন্মেছি কি, জন্মটা কোন্ উন-কপালী
পাহাড়ী ঢল, আহা রে
যে-যার নিজের প্রেমে পাগল, আয়না ভেঙে টুকরো টুকরো
ফুটেছে ফুল বাহারে
তবু আমায় ঘোরায় কেন একটি বিন্দু, গভীরে যার
সিন্ধু নীরবতা!

আমায় ডাকছে

রজতশুভ্র রোদ্দুরের মধ্যে ঐ পান্না রঙের গাছটি
আঃ টেলিফোনের শাকচুন্নী ঝনঝন শব্দ, আজ নয়, আজ নয়, সোমবার
ইলেকট্রিকের বিল তারিখ পেরিয়ে গেল, রেলিং-এ শুকোচ্ছে
কালো শায়া
দোতলা বাসের সঙ্গে একটি গণ্ডারের সংঘর্ষ, আকাশে দুধ পোড়া গন্ধ
রজতশুভ্র রোদ্দুরের মধ্যে...
মাথা ভর্তি বারুদ নিয়ে কে উঠে আসছে দোতলায়, বলে দাও, আমি
বাড়ি নেই
ব্যাঙ্কের পাশবই হারাবার মতো পাপ, টেলিগ্রামে ভ্রূকুটি পাঠাচ্ছে সুহৃদেরা
ধর্মঘটী স্কুল কিশোরদের দৌড়, খবরের কাগজে নেড়ি কুত্তার আর্তনাদ
ঐ পান্নায় রঙের গাছটি...

তিন পাতা মিথ্যে কথার পর দু' ফোঁটা চোখের জল, ঘড়ির দিকে
ঘন ঘন চোখ
কে যেন খবর দিল বাজারে আগুন লেগেছে, জানলা দিয়ে ছুটে এলো
নির্বাচনী ইস্তাহার
আবার টেলিফোন, বঞ্চনার ঝঞ্ঝনা, আজ নয়, আজ নয়, সোমবার
রজতশুভ্র রোদ্দুরের মধ্যে
ঐ পান্না রঙের গাছটি
ঐ পান্না রঙের গাছটি
আমায় ডাকছে!

ব্রিজের ওপর থেকে নদী

ব্রিজের ওপর থেকে নদী দেখা, আকাশ ঝুঁকেছে খুব কাছে
মানুষবহুল এই পৃথিবীতে কোন কোন সন্ধেবেলা
মানুষ থাকে না
একজন কেউ থাকে, বাতাসে একলা চুপ, সে কারুর নয়,
প্রেম রিরংসার নয়, ক্ষুধা বা জয়ের নয়; ব্যর্থতারও নয়,
জলের তরঙ্গে চাঁদ, অন্তরীক্ষ ছেয়ে আছে গহন মানস,
দু'দিকের পথ যেন আবার জন্মান্তে ফিরে সবুজ হয়েছে
সমস্ত স্তব্ধতা ভেঙে শুরু হলো অদ্ভুত পাগলাটে ঐকতান
এবারে তোমাকে দেখি, খুলে দাও বুক, দেখি
তোমাকে, তোমাকে!

নীরা, গৌতম বুদ্ধ

পাঞ্জাবে রোজ খুন-খারাপি হচ্ছে দশটা-পঁচিশটা
অথচ আমি এই মধ্যরাত্রিতে নীরার জন্য একটা
স্তোত্র লিখতে চাই
কৃপাণ ও বন্দুকের নল ফুঁড়ে ওঠে নীরার মুখের চারপাশে
যারা মরে ও যারা মারে দু'রকম দীর্ঘশ্বাস ঝলসে দেয় বাতাস

ডটপেন শুকিয়ে যায়, আমি অন্য কলমের খোঁজে তাকাই
এদিক ওদিক
ঠিক তখনই একটা নীল বিদ্যুতের শিখা আকাশের এক প্রান্ত
থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেলে
এক মুহূর্তের জন্য ঝলসে ওঠে গৌতম বুদ্ধের দুটি চোখ
তারপরই এক ঝাঁক বিমান সুগম্ভীর শব্দ করলে বুঝতে পারি
সশস্ত্র বিমান যাচ্ছে
প্রত্যেক সীমান্ত প্রদেশে
আমি কলম খুঁজে পাই না, দেশলাই খুঁজে পাই না, অবলুপ্ত
চাঁদের মধ্যে হারিয়ে যায় নীরার মুখ
অন্ধকার-ব্যবসায়ীরা জেগে ওঠে, নগর ডুবতে থাকে পাতালে
বালিশে মাথা দিয়ে, জীর্ণ সভ্যতার কম্পিত মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে
আমি গৌতম বুদ্ধকে একবার, মাত্র একবার
নীরার মুখ চুম্বনের অধিকার দিই
অন্তত ওরা দু'জন কয়েক মুহূর্তের জন্য আনন্দের পতাকা
তুলে ধরুক
এই ভেবে আমি পাশ-বালিশের মতন জড়িয়ে ধরি ঘুম।

পিঁপড়ের এপিটাফ

ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে একটা খুদে লাল পিঁপড়ে
সে মাথা বেয়ে নেমে আসে নি, সে পায়ের তলা থেকেও
উঠে আসে নি
সে বাতাসে ছিল, কিংবা নিশ্চিত অন্তরীক্ষে
সমস্ত শরীরে পিঁপড়ে-দংশনযোগ্য কয়েক লক্ষ বিন্দু
তবু কেন সে কামড়ে ধরলো ওষ্ঠটাই
কিংবা সে কেন আমারই মুখে ঢেলে দিতে চাইছে ক্রোধ
বেশ জ্বালা আছে, তাকে হেলাফেলা করা যায় না
এরকম অবস্থায় তাকে আঙুলে তুলে টিপে গুঁড়ো করে ফেলাই তো
স্বাভাবিক, অন্যমনস্ক ভাবে...
সে চলে গেলেও আগুনের একটা ফুল্‌কি থেকে যায়
একজন আততায়ীর কথা মনে পড়ে, যার ছদ্মবেশ চেনা যায় না
দু' একটা ছেঁড়া চটির মতন অপমান, পরে জিভ-কাটার মতন
ভুল

পানাপুকুরের জলে মেঘলা সূর্যের রশ্মি পড়া রঙের মতন বিস্মৃত
আফশোষ...
একটি পিঁপড়ে যে এক মিনিট আগেও ছিল না, এখনও নেই
যে আকাশ থেকে খসে পড়েছিল, আবার মিলিয়ে গেছে
পঞ্চভূতের ভগ্নাংশে
মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে সে তার অবয়বের কোটি গুণ মনোযোগ
কেড়ে নিয়ে গেল
একই জায়গায় বসে থাকা আমি সেইটুকু সময়ে অন্য মানুষ,
তুলে নিই কলম
মানুষের ঠোঁট কামড়ে ধরা প্রায় অদৃশ্য একটি পিঁপড়ের ছবি
কোনো শিল্পী কোনোদিন আঁকবেন না
তাই লিখে রাখা হলো এই কয়েকটি লাইন...

মাত্র এই এক জীবনে

অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা
নদীর এক ধারে শুধু সারিবদ্ধ গাছ রুদ্ধবাক্
আমাদের দিনগুলি জলের ভেতরে জল
তারও নীচে জল
রোদ্দুরের পাশাপাশি ছায়ার নির্মাণ তারা ক্রমশই গাঢ়
অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা
যে-কথা তোমার নয়, যে-কথা আমার নয়
সকলেই সেই কথা বলে
কেউ চলে যায় দূরে একা মুখ লুকোবার ছলে
পিঁপড়ের সংসার ভেঙে যায়
পড়ে থাকে ঝুরো ঝুরো মাটি
ভালোবাসা ছিল, যেন বাঁধের কিনারে একা গাছ
দিন চলে যায় রাতে, রাত্রিগুলি শুধুই অদৃশ্য
নীরব মুহূর্তে গাঁথা মালাখানি আমাকেও রেখে যেতে হবে
অনেক গোপন কথা...
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা!

মানুষ রইলে না

এক মনোহরণ সকালবেলায় তোমরা বাগানে বসেছো
ছোট-হাজ্‌রির টেবিলে
আত্মপ্রত্যয়ী পিতা, মমতাময়ী মা, মাথায় সোনালি চুল
তিনটি দুষ্টুমি-সারল্য মাখা কিশোর-কিশোরী
অপরূপ রোদ, স্বর্গের সৌরভমাখা নরম বাতাস
খিদমদ্‌গার এনে দিচ্ছে গরম গরম টোস্ট, সসেজ, ডিম সেদ্ধ
পোরসিলিনের পাত্র থেকে উপচে আসছে চায়ের ধোঁয়ার মাদক গন্ধ
মা মাখিয়ে দিচ্ছেন মাখন, বাচ্চারা কাড়াকাড়ি করছে কাগজের
খেলার পাতাটি নিয়ে
তৃপ্ত পিতা দেখছেন তাঁর সাজানো সংসার, সার্থকতা
সাদা রঙের বাড়ি, অলিন্দে অর্কিড, সবুজ লন্, গেটের বাইরে
ধোয়া-মোছা চলছে দুটো গাড়ির
তারপর তিনি দেখলেন পেয়ালা-পিরিচে ছিট ছিট রক্ত
টোস্ট, সসেজ, ডিমসেদ্ধ, দুধ, কর্নফ্লেক্স, মার্মালেডে রক্ত
মানুষের রক্ত
একজন কবিকে এইমাত্র ফাঁসি দেওয়া হলো, তার রক্ত
যারা রুটি বানায়, যারা গরু-মোষ নিয়ে মাঠে যায়, আবার
যখন-তখন গুলি খেয়ে মরে, তাদের রক্ত
তোমাকে, তোমার সুখী পরিবারকে পান করতে হবে এই রক্ত
তারপর আর তোমরা মানুষ রইলে না
তোমরা নরখাদক হয়ে গেলে!

দিগন্ত কি কিছু কাছে

আজ বহু দূর এসে কংক্রিট ছাদের নীচে
সামনে খোলা কবিতার খাতা
আমি সেই কিশোরকে ফের দেখি,
বসে আছে নদীর ঢালুতে
আমি দেখি নদীটির পাশ ফেরা,
দুপুরের বর্ণদ্যুতি, বাতাস দ্বিখণ্ড করে
ডেকে ওঠে চিল,

একটু একটু মন খারাপ, কবিতার খাতা
মুড়ে উঠে আসি
বারান্দায়, চুপ
আকাশ অচেনা লাগে, দিগন্ত কি কিছু
কাছে এগিয়ে এসেছে?

শান্তি, শান্তি

সাড়ে পাঁচ বছর বয়সী মেয়েটির প্রস্ফুটিত পবিত্র মুখখানি দেখে
আমি কল্পনা করি ওর তেইশ বছরের প্রজ্বলন্ত যৌবন
তখন আমি হয়তো থাকবো না
আমি তখন ধুলো হয়ে বাতাসে উড়বো কিংবা
কবরস্থানে কেঁচোর খাদ্য হবো
কিংবা দু-একটা দীর্ঘশ্বাসের টুকরো টুকরো স্মৃতি
তবু শতাব্দী পেরুনো উধাও প্রান্তরের পরিব্যাপ্ততায়
একটি বিন্দু ক্রমশঃ রং ও আয়তন পায়
ঝংকৃত পা ফেলে ফেলে
জলের সামনে দাঁড়িয়ে এক মাধুর্যের ছবি
কী গর্বমাখা তার চিবুক। ওষ্ঠে স্বর্গ দেখা হাসি
হাতছানি দিয়ে সে ডাকে কোলাহলময় পাখির মতন শিশুদের
আমি সেই চিবুক, সেই ওষ্ঠে আমার সুদীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিচ্ছি।

দেরি করা যাবে না

অপরূপের নিভৃত নির্মাণের পাশে অলীকের সেই ধাতুময় নিসর্গ খনি
এ বাড়ির সুষমা ধার করে আনে ওদিককার দু'চারটি অভ্রফুল
মাঝে মাঝে বাতাস ওদের ছুটির পরিপূর্ণতার দিকে ডাক দেয়
তখন তুলসী পাতার সৌরভের চেয়েও মৃদু কোনো নিঃসঙ্গতা
আমাকে চোখ মেরে বলে, যাবে নাকি?

এইসব অপরের সৃষ্টি ও অপরের লাবণ্যের মধ্যে খালি পায়ে ঘুরতে ঘুরতে
মনে হয় আমি আর নিজস্ব নয়, আমি মোহ-পরিবারের ছোট ছেলে
যেন ভিজে ঘাসের ওপর পাতলা পর্দার মতন বিছিয়ে আছে যুদ্ধপূর্ব বাল্য
তখনও ভাঙার জন্য গড়া হয়নি কোনো নগরী, নদীগুলিকে কেউ বাঁধেনি
বেশি দেরি করা যাবে না, ওদিকে কেউ কাঁদছে।

দেরি

বিকেলের গা চুঁইয়ে গড়িয়ে পড়ছে
মনোহরণ
এবারে শেষ স্নান সেরে নিতে হবে
আকাশে মখমলের পর্দা, এই বুঝি সরে যাবে একটুখানি
উদ্ভাসিত হবে কোন্ অসম্ভবের স্থিরচিত্র
জানি না
তার আগে তৈরি হয়ে নিতে হবে, যেন
দেরি না হয়ে যায়!

জলের মধ্যে মিশে আছে

তারপর একজন উঠে গেল ট্রেন ধরতে, ঠোঁটে তৃণমূল নিয়ে
একজন বসে রইল নদীর ধারে
আর একজন চঞ্চল চাহনিতে চিঠি লিখছে পোস্টাফিসের কাউন্টারে
দাঁড়িয়ে
এই সময় ট্রাম লাইনে ঝলসাচ্ছে কপিশ রোদ, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে
মিলিয়ে গেল তৃতীয় ভুবনের একটি তারা
টেলিপ্রিন্টার ও বিমান গর্জনের মধ্যে অজাত শিশুর কান্না
শাঁখ বাজছে স্মৃতির মধ্যে বিলীন তুলসী মঞ্চে, কৈশোরের
জেদের মতন উড়ছে বাতাস
এখন গল্প হবে, সমস্ত হারানো মানুষের গল্প হবে

এখন গল্প হবে, সমস্ত হারানো মানুষের গল্প হবে
এখন গল্প হবে, সমস্ত হারানো মানুষের গল্প হবে
ওরা কোন্ অলক্ষ্যপুরীতে ওদের চোখের ধুলোয় জলের ঝাপ্টা দিচ্ছে
সেই জলের মধ্যে মিশে আছে রক্তাক্ত স্বদেশ...

আমি আসছি, আসছি

বাড়ি ফেরার পথে এখন আর বাড়ি হারিয়ে যায় না
আলো জেগে থাকে, হিমপতন জেগে থাকে, এমন কি মৃত্যুও
রাত্রির দেশ খল খল শব্দে হাসে, আকাশ থেকে নেমে আসে উৎসব
আমার সেইসব দিনের কথা মনে পড়ে না, সেইসব কালো রঙের দিন
সেই খয়েরি রোদ্দুর, বুক পকেট টেনে ছিঁড়ে ফেলা অভিমান
আমার শরীরের গরম মনে পড়ে, পায়রার বুকের মতন কোমলতার কথা
মনে পড়ে
সেই যারা তীক্ষ্ণস্বরে ডেকেছিল, নদীর ধারে যারা ভাঙনের খেলা খেলতে
এসেছিল
সবাই যে-যার জায়গায় ফিরে আসছে, এখন খুব ভালবাসাবাসি
আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে একটু, ঐ যে কে দাঁড়িয়ে আছে দূরে,
তুলে ধরলো মশাল, আঃ কী আনন্দ, আমি আসছি, আমি আসছি...

সরল গাছের ছায়া

এ ঘরের ভুল ও ঘরে লুকিয়ে রাখি
বিকেলের আলো আধো হাসি দিয়ে ডাকে
চিঠি জমে যায় পল্কা বছর পেরিয়ে
কপালের ভাঁজে জমে আছে বহু কাজ।

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে পতনের মূর্ছনা
পাতাল জেনেছে আসন্ন উৎসব
বড় পিছু টান কুসুম হাতের মায়া
রূপের কাঙাল জন্মান্ধের যমজ।

কথা ছিল যেন এ জীবনে কিছু চেনা
আকাশ ভাঙলো নীলিমার নৈরাজ্য
একটি দেখার বিপরীতে এত ভ্রান্তি
জলের ওপর সরল গাছের ছায়া।

তার আগে, তার আগে

আমার ডান হাতের আঙ্গুলে এক টুকরো
নীল সুতো
এর থেকেই তৈরি হবে স্বর্গের জয়-পতাকা
অবশ্য দেরি আছে।
তার আগে দোয়েল পাখির শিস তুলে নিতে হবে ঠোঁটে
তার আগে
এক একটি উন্মোচনের জন্য অপেক্ষা
তার আগে
বারুদের ঘরবাড়ির মধ্যে ভালোবাসা
তার আগে, তার আগে, তার আগে...

দ্বিধা

পৌঁছনো যাবে না ভেবে বাড়ি থেকে বেরুনো হয় না
পাথরের ভাঁজ ভেঙে উঠে আসে ঘুম
পাখার বাতাস, ঝিল্লিরব
জানালার পাশেই ডাকে একাকী সমুদ্র, তার শান্ত দুটি ডানা
পৌঁছনো যাবে না ভেবে বাড়ি থেকে বেরুনো হয় না।

সমস্ত বাগান ভরা যৌন গন্ধ, ভাট ফুল
ওরা কিন্তু বাগানের নয়
মিটিং-এ সংবাদ পত্রে রটে গেছে মানস কানন
সেখানে মালির হাতে নির্বাচিত ফুলের কেয়ারি

বাল্যস্মৃতি চিরে যায় টিয়া পাখিটির তেজী ডাক
সুন্দরের পাশে পাশে ঘোরে এক বোবা কালা প্রেত
পৌঁছনো যাবে না ভেবে বাড়ি থেকে বেরুনো হয় না।

ভালোবাসতে চাই

প্রয়োজনের মধ্যে বারুদ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে
আমি এক এক সময় অপ্রয়োজনকে বেশি ভালোবাসি
যেমন জ্বলন্ত হাতের পাঞ্জায় ফুলকে নরম আদর
যেমন নদীর মৃত্যু দৃশ্য দেখে সতরঞ্চি বিছিয়ে
তাস খেলা
যেমন নারীকে
কখনো কখনো সম্পূর্ণ নারীকেও নয়
কোমরের আয়না-ভাঙা চাঁদ, জলতরঙ্গের মতন দ্বিরাগমন
তীব্র মধ্যমে এক টুকরো হাসি
অপরের নারী, শুধু তার মাধুর্যের দিকে অলীক
হাত বাড়িয়ে দেওয়া
যেন অন্য দেশে পর্যটনের ক্ষণিক প্রকৃতি-সুখ
হ্যাঁ, মনে পড়লো, অন্য দেশে গিয়ে আমি অবান্তরভাবে
স্বদেশ প্রেমিক হয়ে উঠি
গাড়লের মতন, অন্ধের মতন, আধো-চেনা মাতৃভূমির বন্দনা
আবার যখন একা, যখন পা-জামার দড়ি
অনায়াসে গিঁট খুলে রাখা যায়
নিজের নিভৃতির মুখোমুখি কোনো অলৌকিক হাতছানি
তখন আমি আচমকা বিশ্ব-প্রেমিক
যদিও এই তথাকথিত বিশ্ব আমাকে গ্রাহ্য করে না কানাকড়িও
একটা বোতামের ওঠা-নামা, তার ওপর টলমল করছে
পিঁপড়ে, পাখি ও পুতুলের সংসারের
ধ্বংস-স্থিতাবস্থার সন্ধিক্ষণ
তবু যেন সিন্ধবাদের বুড়োর মতন গোটা মানব সভ্যতা
চেপে থাকে আমার ঘাড়ে
আমার ঘাড় ব্যথায় টন্‌টন করে

হ্যাংলার মতন, পা-চাটা কুকুরের মতন আমি এই
হৃদয়হীন সভ্যতাকে
ভালোবাসতে চাই!

কতদূরে

মানুষের পাশাপাশি পাখি ও পিঁপড়ের
শুরু হলো ভোরের সংসার
দিনের আলোর নীচে চাপা দীর্ঘশ্বাস
পৃথিবীর ঘোরাঘুরি নিয়ে যার মাথাব্যথা নেই
সেও জানে প্রেম কত কম,
বাতাসেরও ভাগাভাগি হয়ে আছে তাই
স্নেহ এত দ্রুত মরে যায়
জিরাফ ও প্রজাপতি একই খেলা খেলে
তবু তারা মানুষের চেয়ে কত দূরে!

মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে...

প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করতে করতে দু' হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া
ভাঙতেই
ঠেঙো ধুতি ও ফতুয়া পরা, ছাতা-বগলে একজন শালিক শালিক চেহারার
লোক
থমকে জিজ্ঞেস করলো,
কে গো, আমাদের ফটিক লয়?
বাজপাখির মতন এক সুবিশাল হাস্য দিয়ে তাকে চুপসে দিলুম
সে পালাবার পথ পায় না, তো তো করে নেমে গেল রেললাইনে
প্রচণ্ড রোদে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো তার গা থেকে, সে কর্পূর হয়ে গেল
দিগন্তে...

একটু বাদে ট্রেন ছাড়বার পরেই এক সবুজ ঢেউয়ের মতন বিস্মরণ
ঝাপটা মারে আমার কপালে

জানলার পাশে দুটো উড়ন্ত ফিঙে চোখ মেরে বলে যায়, দুয়ো, দুয়ো
আমিই কি তবে ফটিক, কিংবা তার যমজ, এতক্ষণে আলপথ ধরে
ঠেঙো ধুতি ও ময়লা ফতুয়া, ছাতা-বগলে শালিক লোকটার পাশাপাশি
হেঁটে যেতে যেতে
কোথায়...কোন্ গ্রামে...ফটিক কি এতদিন নিরুদ্দেশ ছিল
পালিয়ে ছিল দারোগা-মহাজনের গুঁতোয়, সুফল আনতে গিয়েছিল শহরে
সে ফিরেছে বলে শাঁখ বাজবে, চোখের জল দিয়ে ধোয়ানো হবে তার
পা
একটি অকাল-বৈধব্য মাখা স্ত্রীলোক ছাই ছাই চোখ মেলে বলবে,
হেথায় তো তোমায় কেউ জোর করে ধরে আনেনিকো
কেন এলে?
আঁশবঁটির মতন ধারালো তার উদাসীনতা, টিয়া পাখির মতন তীক্ষ্ণ
ট্যাঁ ট্যাঁ করছে দু'একটি বাচ্ছা...

অকাল বৃষ্টিতে পচে গেছে ধানের গোছ, পূর্ণিমার চাঁদের গায়ে কাদা
কালভার্টের পাশে তাড়া তাড়া নির্বাচনী ইস্তাহার সেঁতিয়ে পড়ে আছে
বাঁধ ভাঙা নোনা জলে ঘুরপাক খাচ্ছে ফটিকের ছেঁড়া চটি
এই অনন্তের টুকরো দৃশ্যের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মহাবিশ্ব
একটি নবীন তৃণের ডগা মাথা তুলে বললো, ফিরিয়ে দাও ফটিককে
তার নিজের জায়গায়
নইলে সব কিছু মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে...

রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা

ট্রেন এলে চলে যাব, ততক্ষণ চেয়ে দেখি প্রজাপুঞ্জ সহ এই সম্রাট
আকাশ
ধোঁয়াটে মূর্তির মতো কয়েকটি মনুষ্য বিন্দু ঘুরছে ফিরছে প্লাটফর্মে, লাইনের
উপরে
আমার বন্ধুটি পাশে সিগারেট ঠোঁটে চেপে ছুটি-শেষ-করা এক ঘন দীর্ঘশ্বাস
ধোঁয়ায় মিশিয়ে ছুঁড়লো আমার চোখের দিকে, রামগড়ে, বাতাসের প্রতি
স্তরে স্তরে।

কলকাতায় ফিরে যাবে সহস্র সুতোয় বাঁধা কীর্তিমান সুদর্শন ছিম্-ছাম্ যুবক
ট্যাক্সিতে সময় মাপবে, অনেক সন্ধ্যাকে খুন করবে নানা রেস্তোরাঁয়,
এরোড্রোমে, ভিড়ে
শনিবার তাশ খেলবে, ঘরভরা অট্টহাসে টেনে নেবে বন্ধুদের চোখের চুম্বক
সুখের নানান সুর এঁকে রাখবে ওষ্ঠে, চোখে, দ্যুতিময় যৌবনের বুক
চিরে চিরে।

এখন সে অকস্মাৎ চেয়ে দেখল রামগড়ের যুবতী-প্রতিম এই সায়াহ্নের
দিকে
কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে হঠাৎ আমাকে বলল, কেঁপে উঠে যেন এক অন্য
কণ্ঠস্বরে
'আশ্চর্য, আশ্চর্য, দেখ!' সবলে আমার হাত ধরে রেখে চেয়ে রইল, তীব্র
নির্নিমেষে
অশ্রুর বিন্দুর মতো শীতের করুণ রৌদ্র তখন বিরলে ঝরছে পর্বত শিখরে।

গ্রীসীয় মূর্তির মতো রূপবান, বস্তুনিষ্ঠ, আবেগ-অগ্রাহ্য-করা আমার বন্ধুকে
সেই একবার শুধু নিতান্ত সামান্য, ক্ষুদ্র, পটভূমিকার পাশে মূঢ়, অসহায়
ভঙ্গিতে দেখেছি আমি।—'সুনন্দ, ট্রেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছো?'
তৎক্ষণাৎ আমি তার বুকে
প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠে বলে উঠে, লঘু হেসে, চৈতন্য এনেছি সেই মায়াবী
সন্ধ্যায়।

MESCALINE
মেস্কালীন ॥ অ্যালেন গীন্স্বার্গ

গেঁজানো গীন্স্বার্গ, আমি আজ নগ্ন হয়ে আয়নার দিকে চেয়ে আছি
আমি দেখছি বুড়ো মাথা, আমার ক্রমশঃ টাক পড়ছে
রান্নাঘরের আলোতে পাতলা চুলের তলায় আমার তালু ঝলসাচ্ছে
যেন প্রাচীন স্মৃতি গুহায় কোনো সাধুর মতো—কোনো
প্রহরীর আলোয় আলোকিত
পিছনে ভ্রমণকারীদের জনতা
তা'হলে মৃত্যু আছে

আমার বেড়াল বাচ্চাটা ডাকছে এবং জামাকাপড়ের মধ্যে দেখছে
আজ রাত্রে বইটো ফোনগ্রাফে গান গাইবে—তার পুরোনো
পরীদের গান
আমার দেয়ালে অ্যান্টিনাসের আবক্ষ মূর্তির ধূসর ছবি এখন
নীচে তাকিয়ে আছে
ঈশ্বরের সুকুমার হাত থেকে আলো ভেঙে পড়ে, তিনি একটি কাঠের
পায়রা পাঠাচ্ছেন শান্ত কুমারীকে
বিয়েতো অ্যাঞ্জেলিকোর জগৎ
বেড়ালটা পাগলা হয়ে গেছে এবং মেঝের চারিদিকে ঘুরে গজরাচ্ছে

মৃত্যু যখন গেঁজানো গীন্‌স্‌বার্গের মাথায় ধাক্কা মারবে
তখন কি হয়
কোন জগতে আমি ঢুকবো
মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু—বেড়ালটা শান্তি পেয়েছে
আমরা কি কখনো মুক্ত হবো—গেঁজানো গীন্‌স্‌বার্গ
তা'হলে এটা ধ্বংস হোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি জানি
কাকে ধন্যবাদ
কাকে ধন্যবাদ
তোমাকে ধন্যবাদ, হে প্রভু, আমার দৃষ্টির অতীত
পথ নিশ্চয়ই কোন জায়গায় পৌঁছোবে
পথ
পথ
স্যাঁতসেঁতে পচা জাহাজের মধ্য দিয়ে। অ্যাঞ্জেলিকোর বিষয়ের মধ্য দিয়ে
চুপ, একটি শিশুর জন্ম দাও এবং চলে যাও
হয়তো এই একমাত্র উত্তর, ঠিক জানতে পারবে না যতক্ষণ একটা ছেলে
না হচ্ছে আমি জানি না
কখনো বাচ্চা ছিল না কখনো হবেও না যেভাবে আমি চলেছি

হ্যাঁ, আমার ভালো হওয়া উচিত, আমার বিয়ে করা উচিত
দেখা উচিত এ সবের মধ্যে কি আছে
কিন্তু আমার চার পাশের এসব মেয়েদের আমি সহ্য করতে পারি না
নাওমি'র গন্ধ
এঃ, আমি পরিচিত গ্যাঁজানো গীন্‌স্‌বার্গে মজে গেছি
এমন কি ছেলেদেরও আর সহ্য করতে পারি না
সহ্য করতে পারি না
সহ্য করতে পারি না

আর কেই বা পেছন মারাতে চায় সত্যি?
অসংখ্য সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে
সময়ের স্রোত
এবং কেই বা বিখ্যাত হতে চায় এবং অটোগ্রাফ সই করতে চায়
সিনেমা স্টারের মতো?

আমি জানতে চাই
আমি চাই আমি চাই হাস্যকর জানতে জানতে কি গেঁজানো
গীন্‌স্‌বার্গ
আমি জানতে চাই সম্পূর্ণ গেঁজে যাওয়ার পর কি হয়
আমার চুল ঝরে যাচ্ছে, আমার ভুঁড়ি হয়েছে, আমি যৌন-সম্পর্কে বিরক্ত
আমার পাছা পৃথিবীতে ঘসছে আমি জানি বড়বেশি
এবং যথেষ্ট নয়
আমি জানতে চাই আমার মৃত্যুর পর কি হবে
আচ্ছা, আমি খুব শীগ্‌গিরিই জানতে পারবো
আমি কি সত্যিই এখনি জানতে চাই?
সত্যি কি তার দরকার আছে দরকার দরকার দরকার
মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু
ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর আনন্দবাজারের অরণ্যদেব
টাইপরাইটারের তরঙ্গ।
টাইপ রাইটারের ওপর ঝুঁকে আমি স্বর্গের কি করতে পারি
আমি ডুবে গেছি, গ্রেগরি রেকর্ডটা বদলে দাও আঃ চমৎকার সে
ঠিক সেটাই বাজাচ্ছে
আমি এখন লক্ষ লক্ষ কান সম্বন্ধে বড় বেশি সজাগ
এখন উৎসুক কান, ব্যবসা বানাচ্ছে
খবরের কাগজে বড় বেশি ছবি
বিবর্ণ হলুদ সংবাদের ধামাধরা
আমি কবিতা থেকে সরে যাচ্ছি অন্ধকার চিন্তামগ্ন হবার জন্য

মনের আবর্জনা
পৃথিবীর আবর্জনা
মানুষ আদ্ধেক আবর্জনা
কবরে সবই আবর্জনা
প্যাটারসনে উইলিয়াম্‌স্‌ কি ভাবছে, মৃত্যু তাঁর উপর বড়
বেশি
এত আগে এত আগে

উইলিয়াম্‌স্‌ কার নাম মৃত্যু?
তুমি কি এখন প্রতি মুহূর্তে এই বিরাট প্রশ্ন বোধ করছো
অথবা সকালবেলা তুমি কি চা খেতে খেতে ভুলে যাও, নিজের মুখের
কুৎসিত ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে
তুমি কি পুনর্জন্মের জন্য প্রস্তুত
এই পৃথিবীকে মুক্তি দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে
অথবা মুক্তি দিতে, মুক্তি দিতে
এবং সবই হোক—একটা গোটা জীবন দেখা—সব চিরকাল—চলে
যাবে
শূন্যতায়, একটা কায়দার প্রশ্ন চাঁদ উত্থাপন করেছে
উত্তরহীন পৃথিবীকে
মানুষের জন্য কোন মহত্ত্ব নেই! মানুষের জন্য কোন মহত্ত্ব নেই।
আমার জন্য কোন মহত্ত্ব নেই! আমি নেই!

আত্মা যখন নির্দেশ করে না তখন লেখার কোন মানে হয় না।

AT APOLLINAIRE'S GRAVE
আপলিনেয়ারের সমাধিতে ॥ অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ

আমি পের লাসেজে আপলিনেয়ারের সমাধি দেখতে গিয়েছিলাম
সেদিনই বড় বড় রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মেলনে ইউ এস প্রেসিডেন্ট এসেছিল
সুতরাং নীল ওর্লির বিমান বন্দরে প্যারিসের উপরের বাতাসে বসন্তের
পরিচ্ছন্নতা থাক্‌
আইসেনহাওয়ার আমেরিকার কবরখানা থেকে উড়ে আসছে
এবং পের লাসেজের কবরখানায় মায়াময় কুয়াশা গাঁজার ধোঁয়ার মতো
ঘন
পীটার ওরলভস্কি এবং আমি পের লাসেজে নরম ভাবে হেঁটেছিলাম
আমরা দুজনেই একদিন মরবো জানলাম
সুতরাং শহরের মতো ক্ষুদ্র সংস্করণ অসীমে পরস্পর দুজনের ক্ষণিক হাত
নরম ভাবে ধরেছিলাম
পথগুলি, পথের বিজ্ঞাপন, পাহাড় টিলা এবং প্রত্যেক লোকের বাড়িতে
লেখা নাম
শূন্যতার মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ফরাসির হারানো ঠিকানা খুঁজছিলাম

তাঁর অসহায় স্মৃতিস্তম্ভে আমাদের প্রণামের পাপ জানাতে
এবং তাঁর স্তব্ধ সমাধি ফলকে আমার সাময়িক আমেরিকান গর্জন
শুইয়ে রাখতে
তাঁর পড়ার জন্য লাইনগুলির মধ্যে কবির এক্সরে-চক্ষু দিয়ে
কেননা তিনি অলৌকিক ভাবে স্যেন নদীর পারে নিজের মৃত্যুর কবিতা
পড়তে পেরেছিলেন
আমার আশা কোন বুনো বালক সন্ন্যাসী আমার কবরেও তার রচনা রাখবে
ঈশ্বর স্বর্গে শীতের রাত্রে আমাকে পড়ে শোনাবার জন্য
আমাদের হাত এতক্ষণে সে জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়েছে আমার হাত
এখন লিখেছে
প্যারিসের গী ল্য কুরের একটি ঘরে
আ উইলিয়ম তোমার মাথার মধ্যে কি জোর ছিল কার নাম মৃত্যু
আমি সমস্ত সমাধি ভূমির উপর দিয়ে হেঁটে গেছি এবং তোমার কবর
পাইনি
তোমার কবিতার মধ্যে ঐ অদ্ভুত ব্যান্ডেজ বলতে তুমি কি বুঝিয়েছিলে
হে পবিত্র পীড়াদায়ক মৃত্যু তোমার কি বলার আছে কিছু না এবং মোটেই
তা যথেষ্ট উত্তর নয়
তুমি ছ'ফুট কবরখানায় মোটেই গাড়ি চালাতে পারো না যদিও এই
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট স্মৃতিভাণ্ডার যেখানে সবই সম্ভব
বিশ্বজগৎ এক সমাধিভূমি এবং এখানে আমি একা হাঁটছি
পঞ্চাশ বছর আগে আপলিনেয়ার এই পথেই হেঁটেছেন জানি
তার পাগলামি কোণে-কোণে আছে এবং জাঁ জেনে আমাদের সঙ্গে
বই চুরি করছে
পশ্চিম আবার যুদ্ধে মেতেছে এবং কার মধুর আত্মহত্যায়
এর মীমাংসা হবে
গীয়ম গীয়ম তোমার খ্যাতিকে আমি কত ঈর্ষা করি, মার্কিন সাহিত্যের
প্রতি তোমার অনুকম্পাকে
মৃত্যু সম্বন্ধে দীর্ঘ উন্মাদ ষাঁড়ের গোবর লাইন সমেত তোমার পরিধি
কবর থেকে বেরিয়ে এসো এবং আমার দরজা দিয়ে কথা বল
নতুন রূপকল্পের মালা বার করো সামুদ্রিক হাইকু, মস্কোর নীল ট্যাক্সি
বুদ্ধের নিগ্রো মূর্তি
তোমার পূর্ব অস্তিত্বের ফোনোগ্রাফ রেকর্ডে আমার জন্য প্রার্থনা করো
দীর্ঘ বিষাদময় গলায় এবং গভীর মিষ্টি সুরের মতো ধ্বনিতে, করুণ এবং
প্রথম মহাযুদ্ধের মতো কর্কশ
আমি খেয়েছি তোমার কবর থেকে পাঠানো নীল ক্যারোট এবং ভ্যান
গঘের কান

এবং পাগলাটে আরতোর ক্যাকটাস
এবং নিউ ইয়র্কের পথ দিয়ে হেঁটে যাবো ফরাসি কবিতার কালো
আঙরাখার মধ্যে
পের লাসেজে আমাদের কথাবার্তায় কিছু সংযোজন করে
এবং তোমার সমাধির উপরে যে আলোর রক্তপাত হচ্ছে আগামী কবিতা
তার থেকে প্রেরণা পাবে।

(২)

এখানে প্যারিসে আমি তোমার অতিথি হে বন্ধুপ্রতিম ছায়া
ম্যাক্স জেকবের অদৃশ্য হাত
যৌবনের পিকাসো আমাকে দিচ্ছে এক টিউব ভূমধ্যসাগর
নিজে রুসোর প্রাচীন লাল নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলুম আমি তার বেহালা
খেয়ে ফেলেছি
বাতো ল্যাভোয়ারের বিশাল পার্টিতে উপস্থিত ছিলাম আলজিরিয়ার
পাঠ্যপুস্তকে যা উল্লেখিত হয়নি
বোয়া দ্য বুলোনে জারা বুঝিয়েছে কোকিলের মেসিনগানের রসায়ন
আমাকে সুইডিস ভাষায় অনুবাদ করতে করতে সে কাঁদে
কালো প্যান্ট এবং বেগুনি টাইতে সুসজ্জিত
মিষ্টি রক্তিম দাড়ি তার মুখ থেকে বেরিয়ে আছে যেন নৈরাজ্যের
দেওয়াল থেকে ঝোলা শ্যাওলার মতো
আঁদ্রে ব্রেঁতোর সঙ্গে তার ঝগড়ার কথা সে বলেছিল অনর্গল
যাকে সে একদিন সাহায্য করেছিল সোনালি গোঁফ পাকিয়ে নিতে
বুড়ো ব্লেইজ্ সেঁদরার পড়ার ঘরে আমাকে অভ্যর্থনা করেছিল এবং
বিরক্তভাবে সাইবেরিয়ার বিশাল দৈর্ঘের কথা বলেছিল
জাক ভাসে তার পিস্তলের ভয়ংকর সংগ্রহ দেখাতে নিমন্ত্রণ করেছিল
আমাকে
বেচারা কক্তো একদা চমৎকার রাদিগে'র জন্য বিষণ্ন ছিল এবং তার
শেষ ভাবনায় আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম
মৃত্যুর কাছে পরিচয় পত্র নিয়ে রিগো
এবং জীদ টেলিফোন এবং অন্যান্য অদ্ভুত আবিষ্কারের প্রশংসা করেছিল
আমরা প্রধান বিষয়ে একমত হয়েছিলাম যদিও সে সুগন্ধি আন্ডারপ্যান্ট
সম্বন্ধে বকবক করেছিল অনেক
কিন্তু তাহলেও সে হুইটমানের ঘাস গভীরভাবে পান করেছে এবং
কলোরাডো নামে সমস্ত প্রেমিকরা তাকে ঈর্ষা করেছে
আমেরিকার যুবকরা হাতভর্তি শার্পনেল এবং বেসবল নিয়ে হাজির
ওঃ গীয়ম, এ পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কত সহজ, কত সহজ মনে হয়

তুমি কি জানতে বিরাট রাজনীতির উচ্চাঙ্গ লেখকরা মঁপারনাসে
ঢুকে পড়বে
তাদের কপাল সবুজ করার জন্য শুধু এক বসন্তের অবতারের লরেল নিয়ে
তাদের বালিশে একদানা সবুজ নেই, তাদের যুদ্ধ থেকে একটিও পাতা
নেই—মায়াক্‌ভস্কি এসেছিল এবং বিদ্রোহ করেছিল।

(৩)

ফিরে এসে একটা কবরের উপর বসে তোমার স্মৃতি ফলকের দিকে
তাকিয়ে আছি
অসমাপ্ত লিঙ্গের মতো এক খণ্ড পাতলা গ্রানাইট
পাথরে একটি ক্রুস মিলিয়ে যাচ্ছে, পাথরে দুটি কবিতা একটি ওল্টানো
হৃদয়
অপরটি প্রস্তুত হও আমার মতো যে অলৌকিক
উচ্চারণ করেছি আমি কসত্রোউইত্স্কির গীয়ম অ্যাপোলিনেয়ার
কে যেন ডেজি ফুল ভর্তি একটা আচারের বোতল রেখে গেছে এবং একটি
৫ বা ১০ সেন্টের সুর্‌রিয়ালিস্ট ধরনের কাচের গোলাপ
ফুল এবং ওল্টানো হৃদয়ে সুখী ছোট্ট সমাধি
একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে যার সাপের মতো গুঁড়ির কাছে আমি বসেছি
গ্রীষ্মের বাহার এবং পাতাগুলো সমাধির উপরে ছাতা এবং কেউ
এখানে নেই
কোন্ অশুভকণ্ঠ কাঁদে গীয়ম কোথায় তুমি এলে
তার নিকটতম প্রতিবেশী একটি গাছ
সেখানে নীচে হাড়ের স্তূপ এবং হলুদ খুলি হয়তো
এবং ছাপানো কাব্য অ্যালকুলস্ আমার পকেটে, তার কণ্ঠস্বর
মিউজিয়মে
এবার একটি মধ্যবয়স্ক পায়ের ছাপ কবর ঘুরে যায়
একটা লোক নামের দিকে তাকায় এবং কবর গৃহের দিকে
চলে যায়
একই আকাশ মেঘের মধ্যে ঘোরে যুদ্ধের সময় রিভিয়েরাতে
ভূমধ্যসাগরের দিনগুলি যেমন ছিল
ভালোবাসায় অ্যাপোলো পান করে মাঝে মাঝে আফিম খেয়ে সে আলো
আলো নিয়ে গেছে
সেন্ট জারমেনে কেউ নিশ্চয়ই আঘাতটা বুঝেছিল যখন সে যায়,
জেকব এবং পিকাসো কেশেছিল অন্ধকারে
একটা ব্যান্ডেজ খোলা হলো এবং ছড়ানো বিছানায় একটা মাথার খুলি
স্থির হয়ে রইলো

থলথলে আঙুল, রহস্য এবং অহঙ্কার চলে গেল
দূরে রাস্তায় একটা ঘণ্টা বাজলো, পাখিরা কিচির মিচির করে উঠলো
চেস্টনাট গাছে
ফামিল ব্রেমোঁ কাছেই ঘুমিয়ে আছে, বিশাল বুক এবং যৌন আকর্ষণ করার
মতো যিশু ঝুলছে তাদের কবরে
আমার কোলের উপরে সিগারেট ধোঁয়া দিচ্ছে এবং পাতাগুলি ধোঁয়ায়
ভরিয়ে দিচ্ছে এবং আগুন জ্বলছে
একটা পিঁপড়ে আমার কর্ডুরয়ের হাতায় দৌড়ে গেল এবং যে গাছে
আমি ভর দিয়ে আছি সেটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে
ঝোপ এবং গাছপালা কবর ছাড়িয়ে ওপরে উঠছে একটা সোনালি
মাকড়সা ঝক্‌ঝক্ করছে গ্রানাইটে
এখানে আমার কবর হয়েছে এবং আমার কবরের পাশে একটি গাছের
নীচে বসে আছি।



নীরা, হারিয়ে যেও না

সূচিপত্র

এই দৃশ্যে ১২৭, নীরাকে দেখা ১২৭, আজ সারাদিন ১২৮, এই আমাদের প্রেম ১২৯, নীরা, হারিয়ে যেও না ১২৯, ফেরা ১৩৩, হাত ১৩৪, দেখা হলো কি দেখা হলো না ১৩৫, মাদারির খেলা, এই আছে, এই নেই ১৩৫, সারাজীবন ১৩৭, বসুধৈব ১৩৮, তিনি এবং আমি ১৩৯, একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি ১৪১, জল যেন লেলিহান আগুন ১৪১, আমাদের কৈশোরের ১৪৩, দর্পণের মধ্যে ১৪৪, দু'দিক জ্বালানো মোম ১৪৪, আরও গভীরে ১৪৫, আশ্চর্য নদী ১৪৫, রাশিয়ান রুলেৎ ১৪৮, দেখা হলো না ১৪৮, সমুদ্রের এপারে ওপারে ১৪৯, রাজসভায় মাধবী ১৪৯, পাগলে পাগলে খেলা ১৬২, বকুল, বকুল, কথা বলো ১৬৩, দুটি আহ্বান ১৬৪, আত্মজীবনীর খসড়া ১৬৬, সে আসবে, সে আসবে ১৬৮, যার জন্য সারা জীবন ১৬৮, বিকেলের বর্ণফেরা ১৭০, মন্ত্র ১৭০

এই দৃশ্যে

এখানে আগুন বেশ তরমুজের মতো ঠাণ্ডা, এই দৃশ্যে
দু'দশদিন থেকে যাওয়া যায়
সিঁড়িগুলি মখমলের মতো কাম্য, এই সিঁড়ি
নেমে গেছে কোনো এক লুপ্ত শতাব্দীর সানুদেশে
কুসুম কাঁটায় বেঁধা প্রজাপতি, কাচের জানলায়
এক পথভোলা অলি
ওদের সহাস্য মুক্তি দেওয়া হলো, খুলে গেল
সুন্দরের নবীন যৌবন
এখানে বাতাস বেশ সমুদ্রের তলপেটের মতো নীল
একটি হরিণী তার মিলন সুখের পর বিছানায়
রেখেছে কস্তুরী
এখানে ঈর্ষার পাশে বুড়ি ধাইমার মতো পা ছড়িয়ে
বসে আছে কৃতজ্ঞতা
এই দৃশ্যে দু' দশদিন থেকে যাওয়া যায়!

নীরাকে দেখা

আমার দূরত্ব সহ্য হয় না, নীরা, ঝড়ের রাত্রির মতো
কাছে এসো
যেমন নদীর গর্ভে গুমরে ওঠে নিদাঘের তোপ
প্রতিটি শিমুল বৃক্ষ সর্বাঙ্গে আগুন মেখে যেমন অস্থির
আমি প্রতীক্ষায় আছি

বৃষ্টির চাদর গায়ে, হাল্‌কা পায়ে, দিক্‌বধূর মতো তুমি
এই দরদালানে একটু বসো
মুখের একদিকে আলো, অন্যদিকে বিচ্ছুরিত, উদ্ভাসিত কালো
ভুরুতে কিসের রেণু, নরম আঙুলে কোন্ অধরার লীলা
ওরে তোকে ভালো করে দেখি, কিছুই তো হলো না দেখা
সামান্য জীবনে
নির্লজ্জ শরীরবাদী এই লোকটা এখনো তোমায় ছোঁয়নি স্থাণুর শিকড়ে
দ্যাখো তার হাতে
হাঁসের পালকে লেখা বসন্ত প্রবাস!

আজ সারাদিন

আজ সারাদিন একটাও কথা বলিনি কারুর সঙ্গে

ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে শুনছি কোলাহলময় সঙ্গীত
পায়ে ক্ষীণ ব্যথা, জুতো খোলা যাক, খালি পায়ে দিক হাওয়া
বুড়ো আঙুলের নখদর্পণে ঝলসে উঠলো প্রাক রজনীর চাঁদ
হাঁটু গেড়ে বসি, এত ধুলোময় জগতে আমার চাঁদের গায়েও
ধুলো
তারই যেন এক বিন্দুর নাম সুনীল, হঠাৎ ভেসে যাবে কোন্
স্রোতে
বড় মজা লাগে, ফুঁ দিয়ে ওড়াই অজস্র জলবিম্ব।

আজ সারাদিন একটাও কথা বলিনি কারুর সঙ্গে

জামার বোতামে সূচ ও সুতোর স্মৃতি-কথা শোনা গেল
মেশিন ঘরের বাইরে হারিয়ে ব্রাত্য বোতাম ছুঁয়েছিল কার হাত
সেই চম্পক অঙ্গুলি আজ খেলা করে এই রোমশ বুকের গভীরে
দু' পাশে কত না মানুষের ঢেউ অচেনা ভাষায় হাসাহাসি করে
ছুটছে
আমি যেন আজই প্রথম এসেছি নীল আলো মাখা বাস্তুয়
পৃথিবীতে
ছেঁড়া কাগজের ভিজে অক্ষর নাম ধরে ডাকে, নদীও বললো,
এসো—

আজ সারাদিন একটাও কথা বলিনি কারুর সঙ্গে

হোটেলের ঘরে ঘুম ভেঙে যায়, ভোরবেলা নাকি সন্ধ্যা
এ কার বিছানা, কিংবা শায়িত লোকটি কি আমি, হয়তো বা
আমি নয়
জানলার কাচে ঝাপটা মারলো বনকুসুমের মনে পড়ে যাওয়া গন্ধ
কোন অরণ্যে এসেছি একলা, আকাশ ঢেকেছে জীবন্ত ডালপালা
অথবা পাশেই সমুদ্র, তার উচ্ছ্বাস এসে ভাসালো এ লোকভূমি
বড় মোহময়, পলাতক-সুখ, এমন শব্দ বর্ণের অবগাহন

আজ সারাদিন একটা কথাও বলিনি কারুর সঙ্গে...

এই আমাদের প্রেম

আমরা কথা বলছি
আর আগুনে ঝলসে যাচ্ছে বিন্নি ঘাস ভরা প্রান্তর
চচ্চড় শব্দ হচ্ছে, পুড়ছে মাটির মাংস-চামড়া
আমরা দেখছি না, আমরা শুনছি না
আমরা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি পরস্পরের দিকে
আঙুলের ডগায় বরফের টুকরো, মুঠোর মধ্যে চণ্ডালের চাহনি
তিলফুল থেকে বেরিয়ে আসছে শুঁয়ো পোকা
সাদা পায়রাকে ধারালো নোখে চেপে ধরছে গাং চিল
এরই ফাঁকে ফাঁকে উচ্ছ্বসিত আমাদের হাসি ঠাট্টা
পটপট করে ছেঁড়া হচ্ছে বুকের রোম, কানের মধ্যে জ্বলন্ত দেশলাই
তা ঢেকে দেবার জন্য বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছি আলি আকবর
বড় বড় কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে শয়ন ঘরে
আমরা এইবার নাচ শুরু করবো, এতগুলি খড়ের পা
পিতৃত্বের গালে কেউ ঠাস করে মারলো একটা চড়
আমরা খোকাকে বললুম, যা নাগরদোলায় দুলগে যা
হিমালয় থেকে খল খল করে ধেয়ে আসছে উৎসন্ন
আমরা তখন সবাই মিলে জ্যোৎস্না রাতে নদী দেখতে যাই
নদীর কিনারায় নারীকে মানায়, একা একা চান্দ্র রমণী
তার পেছনে কালো কালো ভূতগুলোর মাথায় পুলিশের লাঠি
সেই নারীর দুই উরুর মধ্যে সাপ, স্তন দুটিতে কুকুরের দাঁত
তার চোখ চেপে ধরে বলি, তুমি কী সুন্দর, বিমূর্ত, তবু হৃদয়হরণ
এই আমাদের প্রেম।

নীরা, হারিয়ে যেও না

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
আকাশে ভাঙা কাচের টুকরোর মতন আলো
বিপরীত দিগন্ত থেকে প্রবাসিনীর মতন দ্বিধান্বিত পায়ে
এগিয়ে এলে তুমি
সমস্ত শরীরময় শ্বেত হংসীর পালক, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা
আমি ভয় পেয়েছিলুম

তখন তো বেড়াতে আসার সময় নয়, অনেকেই যাচ্ছে নির্বাসনে
তখন হিংসেয় জ্বলছে শহর, মানুষের হাতের ছুরি গেঁথে যাচ্ছে
মানুষেরই বুকে
রাস্তায় বসে লাশের আগুনে পুড়িয়ে খাচ্ছে ধর্ম
রক্তবমির মতন ওগরাচ্ছে দেশপ্রেম
আমি চিলেকোঠায় বন্দি, তোমাকে চিনতে পারিনি
তারপর আমি একটা ছোট নোটবুক নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে গেলুম
নিবিড় নীলিমায়
তুমি তখন দক্ষিণেশ্বর ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে,
চোখের মণিতে নদী
নগরীতে প্রগাঢ় রাত্রির নির্জনতা, ঢং ঢং করে বাজছে
সমস্ত স্কুলের ঘণ্টা...

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
মনে আছে, তুমি গুহা মানবীর মতন সহসা কৈশোর ছিঁড়ে
খুব ভোরবেলায় শীতের নরম রক্তিম সূর্যকে আলিঙ্গনে, আদরে
জড়ালে
হরি ঘোষ স্ট্রিটের কদমগাছটি থেকে তখন টুপটুপ করে
ঝরে পড়ছে হীরের কুচি
দিনের প্রথম তীক্ষ্ণ ট্রাম বলতে বলতে গেল, জাগো, জাগো
রিভলভিং স্টেজের মতন উল্টোপাল্টা এই দুপুর, এই মধ্যরাত, এই
সন্ধ্যা
আমি তখন গলা ফাটাচ্ছি মিছিলে, নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
চতুর্দিকে লকলক করছে খিদে
আঃ সেই মায়াময়, ভিখিরির, যযাতির খিদে
কুম্ভীপাক নরকের মতন পেট মোচড়ানো খিদে
এক এক পলক দেখতে পাচ্ছি বারান্দায় ব্যাকুল মাতৃমূর্তি,
পাখির মতন চোখ
স্বপ্ন ছিল, দুনিয়ার সমস্ত মা-ই একদিন
সব কুচো কুচো বাচ্চাদের ধোঁয়া-ওঠা ভাত
বেড়ে দেবে
কলেজ স্ট্রিটের সেই বুলেট ও বিস্ফোরণ
তুমি বাস থেকে নামলে, তক্ষুনি সেই বাসে শুরু হলো
বারুদ উৎসব
এক দৌড়ে পার্কের রেলিং টপকে কে যেন দণ্ডির ভঙ্গিতে
শুয়ে পড়লো

ঘাসে মুখ গুঁজে।

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
তুমি রমণী ছিলে, নীরা হলে
আমি দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে সাজলুম ওষুধ-গুদামের কেরানি
জুতোর স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, রাস্তার মুচির কাছে বসেছি
উবু হয়ে
কেউ চিনতে পারছে না, পিঠের দিকে সবাই অচেনা
কখনো আমিই মুচি, সে পথচারি
কখনো আমিই রাস্তা, লোকে হেঁটে যাচ্ছে আমার
বুকের ওপর দিয়ে
কখনো আমি নীরবতা, আমিই অস্থির গর্জন
তুমি অন্ধ বৃদ্ধকে পয়সা দিলে, শিয়ালদার ঘড়িটি থেমে গেল
ট্রেন থেকে নেমে এত মানুষ দৌড়চ্ছে, সবাই থমকে গেল
কয়েক মুহূর্ত
তারপরই ঝনঝন শব্দে শুরু হলো প্রচুর ভাঙাভাঙি
টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় পুলিশ কাঁদছে, চীনেরা ভাই-ভাই মানলো না
ইস্তাহারের ধাক্কায় রাস্তা খোঁড়া গর্তে ছিটকে পড়ে অনেকেরই
পা মচকে গেল
তিনটে জ্যান্ত ছানা মহানন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে নর্দমায়
লাল চুলওয়ালা একদল সাহেব ফরাসি ক্যামেরায় তুলে নিয়ে গেল
সেই ছবি
তুমি পরীক্ষার হলে একা বসে রইলে, প্রশ্নপত্র এলো না
আমি নিচু হয়ে খুঁজছি ফুটো পকেটের খুচরো পয়সা
তুমি কুসুম সমারোহে গিয়ে পতাকার মতন উড়িয়ে দিলে আঁচল
আমি সারা সন্ধে শুয়ে রইলুম শ্মশানের পাশে।

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
সমস্ত ম্যাজিক দৃশ্যের ওপরেই এসে পড়ে শরীরের বিভা
কবিতার মধ্যে উঁকি মারে শরীর, কখনো তা ছায়া,
কখনো রক্ত মাংসের অবাধ্যতা
এক একবার ডুবে যায়, এক একবার মুখোমুখি এসে বসে
কালিদাসের ভ্রমর ছুঁয়ে দিল তোমার স্ফুরিত ঠোঁট
ঘাস ফুল হয়ে আমি তোমার নাভিমূলে জিভ রাখি
মদিগ্লিয়ানির নারীর মতন তোমার রম্ভোরুতে ঝলমল করে জ্যোৎস্না
একবার আমি শিশু, তুমি চিরকালের জননী

একবার তুমি অতি বালিকা, এক স্বৈরাচারী রাজা
চেয়েছে তোমাকে
সমুদ্র প্রবল ঢেউ তুলছে আকাশের দিকে
আকাশ নেমে আসছে পাতালে
যোনিপদ্মের ঘ্রাণ নিচ্ছে এক তান্ত্রিক
অতৃপ্ত মহামায়া বলছে, আরো, আরো
ওঃ সেই খেলা, সেই হৃদয়ের উন্মোচন
বসন্ত বিছানায় লেখা হলো কত শত রতি-ইতিহাস
গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে জানলার ধারে নির্বসন বসে থাকা
গোধূলি কিংবা ভোর
আমার হাতে সিগারেট, তোমার চুলে হিরণ্ময় চিরুনি
ভুলে যাওয়া পৃথিবী ফিরে আসছে একটু একটু করে, অন্তরীক্ষে
মৃদু কণ্ঠস্বর
গোধূলি কিংবা ভোর, আকাশে বিন্দু বিন্দু সাত-রং জলের ফোঁটা
সেইদিকে তুমি চেয়ে রইলে, এখন কোথাও বিমান উড়ছে না
কীটসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুমি আনমনে বকুনি দিলে নিউটনকে
তন্মুহূর্তে আমার আবার জন্মান্তর ঘটে গেল

নীরা, আমাদের ভুল ভেঙে যায়, আমরা ফের বালি দিয়ে ছোট ছোট
দুঃখের ঘর বানাই
আমরা এখনো ন্যাংটো বাচ্চাদের মতন ছোটাছুটি করছি
সমুদ্র তীরে
মাঝে মাঝে কী চমৎকার আড়াল, শতাব্দীর ঝাউবন
আমি তোমাকে দেখতে পাই না, আমি তোমার নামে কলম
ডুবিয়েছি দোয়াতে
আমি তোমাকে ছুঁইনি, তুমি গর্ভিণী হরিণীর মতন মিলিয়ে গেলে
পাহাড় প্রদেশে
এক একটা ঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দিক চক্রবাল
জাদুদণ্ড ঘোরালেই স্বর্গ থেকে নেমে আসা বিদ্যুৎ লহরী
প্রোথিত হচ্ছে ভূমিতে
সব কিছুই শব্দের কাটাকুটি, পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়া
করতলের আমলকিটি দেখে নিচ্ছি মাঝে মাঝে, সে-ও আমাকে দেখে
মিটিমিটি হাসছে
নীরা, তুমি সুদূরতম নৌকোয় একা, ছড়িয়ে দিয়েছো দুই ডানা
আমি দূরন্ত মেলট্রেনে বসে একটাও স্টেশনের নাম
পড়তে পারছি না

তুমি স্কুল কমিটির দলাদলি থেকে সরে গেলে দরজার আড়ালে
আমি দুপুরের পর দুপুর কাটিয়ে দিচ্ছি কাচ ঘেরা ঘরের চেয়ারে
অথচ কত নদী তীরের গাছের ছায়া খালি পড়ে আছে
যারা বিপ্লব এসে গেল বলেছিল, তারা লিখছে স্মৃতিকথা
আর যারা মুছে গেল, তারা বড় বেশিরকম মুছে গেল
লাল চুলওয়ালাদের ক্যামেরা এখনো ঘুরছে গলি-ঘুঁজির
আনাচে-কানাচে
কেউ আর ভালোবাসার কথা বলে না
মানুষের সভ্যতা ভালোবাসার কথা শুনলেই হাহা-হিহিতে ফেটে পড়ে
বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে কেউ একা একা কাঁদে আর
জলের ঝাঁপটা দেয়
নীরা, আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে, হারিয়ে যেও না
অনেক জন্ম বদল বাকি আছে, হারিয়ে যেও না
নীরা, অমৃত খুকী, হারিয়ে যাস নি!

ফেরা

মেল ট্রেন থেকে নেমেই চাপলুম গড়বন্দীপুরের জন্য গরুর গাড়িতে
শীত পড়েছে জাঁকিয়ে
আমার গায়ে ঠাকুর্দার ব্যবহার করা শাল
সিগারেট ধরাতেই হঠাৎ মেজাজ খিঁচড়ে গেল, ড্যাম্প লাগা, ঠিক ধোঁয়া
বেরুচ্ছে না
কিন্তু আমার লাইটারটা বিদেশ থেকে এনে দিয়েছে এক বন্ধু
বাচ্চা গাড়োয়ানটি বেশ হিন্দি সিনেমার গান গায়, যদিও তার বাবা
জেল খাটছে অন্যের জমিতে ফসল কাটার দায়ে
এখন দু পাশে তুলোট কাগজের মতন শূন্য মাঠ, ব্যাঙের চামড়ার মতন
শূন্য ডোবা
সাইকেলে ট্রানজিস্টার রেডিও ঝুলিয়ে চলে গেল একজন
উল্টোদিক থেকে হেঁটে আসছে আর একজন, তার দাড়িতে কোনোদিন
ব্লেড-ক্ষুরের ছোঁয়া লাগেনি মনে হয়
বট-চারা ওঠা শিব মন্দিরে রুনু রুনু ঘণ্টা বাজছে, তা ঢেকে দিল
বিমানের মেঘমন্দ্র ধ্বনি
মুদিখানায় ঠোঙ্গা ছিঁড়ে খবরের কাগজ পড়ছেন নিরাপদ মাস্টার

অবিকল আমার বাবার পিসিমা যেন তিরিশ বছর পরে বেঁচে উঠে তুলসী
তলায় দেখাচ্ছেন প্রদীপ
ন্যাংটো একটা বাচ্চা ছেলে ধুলো মেখে খেলা করছে
ওকে দেখে সত্যেন দত্ত কবিতা লিখেছিলেন সত্তর বছর আগে
বৃষ্টির মতন নেমে আসছে অন্ধকার
শুধু জ্বলছে হিমঘরের আলো
ভাঙা সাঁকোটি খচর খচর শব্দে বলছে, এসো, এসো এসো
চতুর্দিকে অজস্র ঝিঁঝিঁর ডাক বলছে, এসো, এসো, এসো
বাজ পড়া শিমুল গাছটি এখনো বাড়িয়ে রয়েছে ভূতের মতন দুটি লম্বা
হাত।
আমি গড়বন্দীপুরে ফিরে আসছি
আমি মহাশূন্য থেকে ভেসে আসছি আবহমান কালের গড়বন্দীপুরে
আমার মাথার পিছনে বৃত্তের মতন ঘুরছে ঠাকুর্দার আমলের জোনাকি
মাসি-পিসিদের দীর্ঘশ্বাসের মতন উড়ছে বাতাস
মোমের আলো মিট মিট করে নিবে যাওয়ার উদ্যমে ব্যস্ত আমি
আসছি, আমি ফিরে আসছি,
আমার হাতে পারমাণবিক টর্চলাইট!

হাত

ধরা যাক, আজ থেকে আমি আমার বাবার নাম দিলুম
নিরাপদ হালদার
মাঝারি উচ্চতা, সারা দেহে ঘামাচি রঙের ঘাম মাখা সেই মানুষটি
রানাঘাটের এক ভাতের হোটেলের ম্যানেজার
তা হলে আমি কি মফঃস্বলের ক্লাস এইটে পড়া রাধারমণ?
আমাকে ফর্সা ছেলেরা চাঁটি মারে যখন তখন!

ধরা যাক আমার মা চৌধুরী বাড়ির ঠিকে ঝি,
গালে মেছেতার দাগ।
একটু মুখ খারাপ করা স্বভাব
তা হলে আমি কি সন্ধের দিকে দেশবন্ধু পার্কের ছিনতাইবাজ?
আমার ভাই হিন্দ্ মোটর্সে ট্রেন আটকাতে গিয়ে গুলি খেয়েছে
আমি নিজেও ফিসপ্লেট বিষয়ে শিখে নিয়েছি অনেক কিছু

আমার বোন পোড়া কয়লা কুড়োয় রামরাজাতলায়
কোন কোন দিন ট্রেন আসে না, কয়লাও পোড়ে না!

একটা প্রকাণ্ড শামিয়ানার নীচে আমাদের জন্য রান্না হচ্ছে খিচুড়ি
চারিদিকে ম ম গন্ধ, আমরা যেন শিকারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত
কে যেন তুলে দেখালো একটা খাসির রাং
অনেকেই প্রবল উরু চাপড়ে বললো, বাঃ বাঃ বাঃ
আমি অবশ্য জানি না কে আমার বাবা কিংবা প্রকৃত মা
কিন্তু কারুর সঙ্গে হাতে হাত মেলাই নি
হাত দুটো পরিষ্কার তৈরি রাখতে হবে তো
বলা যায় না, কোনো একদিন সত্যিই যদি কিছু একটা ঘটে যায়
যেদিন সবাই আমাকে এসো এসো বলে খুব ভালোবেসে ডাকবে...

দেখা হলো কি দেখা হলো না

ভালোবেসো সেই ভালোবাসাকে, আমার আর
কিছুই চাই না
পুড়ুক না হয় প্রিয় নদীটি, ভাসুক সারা
শরীর জুড়ে দূর প্রবাস
জন্ম জন্ম পায়ে ফোটার কাঁটা, একটু
নীরব নীল দুঃখ কুচি
দেখা হলো কি দেখা হলো না
ঐ মেঘ আর এই মেঘে ধারাপাত হলো না
ভালোবেসো তবু ভালোবাসাকে, আমার আর
কিছুই চাই না।

মাদারির খেলা, এই আছে, এই নেই

মাঝে মাঝে পূর্বপুরুষদেরও চুরমার করে ভাঙলে মন্দ হয় না
শুধু কি দু'চারটে দেবালয়ের দারু ও পাথর, রঙিন কাচ
আমি নিজেকেও ভাঙছি, গলা দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে নামছে

বিষের ধোঁয়া
আজ কখন দিনের পেটে রাত্রি আর রাত্রির গর্ভে ঘুমহীন উল্লাস
কেউ নেই, কেউ কাছে নেই, শুধু খননের শব্দ, শুধু পতনের শব্দ
কোথাও ডাকে না রাতপাখি, জ্যোৎস্না-ফোৎস্না মেরুপ্রদেশে
বেড়াতে গেছে
মাকড়সা জালের মতন নিঃশব্দ পড়ে আছে এই পৃথিবী
আমি কী খুঁজছি, আমি কী খুঁজছি, আমার একাকিত্বে জ্বলছে
আগুন।

মাঝে মাঝে আশ্রমের ধুলোতেও মেশানো দরকার বারুদ
যারা দেঁতো হাসি হেসে বংশ রক্ষা করে যাচ্ছে, তারা স্বপ্নেও
ভয় পাবে না?
পায়ের নীচে দ্রুত সরে যাচ্ছে বালি, মাথার কাছে ঝামরে পড়ছে
মেঘ
এসো, এই সময় আমরা একটা মহোৎসব করে
এই শুয়োরের বাচ্চা সভ্যতাকে ভাঙি
এসো, জল ভাঙি, আকাশ ভাঙি, সহানুভূতিকে খুচরো পয়সা
করে বিলিয়ে দিই
টুকরো টুকরো কাচের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে খালি পায়ে
ভিখিরিরা
ওদেরও ডাকো, ওরা যা পায়নি তা ভাঙবার একটু সুখ দাও
ভাঙো শৃঙ্খল, ভাঙো কবিতা, ভাঙো পার্টি অফিসের রামধনু
যারা পরমাণু ভেঙেছে, তারা কি চেটে নিয়েছে সেই ধুলো
ওগো, আমি খবরের কাগজ পড়ি না, এটা কোন্ শতাব্দী,
এই মহাশূন্যের কোন্ দেশ?

আমাকে একটা সুন্দর শৈশবের ছবি দেখিয়ে ভুলিও না, ওটা
একটা
পিকচার পোস্টকার্ড
এই সুখের বাড়িটি কার, আমি তা ঢের দেখেছি ইঁদুরের দৌড়
ইঁদুর-দলপতিরা সব বীর পুরুষ, আমি আসলে বোধহয় পুরুষের
ছদ্মবেশে নারী
আমার মেয়েলি-ছেলে হতে কোনো আপত্তি নেই, আমি
কোনোদিন রাইফেল হাতে
যুদ্ধে যাবো না
আমার ঢাক-ঢোল পেটানো প্রেম নেই, মোষ বা ষাঁড়ের মতো কাঁধ

নেই
আমি কোনো এক লবাব খাঞ্জা খাঁ-র খামখেয়ালের ছেলে,
আমার মা এক
পাতাকুড়োনি বা অন্য কেউ তা কে
জানে!
আমার হাতে অনেকগুলো ধ্বংস, আমার হাতে কয়েকডজন
শূন্যতা
দ্যাখো দ্যাখো মাদারির খেলা, এই আছে এই নেই, এই আছে
এই নেই
তুমি কে গো কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াচ্ছো সামনে, তুমি কোন
অন্ধবিশ্বাসের মৌরসীপাট্টা
ওগো ইতিহাস, আমি তোমার চিবুকে বাঁ পায়ের ঠোক্কর দিয়ে
বলবো,
আমি সাত পুরুষের বেজন্মা
সেই রকমই এক বেজন্মা ঈশ্বরের বাচ্চা
ওহে চাঁদবদন, গাল ভরা কথায় কথায় আর খেলিও না!

সারাজীবন

দগ্ধ মাটির গর্ভ থেকে ফুটে উঠলো গান
জল চাই না, বীজ চাই না, আরও আগুন আন
রোগা আগুন, কালো আগুন, আগুন-রঙা খিদে
একটু একটু পাবার আগে, সর্বনাশ দে!

পেরিয়ে মাঠ, আল জাঙাল, ঝামড়ে উঠলো বাতাস
ঘর ছাড়াকে ডেকে বললো, কোন্ ঘর তুই চাস?
দেয়াল জোড়া বর্ষাধারা মাথার ওপর শীত
শাবল দিয়ে ভাঙ আগে সব সাত পুরুষের ভিত!

অচেনা রাত, আঁধার দেশ, ভেতরে এক আলো
কখনো নীল, কখনো পীত, আবার সে হারালো
তুমিও কিছু বলবে না কি, গান গাইবে না?
সারাজীবন হেলায় গেল, হলো না কিছু শোনা!

বসুধৈব

ট্রেনে ধূপ বিক্রি করতে উঠলো যে নুলো ছেলেটি
সে কি আমার কোনো পিসতুতো ভাই?
থুতনির ডৌলে কোথায় যেন বহুকাল আগেকার আমার
কুমারী পিসিমার আদল
জিজ্ঞেস করতে ভরসা হয় না, যদি কাঁধে চেপে বসে, যদি
আমার হাত দু'খানা সে ধার চায়?
আমি মুখ ফিরিয়ে নিই, ধূপের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।

বারাসত বাস গুমটিতে জানলার কাছে যে হাত পেতে দাঁড়ালো
সে আমার ছোট মাসি হতেই পারে না
সে তো হারিয়ে গেছে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন বিস্মৃতিতে
তার নামের ওপর জন্মে গেছে অসময়ের লতাগুল্ম
তবু সেই লম্বা ভিখারিনীটি হঠাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে
গাঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কেন?
সেই চোখে যেন ছেলেবেলার রান্নাঘরের বারান্দার
পারিবারিক গল্প
পুকুর থেকে স্নান সেরে উঠে আসবার মতন আঁচলে জড়ানো গা
আমি কিছু বলার আগেই সে চলে গেল উল্টোদিকের অন্ধকারে
ভিখারিনীরও এত অহঙ্কার?

অ্যাকসিডেন্টে হেলে পড়া ট্রাকটির ড্রাইভারের দিকে চাইতেই
আমার বুক কাঁপলো কেন?
ঐ চওড়া কপাল, বাজপাখির মতন নাক, শাজাহান না?
কলেজ জীবনে টাকা ধার দিয়ে আর ফেরৎ নেওয়া হয়নি, আমার চেয়ে
তারই বেশি লজ্জা ছিল সেইজন্য
সেই শাজাহান তো মার্কিন দেশে মহাশূন্য রকেটের নাট-বল্টু লাগায়
সে নাকি কিনেছে কোনো দ্বীপ, সেখানে নিজস্ব পতাকা ওড়াবে
তবু ট্রাক ড্রাইভারের থ্যাঁৎলানো মুখখানায় জ্বলজ্বল করছে চোখ,
সে অবিকল শাজাহান হয়ে বলছে, চিঠির উত্তর দিসনি কেন,
রাস্কেল?
বড় রাস্তা ছেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেলেন
আমার ছোটকাকা
না, আমার বাবার কোনো ভাই-টাই ছিল না কখনো...

তিনি এবং আমি

কেন রবীন্দ্রনাথকে তুমি বুকে জড়িয়ে বসে আছো
জানলার ধারে
আমি কি কেউ না?
আমি গরিব ইস্কুল মাস্টারের ছেলে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তায় হাঁ করে
জলকাচা ধুতির ওপর পেঁজা শার্ট পরে, পায়ে রবারের স্যান্ডেল
আমার কোনো জ্যোতিদাদা ছিল না, পিয়ানো-অর্গান শুনিনি
সাত জন্মে
আমার বাবা কোনো দিন সিম্‌লে পাহাড়ে যান নি আমাকে নিয়ে
জন্মদিনে রুপোর চামচে পায়সান্ন খাওয়া দূরে থাক, ফ্যানা ভাতে
কোনোদিন ঘি জোটেনি
তবু আমি কি কেউ না?
আমার নিজস্ব ঘর নেই, লেখার টেবিল নেই, যখন তখন আমার বিছানায়
উড়ে আসে
উনুনের ঠাণ্ডা ছাই
তিনবেলা টিউশানি করি, সর্বক্ষণ পেটে ধিকিধিকি করে খিদে
তবু আমি কবিতা লিখেছি, সবাইকে লুকিয়ে, মোম-জ্বলা মাঝ রাত্রে
আমার রক্ত, ঘাম, আত্মার টুকরো মিশে আছে তাতে।

আমার বাবা শিরোপা দেবার বদলে জুতো মারতে উঠেছিলেন
স্বর্ণকুমারী কিংবা প্রতিভা নয়, আমার ছোড়দির নাম চামেলী
আমার খাতার পাতা ছিঁড়ে সে বাতাসকে
উৎসাহ দেয়
বাড়ির দেয়াল থেকে পাড়ার মোড় পর্যন্ত ঝনঝন করে উপহাস
বড় জামাইবাবু মাথায় চাঁটি মেরে আমায় 'কপি' বলে
শ্যালিকাদের হাসিয়েছেন
তবু আমি লিখেছি, আমি লিখে গেছি
রবীন্দ্রনাথ আমার এই চৌহদ্দির মধ্যে জন্মালে লিখতে পারতেন
এক লাইনও?

বিহারীলালের মতন কোনো নামজাদার সঙ্গে আমার চেনা-জানা ছিল না
গলা থেকে মালা খুলে আর দেবে,
মালা পরাই উঠে গেছে
পত্রিকার সম্পাদকরা উত্তর দেন না, ডাক টিকিট মেরে দেন
তবু আমি লিখেছি, লিখে গেছি

আমার সমস্ত অস্তিত্বের নির্যাস নিয়ে এক একটি কবিতা
শুধু তোমাকে শোনাবার জন্যই নয়, তোমাকে রচনা করবার জন্য
তোমার পায়ের তলার ধুলো, চুলের মধ্যে ঘাম শুষে নেবার জন্য
তোমার ফ্যাকাসে হাসির চার পাশে একটা বৃত্ত এঁকে দেবার জন্য
এবং এক সময় তোমাকে ছাড়িয়ে আমি রক্ত নদীর তীরে দাঁড়িয়ে
গণ্ডূষ পান করেছি।

বন্ধুরা চাঁদা দিয়েছিল, তাই নিয়ে ছাপিয়েছি প্রথম কবিতার বই
প্রেসে এখনও কিছু ধার রয়ে গেছে
দপ্তরী খানায় দয়া চেয়েছি
তারপর ছুটতে ছুটতে এসেছি তোমার কাছে, তোমার করকমলে
প্রথম কপিটি দেবার জন্য
পাপীয়সী, তুমি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বুকে জড়িয়ে আদর করছো
আমি কি কেউ না?
আমার ঈর্ষা লকলক করে উঠছে আকাশে, এখন এক প্রবল বজ্রপাতে
ধ্বংস হয়ে যাক
রবীন্দ্রনাথের মতো সব কিছু
তার ওপরে রেখে যাবো আমার দীন দুঃখী কাব্যগ্রন্থখানি!

রবীন্দ্রনাথের সব কিছু ধ্বংস হলেও কোনো ক্ষতি নেই
বাড়ি ফিরেও, সব কিছু মুছে দিয়ে, তোমাকেও
নির্মম একাকিত্বে
আমার হাহাকার, আমার সমস্ত গুপ্তকথার মতন অনর্গল মুখস্থ বলে যাবো
রবীন্দ্রনাথের কবিতা
একটাও কমা, হসন্ত ভুল হবে না
রবীন্দ্রনাথকে আমি ভাঙবো, ছিঁড়বো, যা খুশি করবো
সে সব আমার নিজস্ব ব্যাপার
রবীন্দ্রনাথও সে কথা জানতেন, মৃত্যুর আগে সেই জন্যই
তাঁর ঠোঁটে লেগে ছিল
ক্ষীণ কৌতুকের হাসি!

একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি

একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি দুলছে অন্ধকারে
এখনো ঠিক সময় হয়নি, ট্রেন ধরবার তাড়া
কিছু না কিছু ভুলোমনায় কাটবে অনেক বেলা
এখানে যাই ওখানে যাই মুখ ফেরানো মানুষ
একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি দুলছে অন্ধকারে।

আমার হাজার কাজের মধ্যে জমছে মন খারাপ
ভুল সকাল, ভুল দুপুর, মিথ্যে একটা দিন
বকুল গাছের নীচে আমার যাবার কথা ছিল
উঠেছে ঝড়, ঝরেছে ফুল, সেখানে কেউ নেই
নদীর জলে পা ডুবিয়ে ধুয়েছি ভালোবাসা

শহর ভরা এত জোয়ার, জলের মধ্যে পিঁপড়ে
ঘর বানাবার সভ্যতা এক লিখেছে ইতিহাসে
চক্ষু পোড়ে, কপাল ভাঙে, মাথায় বিষ জ্বালা
স্বপ্ন ছিঁড়ে উনুনে দেয় আদম-ইভের মা
আকাশ নেই, বাতাস নেই, রাত্রি ভরা আগুন।

আমায় ভয় দেখায় একটা ইহলোকের প্রেত
শরীরে তার সার্থকতা, গীতার নিষ্কাম
মুখ ফেরাই, পালাতে চাই অন্য দিক সীমায়
যেখানে কিছু পাবার নেই, শুধু দেখার সুখ
একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি, আছে কোথাও, আছে...

জল যেন লেলিহান আগুন

রাত্তিরে আড়িয়াল খাঁ-র গর্জনে হঠাৎ ছিঁড়ে যায় ঘুম
মেঘ ভাঙা শব্দের মতন কূল ভাঙছে
বিদ্যুৎ রেখাঙ্কনের মতন মাটির ফাটলে শোঁ শোঁ করে ঢুকছে বাতাস
বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে ছুটে যেতেই মনে পড়ে
আমি তো রয়েছি একটা লম্বা অট্টালিকার টঙে

অনেক নীচে কালো রাস্তা, বন্ধ দোকানগুলোর সামনে
ঘেউ ঘেউ করছে কুকুর
এখানে কোথায় আড়িয়াল খাঁ, কোথায় পার ভাঙা
তবু ভাঙছে, মাটি ভাঙছে, এগিয়ে আসছে স্রোত
ছেলেবেলার শ্লোকটা আপন মনে বিড়বিড় করি,
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

মাদারিপুর থেকে নৌকায় যেতে যেতে দেখতুম আধ-ডোবা
কদমগাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে আছে
হলুদ-কালো জলঢোঁড়া সাপ
আমাদের উঠোন থৈ থৈ করছে, ভাসছে কচুরিপানা
ঠাকুমা চিৎকার করছেন, ওরে রান্নাঘর ডুবলো, ডুবলো
হাঁড়ি-পাতিলগুলো ধর
ঈষৎ খয়েরি রঙের সেই ছবিটি একটু একটু করে কাঁপছে
ঠাকুমার মুখখানা মনে পড়ছে না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি
জলের ঝাপটানি
এখনো আমার বয়েসী কোনো কিশোর দৌড়োচ্ছে
আড়িয়াল খাঁ-র বান থেকে বাঁচবার জন্য?
ডুবে যাচ্ছে অসংখ্য রান্নাঘর, তৈজসপত্রের সঙ্গে ওলটপালট খাচ্ছে
অন্য কার ঠাকুমার শরীর...
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

বিক্রমপুরের সেই পরিচ্ছন্ন সুন্দর গ্রাম, কলাকোপা বান্দরা
তার পাশে ইছামতী নদীটি বড় তীব্র
ভেসে আসছে বড় বড় গাছের ডালপালা আসামের জঙ্গল থেকে
ঘাটলায় বসে জলের সৌন্দর্য দেখি একদিন
পরেরদিনই সেই জল ভয়ংকর হয়ে লাফিয়ে ওঠে
মিলে যায় বুড়িগঙ্গার সঙ্গে শীতলাক্ষা, তার সঙ্গে মেঘনা
পিঁপড়ের বাসা ভেসে যায়, মানুষের শহরও কাঁপে টলমল করে
আকাশ ঢেলে দিচ্ছে দিগদিগন্তের সমস্ত ঝর্না
আঃ বৃষ্টি এত সুন্দর, এমন হিংস্র, এমন সর্বনাশা
মানুষকে তাড়া করছে জল, ঠিক যেন লেলিহান আগুন...
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

জোরহাট থেকে গোলাঘাট হয়ে নওগাঁ-র দিকে মানুষ ছুটছে
জলপাইগুড়ি, মালদা, দিনাজপুরে মানুষ ছুটছে

আত্রাই-পুনর্ভবা-তিস্তার এপারে ওপারে মানুষ ছুটছে
ধলেশ্বরী, ডাকাতিয়া, ভৈরব, ভদ্রার ভয়ে মানুষ ছুটছে
ওদিকে কম্পানিগঞ্জ, সোনাগাজি, এদিকে বংশীধারী, দেবীকোট থেকে
মানুষ ছুটছে
ভুরুঙ্গামারি আর লালমনির হাট একাকার হয়ে গেছে, মানুষ ছুটছে
ধেয়ে আসছে নদী অজগরের মতন নিঃশ্বাস ফেলে
আমি কলকাতার শানবাঁধানো রাস্তায় ঘুরছি, সব কিছু ঠিকঠাক,
শুধু রবিবারের চাঁদা আর
খবরের কাগজের ছবি
বার বার মনে আসছে ছেলেবেলার সেই ভয়-কাঁপা ঠোঁটে উচ্চারিত
শ্লোক:
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

আমাদের কৈশোরের

সাতটা পঁচিশে তুমি নেমে এলে স্তব্ধতার সিঁড়ি ভেঙে, ওই দেশে
বৃষ্টি হয়েছিল?
এবারে অনেকদিন পরে এলে নীরা
কী এমন পিছুটান, ওষ্ঠে কেন ক্ষীণ অভিমান
স্বর্গে কোনো খেদ ছিল, ওখানেও হৃদয়ে লাগে দাহ?

নীরা, এসো, কম্পানি বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি
চিনে বাদামের সঙ্গে আঙুলের ছোঁওয়াছুঁয়ি, এক ঝলক সুখ
কত গল্প বিনিময় বাকি আছে, কত নীরবতা
শুকিয়ে গিয়েছে ঘাস, এ বছর খরা হলো খুব
বারুদের কারখানায় যারা হোলি খেলতে গেল
বাতাসে তাদের দীর্ঘশ্বাস
তোমার খোঁপায় কোনো ফুল নেই, স্বর্গে বুঝি ফোটেনি মন্দার?

বলো বলো, ও দেশের কথা বলো, প্রিয় নদীগুলি, হিরণ্ময়
অরণ্যেরা রয়েছে তো ভালো?
বহতার দূতী তুমি, কী এনেছো এবার দু' হাতে
দিগন্তের বর্ণময়ী, চোখে কেন অশ্রুর কুয়াশা?
তবে দ্যাখো এই পাঞ্জা, এক মুহূর্তের জাদু,
আমাদের কৈশোরের লক্ষ্মীকান্তপুর!

দর্পণের মধ্যে

কোনোদিন যে ভোর দেখে না সে একদিন হঠাৎ জেগে উঠলো
চুম্বক টানে বাইরে এসে সে ধারাস্নান নিল
বেদানার কোয়ার মতন আলোয়
তার দু'চোখে ছিল আঠা, স্নায়ুতে ছিল মাদক
সে মেতে ছিল আত্মধ্বংসের নেশায়
এই শতাব্দীর শিয়রের কাছে ঝুলছে সর্বনাশের খড়্গ
সন্তান সন্ততিদের জন্য থাকবে না কোনো উত্তরাধিকার
তুলোর আগুনের মতন ধিকিধিকি করে পুড়ে যাচ্ছে সব স্বপ্ন
সে ভেবেছিল শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে দ্রুত যত পারা যায়
ঘন ঘন নিশ্বাস নিয়ে যাবে,

সেই মানুষটি আজ সবুজ ঘাসের মতন স্নিগ্ধ বাতাসে
নদীর গর্ভের মতন নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে
সমস্ত পৃথিবীকে দেখলো এক দর্পণের মতন, তার মধ্যে
ঝকঝক করছে অন্য এক তাজা পৃথিবী
সে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে বললো, আঃ!

দু'দিক জ্বালানো মোম

আঙুল পুড়িয়ে মোম, একি চমৎকার
শুরু হলো আঙুলের নাচ
চতুর্দিকে কান ঝালাপালা বাজনা, আর এই
অশনি উৎসব
এর মধ্যে এঁকে বেঁকে ছোটাছুটি কৈশোর রক্তিম
কত ভালোবাসাময় শুকনো ফুল, নিষিদ্ধ শরীর
বৃষ্টি যেন বাল্য প্রেমিকার হিসি শব্দ
হঠাৎ দরজা খোলে বুক কাঁপা আলো।

নদীরা যেমন গিলে নেয় সব ফুটো নৌকোগুলি
সেরকমই সুন্দরের গর্ভে এত ব্যক্তিগত শোক
সহস্র জানালা তবু অস্তিত্বের সাতলক্ষ জ্বালা

উনুনের পাশে যার ঘাম থেকে ঝরে পড়ে নুন
শ্মশান কাষ্ঠের মতো যার শুধু জ্বলন্ত জীবন
তারাও কি আলিঙ্গন চায়, ভূমিশয্যা, বসন্ত বিহার
দু'দিক জ্বালানো মোম খল খল শব্দে
হেসে ওঠে।

আরও গভীরে

ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকার নিয়ে খেলা করতে করতে
একদিন ভালো মতন অন্ধকার এসে বললো,
এসো, এবার জমিয়ে খেলা হোক!

তারপর শুরু হলো চিঠি ছেঁড়ার মহোৎসব
শূন্য বাক্স-প্যাঁটরায় ফুঁ দিয়ে যে কত ধুলো উড়লো
আঃ, এমন নিরাভরণ হইনি কখনো, নদীর মতন
নদীর গভীরে, আরও গভীরে

এক হীরকোজ্জ্বল জীবন যেন মৎস্যকন্যা হয়ে
হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে...

আশ্চর্য নদী

আসুন, এই নদীর ধারে আমরা সবাই বসবো একসঙ্গে

এখানে নেই কালো-সাদা টেলিফোন, তার বদলে
সূর্যমুখী ও চন্দ্রমল্লিকা
দেহরক্ষীদের রেখেছি কিছুটা দূরে জঙ্গলের আড়ালে
লাল কার্পেটের বদলে এখানে সবুজ ঘাস
পা ডুবে যাবার মতো নরম
ছোট ছোট বোতামের মতন ছড়িয়ে আছে বাস ফুল

তোরা এই পৃথিবীর অপ্রয়োজনীয় লাবণ্য
জুতো-মোজা খুলে আসুন,
পায়ে লাগুক রাত্রির শিশিরবিন্দু
ব্যক্তিগত সচিব ও ভাষণ-লেখকদের সঙ্গে আনবার দরকার নেই আজ
কিন্তু সহধর্মিণীরা থাকুন পাশে পাশে
আঙুলে-আঙুলে ছুঁইয়ে
আজকের আকাশ মেঘলা কিন্তু সুপবন খেলা করবে চুলে
এই নদী, অনাদিকালের অনাবিষ্কৃত নদী
কুলুকুলু সুরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে
বসুন, একেবারে জলের ধার ঘেঁষে, এক্ষুনি সব শুরু হবে।
কে কে আসেন নি এখনো?
একটু অপেক্ষা করা যাক
এ তো গোল টেবিল কিংবা শীর্ষবৈঠক নয়
এখানে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে না,
কোনো পূর্ব শর্তও নেই
শুধু কাছাকাছি কিছুক্ষণ বসা, জলের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা
অনন্ত ব্যস্ততা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া
কয়েক পলক ছুটি
যেন স্বপ্নের মধ্যে নিঃসঙ্গতার আহ্বান
আসছেন, আসছেন, সকলেই আসছেন একে একে
সদ্য ঘুম ভাঙার মতন বিস্ময় কারুর চোখে মুখে
কেউ কেউ দর্প এখনো মুছে ফেলতে পারেন নি
কারুর বা ওষ্ঠে অতি বিনয়ের মিথ্যে হাস্য
তাতে কোনো ক্ষতি নেই
কে না জানে, প্রত্যেকের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে স্ববিরোধ!
সমস্ত দুনিয়াব্যাপী অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার আজ
সামান্য বিরতি
কামান ও বিমান, বন্দুক ও কন্দুক সাময়িক ভাবে স্তব্ধ
পাতালের গুম গুম ও শূন্যবিহারী ধ্বংস দূতেরা
এক সকাল থেমে থাকবে
আঁকাবাঁকা সীমান্তগুলিতে সংবরণের অনুরোধ জানানো হয়েছে
মৃত্যু-ব্যবসায়ীরা মুখ ফেরাবে দেয়ালের দিকে, সময় শুনবে...

হে সমাগত রাজন্যবর্গ, এটা কুরুক্ষেত্র নয়
আপনাদের সম্বর্ধনার জন্য গান-শ্যালিউটের ব্যবস্থা করা হয় নি
শুনুন দোয়েল পাখির ডাক

নিঃশব্দে উড়ে গেল এক ঝাঁক ধপধপে বক
এর মধ্যেও একটা সঙ্গীত আছে
কাকচক্ষু এই ভরা নদীর দুকূল ছাপানো জল
স্নেহের মতন স্বচ্ছ, ভালোবাসার মতন গভীর
একটু ঝুঁকে তাকিয়ে দেখুন, এ এক মায়াদর্পণ
এখানে নিজের মুখ দেখা যায় না, অথচ ফুটে উঠছে মুখ
সবকটিই শিশু, টলটলে চোখ, ঝকঝকে হাসি,
মাথা ভর্তি চুল
চিনতে পারছেন না?
যারা শুধু আদেশ দেয়, তারা নিজেদের বাল্যকাল ভুলে যায়
পৃথিবীকে প্রথম দেখার স্মৃতি যারা মনে রাখে না
তারাই ভাঙতে চায় পৃথিবীকে
সেইসব মুখগুলি কি একেবারেই হারিয়ে যায়!

সবাই হাত তুলে বললেন, চিনেছি, চিনেছি, এ তো আমারই
বাচ্চা বয়েসের ফটোগ্রাফ
জলের মধ্যে দুলছে
এ অতি সামান্য ম্যাজিক!
না, ঠিক হয়নি, ভালো করে দেখুন আর একবার
আপনারাও বাল্যকালে সরল ও নিষ্পাপ ছিলেন
তা অস্বীকার করছি না
তবু এই সুন্দর, পবিত্র মুখগুলি কি হুবহু ব্যক্তিগত অতীতের
কোথাও একটুও অমিল চোখে পড়ছে না?
শুধু চোখ দিয়ে নয়, মনটাকে কপালের মাঝখানে এনে দেখুন
খুব কাছাকাছি, তবু অন্য রকম
ভুরুর ভঙ্গি, ওষ্ঠের রেখা, চিবুকের ডৌল
ছবি বদল হয়নি, কোথাও পুরোনো রং নেই
এইসব মুখের ছবি তোলার মতন আজও
আবিষ্কৃত হয়নি কোনো ক্যামেরা
অনাদিকালের এই নদীই শুধু এদের দেখাতে পারে
এরা অনাগতকালের
আপনাদেরই ভবিষ্যৎ প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীরা হাসিমুখে চেয়ে আছে
ঐ চোখগুলির দিকে তাকিয়ে একবার শুধু ভাবুন
এদের জন্য কী রকম পৃথিবী রেখে যাবেন আপনারা?

রাশিয়ান রুলেৎ

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ ফিরতেই দেখি সে নেই
তার শরীরের ঘ্রাণ, নিশ্বাস তরঙ্গ—এখনো যেন মিলিয়ে যায়নি
তার পায়ের আওয়াজের রেশ, শেষ কথাটি অসমাপ্ত ব্যঞ্জনা
কাঁপছে বাতাসে।

এরকম আচমকা চলে যাওয়ার কোন মানে হয়?
কথা ছিল
আমরা কয়েকজন বন্ধু খুব নিরালা নদীর প্রান্তে কাছাকাছি বসে
হাসতে হাসতে খেলে নেবো রাশিয়ান রুলেৎ
বিদায় শব্দটি কেউ উচ্চারণ করবে না।
হালকা কুয়াশায় ঢাকা নিসর্গ ও দশদিক সাক্ষী থাকবে
ছুটে আসবে ভ্রমণসঙ্গীরা, নর্ম সহচরীদের মতো উড়বে প্রজাপতি...

কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙ্গে, নদীতে পৌঁছনোর খানিকটা আগেই
এমন এক অচেনা শূন্যতা এসে দাঁড়ালো পিছনে, আর কেউ নেই
দূরে একটা বারুদ শব্দ, একটি পাখির ডানা ঝাপটানি
কেউ একজন আমায় খেলায় নিল না।

দেখা হলো না

পথটা যেখানে সমতল ছেড়ে পাহাড়ে উঠেছে
সেখানে একটা ঝুমঝুমির মতন এলাচ রঙের
ভাঙা বাড়ি
শুধু একটি মাত্র ঝুলন্ত অলিন্দে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে
উড়ন্ত পরীর মতো এক মূর্তি
পাথর না নারী, পাথর না নারী?

দেখা হলো না, ছুটন্ত ট্রেন ভূমিকম্পের মতো শব্দ নিয়ে
ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে
পাথর না নারী? পাথর না নারী? দেখা হলো না
বাল্য প্রেমিকার দীর্ঘশ্বাসের মতন অন্ধকার বাতাস
দেয়ালে ফোঁটা ফোঁটা জল...

সমুদ্রের এপারে ওপারে

আকাশে এত নান্দনিক আলো, আজ কি চাঁদের জন্মদিন?
দরজা খোলো
জানলা খোলো
দু'হাত তুলে দিক্-বধূদের ডাকো
গুমোট ভেঙে বান এসেছে,
চন্দনের গন্ধবহ বাতাস
সব কলরব থামিয়ে দিল কোন্ মন্ত্র, কোন্ মায়াবী স্বর
ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনি, ভার্জিল না কালিদাসের শোক!

সমুদ্রের এপারে আর ওপারে আজ
হাত বাড়ানো সেতু
হাসতে হাসতে ঘরে ফিরছে দুই বন্ধু, পরমাণু ও মানুষ
বসন্তের বার্তা এলো:
বসুন্ধরা মুক্ত রক্ত লেখা
একলা তুই বসে আছিস এখনও মুখ ঝুলকালিতে মাখা?
বিষাদ-ক্রোধ-হতাশা গুলে পদ্য লিখিস
লজ্জা নেই তোর?

আকাশে এত নান্দনিক আলো, আজ কি চাঁদের জন্মদিন?

রাজসভায় মাধবী

(একটি সংলাপ কাব্য)

[গৌড়বঙ্গের অধীশ্বর লক্ষ্মণসেন দেবের রাজসভা। রাজার দু'পাশে বসে আছে কয়েকজন মন্ত্রী ও কবি। এঁদের মধ্যে আছেন রাজার বাল্যসুহৃদ ও প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র, প্রবীণ মন্ত্রী উমাপতিধর, রাজগুরু গোবর্ধন আচার্য এবং তিন সভাকবি: জয়দেব, শরণ ও ধোয়ী। রাজকার্যের বদলে এখন সভায় কাব্যচর্চা চলেছে।]

লক্ষ্মণসেন : ভ্রমর, ভ্রমর! কেন মনে হয় মানুষের চেয়ে
ভ্রমরেরা বেশি সুখী! বসন্ত পবনে যত কাব্যের ভ্রমর
আপনারা ভাসিয়ে দেন তারা সব আনন্দের মণি,
অতৃপ্ত মানুষ তবে ভ্রমরের নামে দেয় প্রাণের উপমা

ধোয়ী : অতৃপ্ত মানুষ! এই সাগর মেখলা পুণ্যভূমি—

বীরশ্রেষ্ঠ, প্রজাপূজ্য, দানশৌণ্ড রাজা যার অধীশ্বর
সে রাজ্যে তো অসুখী বা অতৃপ্ত মানুষ কেউ নেই!

শরণ — একটি ভ্রূক্ষেপে আপনি জয় করেছেন গৌড়লক্ষ্মী, আর
নিতান্ত খেলার ছলে বিজিত কলিঙ্গদেশ, শুধু
অঙ্গুলি হেলনে ক্লিষ্ট চেদীরাজ, কাশী ও মগধ
আপনার পদসেবী, অভিমান-হৃত কামরূপ
নিদাঘ সূর্যের মতো আপনার তেজে দগ্ধ অবাধ্য, দুর্জন
মহারাজ, আপনার মুখে কেন অতৃপ্তির কথা?

জয়দেব : অতৃপ্তি তো রাজরোগ। এরই জন্য পররাজ্য জয়
স্বয়ং কেলিনায়ক যিনি, তাঁরও কণ্ঠে শোনা যায় রতি
হাহাকার
যে-রাজা জঙ্গমহরি, তিনিও কি নন আরও যশের
ভিখারি
যিনি যাচকের কল্পদ্রুম, হায় নিজের যাচ্ঞা কি তাঁর
কখনো মিটেছে?

[বাইরে কিসের যেন কোলাহল। রাজা স্থির নেত্রে দ্বারের দিকে তাকালেন। হলায়ুধ মিশ্র হাঁক দিয়ে বললেন, দৌবারিক, দেখো তো!]

ধোয়ী : এই স্নিগ্ধ গঙ্গাদেশ, অসংখ্য কুসুম সুবাসিত
মধুলোভী অলিকুল পারিজাত বন ছেড়ে মেঘ হয়ে
আসে
ভূভারতে এরকম শান্তিময় দেশ আর দ্বিতীয় নেই

লক্ষ্মণসেন : আবার ভ্রমর! কবিবর, উপমায়, অলঙ্কারে
এই পতঙ্গটি নিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে যেন!

দৌবারিক : রাজসন্দর্শন চায় এক গুচ্ছ নারী ও পুরুষ
মনে হয় তারা ক্ষুব্ধ...

ধোয়ী : ক্ষুব্ধ? এই শব্দটি কি সঠিক হলো হে, দৌবারিক?
তারা প্রার্থী হতে পারে, এই রাজ্যে ক্ষুব্ধ কেউ নয়

হলায়ুধ মিশ্র : আসুক দু'জন প্রতিনিধি, যুগ্ম নারী ও পুরুষ
অন্যেরা দূরত্বে থাক...

[সভাস্থলে মাধবী ও কঙ্কের প্রবেশ। মাধবী আলুলায়িত কুন্তলা, স্ফুরিতধরা, একবস্ত্রা। তার চক্ষুদুটি কিছুক্ষণ আগে অশ্রুধৌত হবার কারণে এখন অত্যুজ্জ্বল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা এই সদ্য যুবতীটি বিবাহিতা। সঙ্গের লোকটি তার ভাই, সে রক্তাম্বর পরিহিত। পুরুষটি রাজা ও অন্যদের অভিবাদন জানালো, নারীটি রইলো অধোবদনে।]

হলায়ুধ মিশ্র : যা কিছু বলার আছে, সংক্ষেপে বলো

কঙ্ক সসম্মান পুরঃসর নিবেদন এই, মহারাজ,
দক্ষিণ নগরবাসী সার্থবাহ সম্প্রদায় প্রতিভূ আমরা
এসেছি নিতান্ত বাধ্য হয়ে সুবিচার প্রত্যাশায়
আপনার গুণ গান মনস্বী ও নিঃস্বগণ সমস্বরে গায়
আপনার বাক্য যেন স্বর্ণসম সুদৃঢ়, সুন্দর
ন্যায় ও অন্যায় আছে তুলাদণ্ডে, হে দীনপালক...

রাজা : সুবিচার? কিসের বিচার?

কঙ্ক : বিদ্যুল্লেখার মতো নিষ্কলঙ্ক, তেজস্বিনী, এই যে বালিকা
আমারই সহোদরা, এর দুর্ভাগ্যের কথা কী করে যে
বলি
ঐ যে সুপ্রাচীন মহামন্ত্রী, তিনি তো জানেন সব

[কঙ্ক রাজসভার এক প্রান্তে উপবিষ্ট প্রবীণ মন্ত্রী উমাপতিধরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো।]

রাজা : জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ উমাপতি, আপনি কি চেনেন এঁদের?

উমাপতি : বিলক্ষণ চিনি, মহারাজ, জলপ্রপাত তাড়িত
অরণ্য প্রাণীর মতো এরা এসেছিল একদিন
অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনায়

রাজা : আপনার কাছে এসেছিল? তবে সেই তো যথেষ্ট
আপনি কি দেননি বিধান?

উমাপতি : দিইনি, পারিনি দিতে। এমনও ঘটনা কিছু ঘটে
বিচারকও বিচারপ্রার্থীর মতো অসহায় হয়

রাজা : ঠিক বোধগম্য যেন হলো না কথাটা। দোষী অথবা
নির্দোষ
বেছে নিতে ভুল হয় আপনার মতো এত প্রাজ্ঞ
মানুষেরও?

উমাপতি : ভুল নয়, মহারাজ, দ্বিধা

রাজা : দ্বিধা?

শরণ : আহা, বিচারপ্রার্থীরা যদি সশরীরে উপস্থিত
ওদের স্বমুখে তবে শোনা যাক সমুদয় কাহিনী বর্ণন

ধোয়ী : ঠিক ঠিক

রাজা : তোমরা নির্ভয়ে বলো, কী বিচার চাও

কঙ্ক : মহারাজ, ভগিনীর দুর্ভাগ্যের কথা এত সজ্জন সমীপে
বর্ণনা করার মতো শব্দশাস্ত্রজ্ঞান নেই, যদিও আমার...
যদিও আমার...
বক্ষ ফেটে যেন এক নাগরূপী মহাক্ষোভ মুক্তি পেতে

চায়

রাজা : শান্ত হও

হলায়ুধ মিশ্র : শান্ত হও, নাগরিক, সুস্থির নিশ্বাস নাও আগে

গোবর্ধন আচার্য : বরং প্রতিবাদিনী নিজেই বলুক তার কথা

শরণ : ঠিক ঠিক

ধোয়ী : এই রমণীরই মুখে শোনা যাক কী তার কাহিনী

[মাধবী ধীরে মুখ তুলে তাকালো, কিন্তু তার মুখে কোনো কথা ফুটল না।]

রাজা শুভমস্তু, হে কল্যাণী,
কী জন্য এসেছো, বলো, অসঙ্কোচে বলো।

ধোয়ী : রাজার প্রসন্নদৃষ্টি ধন্যা তুমি, বলো

জয়দেব : দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ম

শরণ : উপস্থিত সভাসদ সবাই উদ্‌গ্রীব

গোবর্ধন আচার্য : কে তুমি, রমণী, অগ্রে পরিচয় দাও

মাধবী : হে রাজন, সমুদয় গুণিজন, আমি এক বণিক দুহিতা
সিংহেন্দ্রদত্তের কন্যা, পুস্তপাল অচ্যুতভদ্রের পুত্রবধূ
প্রবাসে আছেন স্বামী দীর্ঘকাল

গোবর্ধন আচার্য : অচ্যুতভদ্রের পুত্র? বসুশিব? সে তো বহুদিন
নিরুদ্দেশ

মাধবী নিরুদ্দিষ্ট নন, তাঁর সপ্তডিঙা ফেরেনি এখনো
অজ্ঞাত সন্ধানী তিনি দূরতর দ্বীপে ভ্রাম্যমাণ
নতুন বাণিজ্য বস্তু নিয়ে ফিরবেন

রাজা : স্বামী নিরুদ্দেশে, এই নবীন বয়সে তুমি একা

কঙ্ক : না, না, মহারাজ, একা নয়, পিত্রালয়ে
এবং শ্বশুর কুলে অনেক আত্মীয়বন্ধু আছে
আমাদের ভগিনীটি বড় আদরের

ধোয়ী তোমার ভগ্নীকে নিজ মুখে বলতে দাও

রাজা তুমি চাও, রাজসৈন্য, রণতরী ছুটে যাক তোমার
স্বামীর কুশল সন্ধানে?

মাধবী সেজন্য আসিনি, মহারাজ
আমি ঠিকই জানি তিনি ফিরবেন, কথা দেওয়া
আছে।

রাজা : তবে?

মাধবী : রমণীর অধিকার আছে কি না সসম্মানে জীবন যাপনে
এসেছি সে কথা জানতে। এই রাজ্যে নারীর মর্যাদা
যদি কেউ কেড়ে নেয়, সেই পাবে রাজ অনুগ্রহ?

রাজা অলীক, অদ্ভুত প্রশ্ন। সনাতন ধর্ম অনুসারে
এ রাজ্য শাসন হয়, যদি কেউ অপর নারীকে
লোলুপ দৃষ্টিতে দেখে, তপ্ত তৈলে তার দুই চোখ
চির অন্ধকার হবে, এরকমই রয়েছে বিধান।

মাধবী লোলুপ দৃষ্টিতে শুধু নয়, মহারাজ, এক প্রবল পুরুষ
প্রতিদিন নখ আর দন্ত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে চায়
আমার সম্ভ্রম

রাজা : সে কি! কে সে নরাধম? এই রাজ্যে কে আছে এমন

ধোয়ী : এ যে অসম্ভব

উমাপতি : নাম বলো, হে মাধবী, স্পষ্টাক্ষরে, মুক্ত কণ্ঠে বলো

মাধবী : মহারাজ...

রাজা : বলো সে পাপীর নাম, পূর্বাহ্নেই অভয় দিয়েছি

মাধবী : প্রোষিতভর্তৃকা আমি, মহারাজ, তবু নই নিঃস্ব অসহায়
ভাই বন্ধু পরিজন, আছে আরও বহুতর স্নেহের
আড়াল
কাব্য-সঙ্গীতের সুধা ভরে রাখে নিজস্ব সময়
কখনো আকাশ দেখি, দূর বনানীর রেখা চক্ষু টেনে
নেয়
এই সব নিয়ে বেশ সুখে থাকা
একা একা গড়ে তোলা নিজস্ব ভুবন
একি কোনো অপরাধ?
রমণীর একাকিত্বে সুখ ভোগে নেই অধিকার?

উমাপতি যে তোমার নিজস্ব ভুবনখানি মত্তহস্তীসম
বারবার দলে দিয়ে যায় তার পরিচয় দাও

মাধবী নদীতে অবগাহনে সুখ ছিল, এক দর্পী পুরুষের হাত
কেড়েছে নদীর পথ, নদীও আমার দুঃখ জানে
অলিন্দে দিগন্ত রেখা...সেখানেও মূর্তিমান বাধা
আমার সঙ্গীত সাধা প্রতিদিন ভাঙে এক লোভীর
চিৎকারে
এমন কি রাজপথে প্রকাশ্য দিনের মধ্যে বাহু চেপে
ধরে
ক্ষমতান্ধ এক যুবা আমাকে আঁধার দিকে নিয়ে যেতে
চায়

রাজা কে সে নরাধম? তার আয়ু আমি কেড়ে নেবো এক
লহমায়
নাম বলো

মাধবী সকলেরই পরিচিত সেই নাম, শ্রীমান কুমারদত্ত,
তিনি...

রাজা শ্রীমান কুমারদত্ত! অর্থাৎ...অর্থাৎ...

উমাপতি আপনার নিজের শ্যালক, মহারানী বল্লভার প্রিয় ভ্রাতা
সুতরাং মহারাজ, এবার বুঝবেন, আমি সব কিছু জেনে
জনতার সাক্ষ্য নিয়ে, তবু কেন বিচারে হয়েছি অপারগ

রাজা এ যে অবিশ্বাস্য! এ যে নিতান্ত সুদূরতম স্বপ্নেরও
অতীত
বীরশ্রেষ্ঠ, ন্যায়শীল, ধীমান কুমারদত্ত এরকম পাপী?
না না, মন্ত্রী উমাপতি, অবশ্যই কিছু ভ্রান্তি ঘটেছে
কোথাও
কিছুতে কুমার নন, অন্য কেউ, অবয়বে কুমার সদৃশ!

উমাপতি অন্তত পঞ্চাশজন স্বচক্ষে দেখেছে, তারা কুমারকে
চেনে

কঙ্ক : যদি অন্য কেউ হতো, অন্য কোনো কুলাঙ্গার, তবে
নিজ হাতে
এক খড়্গাঘাতে তার মুণ্ড ছিন্ন করে এনে
দিতাম চরণে, মহারাজ

হলায়ুধ মিশ্র : প্রসীদ, প্রসীদ! ওহে সার্থবাহ, বিস্মৃত হয়ো না
রাজার সম্মুখে তুমি কথা বলছো

কঙ্ক : সদ্যোজাত সারণীর মতন পবিত্র এই ভগিনী আমার
সে জানে না কপটতা, অনৃত ভাষণ

জয়দেব হে কমলাননা নারী, হে বরবর্ণিনী, আরও মন খুলে
বলো
তোমার বাক্যের রঙে দীপ্ত এই রাজসভা, এ যেন
সাগরে
দিগন্ত মায়ার আলো, সহসা মরুতে নীপবন
হে সুন্দরী বলো দেখি, কাব্যপ্রিয়, ধীমান, কুমার
সে কি শুধু তস্কর, দস্যুর মতো লোভী?
প্রণয় রহস্য বড় গূঢ়, তার মর্ম শুধু দু'জনায় বোঝে
তোমার মুখের জ্যোৎস্না, ওষ্ঠের অমিয় দেখে
মুনিঋষিরাও
বিচলিত হতে পারে, কুমার তো সামান্য মানুষ!

শরণ : কুমার কি কামবশে তোমার শরীর স্পর্শ করেছে?
অথবা
রচেছে বন্দনা, স্তুতি? সে তো কিছু দোষণীয় নয়

ধোয়ী যেন সশরীর রতিপতি, সুপুরুষ বহু ললনার প্রিয়
ধীমান কুমারদত্ত প্রণয় কলায় সুনিপুণ, তার প্রতি
তোমার এমন ক্রোধ স্বাভাবিক নয়। তবে, সুন্দরী,
তুমি কি
পূর্ব কোনো প্রতিশ্রুত স্মরণ-বেদনা নিয়ে এসেছো
এখানে?

উমাপতি : বাঃ বাঃ চমৎকার? অতি চমৎকার, হে মহান
রাজকবিগণ
সম্মুখে রয়েছে এক কাতর হরিণী, এক দুঃখদগ্ধ নারী
অপমান বিষে যার সর্বাঙ্গে বিষম জ্বালা, পাণ্ডুর কপোল
তার হৃদয়ের হাহাকারে বুঝি কবিদের করুণা জাগে
না?
আপনারা শুনতে চান রসালো প্রণয় গল্প, অথবা নতুন
রচনার
বিন্দু বিন্দু উপাদান খুঁটে খুঁটে নিতে চান বুঝি?

জয়দেব : (স্বগত) আগে রূপ, শরীরের রহস্য কাহিনী, পরে মর্মের
সন্ধান
প্রথমেই মন নিয়ে টানাটানি যে করে সে মূর্খ, কবি
নয়!

রাজা : কে সঠিক অনাচারী, পুনরায় ভেবে বলো নারী
শাস্তির যে যোগ্য তার কিছুতে নিস্তার নেই এই
গৌড়ভূমে

মাধবী : যদি মিথ্যা বলে থাকি...
জিহ্বা যেন শতখণ্ড হয়ে খসে পড়ে
যদি মিথ্যা বলে থাকি...
বাক্ হোক রুদ্ধ, চক্ষে নিবে যাক জ্যোতি
যদি মিথ্যা বলে থাকি...
জননীও ভুলে যাবে এ কন্যার কথা
মহারাজ, শুধুমাত্র রাজ অনুগ্রহ বলে বলী যে পুরুষ
নারীকে লুণ্ঠনযোগ্য মনে করে, সে রয়েছে এ
রাজপ্রাসাদে
দুঃশীল কুমারদত্ত, আর কেউ নয়!

উমাপতি : মহারাজ, দীপ্তিময় এ নারীর প্রতিটি অক্ষর সত্য

[হঠাৎ সভাস্থলে পাটরানী বল্লভার দ্রুত প্রবেশ]

বল্লভা : মিথ্যা! মিথ্যা! এইসব কথা

মিথ্যার কুটিল জাল...

রাজা — এ কী, মহারানী!
এই রাজসভা মধ্যে...না, না, ফিরে যাও
সামান্য এ রাজকার্য দ্রুত সেরে আমি যাবো তোমার সন্নিধে

বল্লভা — সামান্য এ রাজকার্য? চেড়ীর বর্ণনা শুনে এসেছি এখানে
আপনি সরলমতি, ক্ষমাশীল, সে সুযোগে ষড়যন্ত্রীগণ সর্বনাশ করে দিত আমার আড়ালে!

রাজা : না না, সেরকম কিছু নয়। এ তো দৈনন্দিন বিচারের সভা
কিসের বা ষড়যন্ত্র? মান্যগণ্য সভাসদ আছেন এখানে

বল্লভা : আপনি নীরব হয়ে শুনুন আমার কথা, আমি সব জানি
মহাষড়যন্ত্রী ঐ যে উমাপতিধর মন্ত্রী, আর এ কুলটা এই দুই কালসর্প...

উমাপতি : আমি ষড়যন্ত্রী? মহারাজ, আচম্বিতে সভাস্থলে এরকম পরিহাসও রুচিযোগ্য নয়।

বল্লভা : সাধু সাজছেন! ভেবেছেন বুঝি পূর্বকথা কিছু মনে নেই?
আপনি প্রাচীন ঘুঘু, স্বর্গবাসী মহামতি বল্লাল সেনের আমল থেকেই জানা গেছে আপনার মতি গতি, সে সময়
ছিলেন আমার স্বামী যুবরাজ, দিবানিশি রাজার সম্মুখে করেননি যুবরাজ-নিন্দা, তাঁকে সিংহাসন বঞ্চিত করার দেননি কি কুমন্ত্রণা?

উমাপতি : আরে ছি ছি, সব ভুল জেনেছেন, বিপরীত জেনেছেন, রানী,
সে সময় বর্তমান মহারাজ যৌবন চাপল্যে কিছুদিন ছিলেন বিপথগামী, শস্ত্রে কিংবা শাস্ত্রে ছিল অনাসক্তি ঘোর
যে-কারণে দুরন্ত অশ্বের মুখে বল্গা টেনে এঁটে দিতে হয়
সে জন্যই ওঁর সংযমের জন্য উপদেশ দিয়েছি পিতাকে
সিংহাসন অন্যে পাবে, এরকম কথা আমি কদাচ ভাবিনি!

বল্লভা তখন ভাবেননি, তবে আজ ভাবছেন, তাই এই রমণীকে
কল্পিত কাহিনী দিয়ে, আবেগে সাজিয়ে এনেছেন সভাস্থলে

উমাপতি এ নারীর স্পষ্ট এক অভিযোগ আছে

বল্লভা কুচক্রে বপন করা, স্বার্থলোভী শয়তানের মস্তিষ্ক প্রসূত সে সব রটনা

উমাপতি শত শত নাগরিক সাক্ষ্য দেবে!

বল্লভা প্রজা-বিদ্রোহের হীন, কুটিল চক্রান্ত! সব জানা হয়ে গেছে
এ জগতে অর্থবশ কে নয়? অর্থের লোভে মিথ্যা সাক্ষী কত!
আর এই পাপীয়সী, রঙ্গময়ী বারনারী, সর্বাঙ্গে নরক
মিথ্যা হাসি কান্না যার নিত্যসঙ্গী, মিথ্যা অঙ্গভঙ্গি অস্ত্র যার
তার কথা শুনে কেউ বিচলিত হয় যদি

কঙ্ক : সাবধান! সাবিত্রীর মতো পুণ্যশীলা
সীতাসমা সাধ্বী এই ভগিনী আমার
তার নামে যদি কেউ অপবাদ দেয়, তবে তিনি যেই হোন, আমি তাঁকে

হলায়ুধ : মূঢ়, দূরে সরে যাও, রাজেন্দ্রাণী কথা বলছেন

রাজা : রানী, এইখানে এসে বসো, অপর পক্ষের কথা কিছু শুনি

বল্লভা : পরন্তপ, এই সব কটূকথা শোনাও বিষম ভুল, পাপ
এই দেহ পসারিনী কী কথা জানাতে চায় তাও আমি জানি

মাধবী : সামান্য বণিকবধূ আমি, মহারানী, অতি গুণবান স্বামী পেয়েছি অনেক ভাগ্যে...

বল্লভা চুপ চুপ! শুধু কি বণিকবধূ, বারাঙ্গনা, বারবধূ তুই

মাধবী আমার স্বামীর মতো এ জীবনে আর অন্য পুরুষ দেখিনি

বল্লভা তোর নষ্ট স্বভাবের জন্য তোর স্বামী দুঃখে নিরুদ্দেশে গেছে
পুরুষ-শিকারি তুই, ভেবেছিস ফাঁদ পেতে, ছলাকলা দিয়ে
আমার ভাইকে পাবি? তবে শোন, শত শত অনূঢ়া রূপসী

কুমারদত্তের শুধু ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ব্যগ্র হয়ে আছে
তুই কে রে, পদনখধূলি!

মাধবী — আপনি যা বললেন, তাতে কোনো সত্য নেই

বল্লভা — সত্য, সত্য, আমি যা বলেছি তা-ই ধ্রুব সত্য, এই শেষ কথা

মাধবী — শুধু বুঝি রানীদেরই সত্যে আছে পূর্ণ অধিকার?

বল্লভা — কাম-পূতি গন্ধ-মাখা, বন্দর-উচ্ছিষ্ট ভোজী, দূর হ! দূর হ!

রাজা — হুঁ, এবার বোঝা গেল। ছলাকলা পটীয়সী এই ধুরন্ধরী
কুমারদত্তের নামে কলঙ্ক লেপন করে আমারই সুনাম
নষ্ট করতে চেয়েছিল, শাস্তি এরই প্রাপ্য। তবু এবারের
মতো
ক্ষমা করা গেল!
যাও নারী, গৃহে যাও, সুসংবৃত হও!

গোবর্ধন আচার্য : কেমন বিচার হলো? সাক্ষ্য প্রমাণাদি কিছু দেখাই
হলো না

হলায়ুধ মিশ্র : চুপ! রাজারানী কথা বলছেন, অন্য কারো অধিকার
নেই

মাধবী : মহারানী, আমার প্রণম্যা আপনি, শুধু এই জিজ্ঞাসা
আমার
নারী হয়ে নারীত্বকে ধুলোয় লুটোতে দেখে কখনো
আপনার
হয় না একটুও খেদ?
নারী নির্যাতনে যদি নারীর ভূমিকা এত নির্মম, নির্দয়
হয়, তবে প্রতিকার চেয়ে আর কার কাছে যাবো?
ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ আপনি, তবু তো আমারই মতো
আপনিও নারী

বল্লভা : ফের তোর ছোট মুখে বড় কথা? দূর হ! দূর হ!

মাধবী : যাবো, তবে তার আগে আরও একটি সরল প্রশ্নের
সদুত্তর পেতে চাই, যে-দেশের রাজকন্যা ছিলেন
একদা
সে দেশে কি বহু বল্লভার ছড়াছড়ি? সে দেশের
রমণীরা
পুরুষের সামান্য ইঙ্গিত পেলে শরীরের সব খুলে
দেয়?
পরস্ত্রী-বারস্ত্রী কোনো ভেদ নেই, সেই দেশে নারী ও

পুরুষ
সকলেই স্বেচ্ছাচারী? আপনিও কি যেথা সেথা শয্যা পেতেছেন
পুরুষের অহঙ্কার তুষ্ট করবার অভিলাষে?

বল্লভা : ওরে পিশাচিনী, তোর এত স্পর্ধা? তবে এই মুহূর্তেই শমন সদনে যাবি তুই

[বল্লভা মাধবীর চুলের গুচ্ছ মুঠিতে ধরে তাকে মাটিতে ফেলে পদাঘাত করতে লাগলো। ক্রুদ্ধ কঙ্ককে সরিয়ে নিয়ে গেল প্রহরীরা। গোবর্ধন আচার্য একটি খন্তা তুলে মারতে গেলেন মহারানীকে, তাঁকে বাধা দিল হলায়ুধ মিশ্র। অন্যান্য সভাকবিরা নির্বাক। রাজার চিবুক তাঁর বুকে ঠেকেছে।]

মাধবী : মারো, আরো মারো, দেখি তুমি হিংস্রতায় কত দূর যেতে পারো

বল্লভা : আজ তোর শেষ! যদি ইষ্টনাম কিছু থাকে সেই জপ কর
চেড়ী, চেড়ী
অগ্নি নিয়ে আয় এই বেশ্যাটাকে জীয়ন্তে পোড়াবো

মাধবী : যদি না পোড়াও
আমি প্রায়োপবেশনে প্রাণ বিসর্জন দেবো
এই রাজসভা আজ কিছুতে যাবো না ছেড়ে, যদি না সম্মান ফিরে পাই
এই রাজসভা আজ মৃত্যু গন্ধে ধন্য হয়ে যাবে
যে শরীরে পুরুষের লোভ সেই রক্ত মাংস
পোকা পতঙ্গের খাদ্য হবে
যে সমাজ রমণীর দেহটাই চেনে শুধু, হৃদয় চেনে না
সেখানে বাঁচতেও ঘৃণা হয়! আমি এতকাল ভেবেছি
আমার কত কিছু আছে, এই আকাশের নীল আলো, নদীর সঙ্গীত
বৃষ্টিস্নাত দিনের সুষমা, অসীম নক্ষত্রলোক, বৃক্ষছায়া...
হঠাৎ বুঝেছি আজ পুরুষের কাম-প্রেম-আদেশ বা স্তুতি
এর চেয়ে আর কিছু প্রাপ্য নেই নারীর জীবনে!

বল্লভা : প্রতিহারী!
এই প্রগল্‌ভাকে নিয়ে যাও, দূরে নগর প্রান্তের পরিখায় ছুঁড়ে ফেলে দাও

মাধবী : পরিখায় কেন, পয়ঃপ্রণালীর গর্ভে কিংবা অতল

সাগরে
মৃত্যু যেখানেই হোক, মৃত্যু শুধু মৃত্যু, তার অন্য রূপ নেই
শুনে রাখো শেষ কথা
যে-দেশে নারীরা শুধু খাদ্য আর ভোগ্য, পুরুষের ইচ্ছাদাসী
সে দেশে বাঁচার কোনো সাধ নেই, এই রাজ্য-রাজধানী যাবে
কালগ্রাসে
যে রাজত্বে জননী ও জায়া ভগ্নী, স্বাধীনা নারীর নেই স্থান
সেই রাজা কোনো দিন প্রতিষ্ঠা পাবে না, তার শিরে বজ্রপাত হবে!

গোবর্ধন আচার্য : ছেড়ে দাও, হলায়ুধ, যদি আর এক দণ্ড থাকি এ পাপ পুরীতে
নিঃশ্বাসের বিষে মরবো, ভ্রাতঃ, ছেড়ে দাও

হলায়ুধ মিশ্র : যাও, নগরীর বাইরে চলে যাও

[এই সময় কুমারদত্তের প্রবেশ। ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে সে মাধবীর নাম ধরে ডেকে উঠলো]

কুমারদত্ত : মাধবী, মাধবী, কোথা তুমি প্রাণাধিকে

মাধবী : ষোলো কলা পূর্ণ হতে এটুকুই বাকি ছিল, এসো হে কুমার
শরীর চেয়েছো, নাও
সহস্র চোখের সামনে, প্রহরী বেষ্টিত হয়ে, সগৌরবে নাও
তোমার স্পর্শের বিষে সেই মুহূর্তের আগে উড়ে যাবে প্রাণ

কুমারদত্ত শরীর তো নয় শুধু, মাধবী, তোমাকে আমি আরও বেশি কিছু
মনে ভাবি, কল্পনা ঐশ্বর্যময়ী তুমি,
শব্দ-বর্ণ-গন্ধ মেখে সন্ধ্যার নির্জনে
তোমার সঙ্গীত সুধা, তোমার মাধুর্য, সব পেতে চাই

বল্লভা কুমার, এখানে নয়, প্রহরীরা এ দুষ্টাকে শাস্তি দেবে
তুমি চলো বিশ্রামের কক্ষে, হাত ধরো

কুমারদত্ত : এ রমণী রত্নটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবো

বল্লভা : না, না

কুমারদত্ত কেনই বা না না বলছো? নিতে হবে, পেতে হবে,
আমার বাসনা
প্রত্যাখ্যান পছন্দ করে না

বল্লভা : কুমার, আমার সঙ্গে চলো

রাজা : দাঁড়াও! বল্লভা, এ কী বিপরীত রীতি, তুমি ভ্রাতাকে
দেখেই
আমাকে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছো

কুমারদত্ত : দিদি, এই জরদ্‌গবটি আর কতদিন?

বল্লভা : চুপ, ওরে চুপ

রাজা : দৌবারিক, দ্বার রুদ্ধ করো
কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধো এই অপরাধ-কর্মী প্রমত্ত যুবাকে

বল্লভা এ কী কথা, মহারাজ? এ রকম রক্ত চক্ষু, স্বেদময় মুখ
আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক নয়, শান্ত হোন! আমি
উপস্থিত
রয়েছি এখানে, তবু কুমারের অঙ্গ স্পর্শ করার সাহস
কার আছে?
কে এমন দুঃসাহসী...

রাজা : আমি! যদি বাধা আসে, তবে নিজ হাতে তরবার
ধারণ করতেই হবে। এই যুবতীর অভিশাপ বাক্য
শুনে
আতঙ্কে কম্পিত বুক। রানী, তুমি, সত্য বটে প্রেয়সী
আমার
তার চেয়ে প্রিয়তর এই দেশ, এই যুদ্ধ দীর্ণ মাতৃভূমি
কোনো ক্রমে ধরে আছি, সহসা এ নির্যাতিত নারীর
ক্রন্দনে
কেঁপে উঠলো সিংহাসন, মনে হলো পায়ের তলায়
চোরাবালি
চতুর্দিকে হাহাস্বর, আকাশে অশুভ ছায়া, প্রলয়-ইঙ্গিত
শুনি যেন অশ্বধ্বনি, ধেয়ে আসে বুঝি মহাকাল...
ওঠো হে মাধবী, তুমি শুধু নারী নও, তুমি বিশ্বের
মানবী
তুমি মাতা-কন্যা-প্রিয়া, উঠে এসো, দুই চক্ষু থেকে
মুছে ফেল অশ্রু ও অনল
ঐ পাপীর শাস্তি আমি নিজে দেবো, আজ ওর বক্ষের
শোণিতে
তোমার ললাটে আমি এঁকে দেবো জয়ের কুঙ্কুম,

দৌবারিক
ওকে নিয়ে এসো—

মাধবী থাক থাক মহারাজ, রক্তপাতে প্রয়োজন নেই
রক্ত সন্দর্শনে তৃপ্ত হয় যে রমণী, সে কখনো
প্রকৃত মানবী নয়, আমি প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী নই
কুমার তো কেউ নয়, সহস্রের একজন, আমার সমূহ
অভিমান
ছিল আপনার প্রতি, যেখানে বিচার অন্ধ, স্বজন
নির্দোষ
সেই গ্লানি মুক্ত করেছেন, আপনি ধন্য, আর কিছু
প্রার্থনীয় নেই

রাজা তুমি এই পরস্ব লোভীকে ক্ষমা দিতে চাও?

মাধবী ওকে দিন বনবাস। কিছুদিন প্রকৃতির সবুজ সেবায়
অন্তর পবিত্র হোক, মুছে যাক চক্ষের কলুষ
যার এই ধরণীর প্রতি প্রেম নেই, সেই মানুষ কখনো
নারীর প্রেমিক হতে পারে?

উমাপতি : স্বস্তি, স্বস্তি! হৃদয়বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে করুণা
হে মাধবী, তুমি তা জেনেছো

সমবেত স্বর : শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি!

পাগলে পাগলে খেলা

ওরে ও কুসুম বনের সাপ, একটু
আন্‌বাগানে যা

ওরে ও খেয়া নৌকোর মাঝি, এখন
নোঙর ফেলে ঘুমো

আকাশে হঠাৎ উঠলো তুফান, কেউ কি
দেখেছে জাদুদণ্ড

এ সময় বৃষ্টি তুলবে ঢেউ, তবুও
জ্বলবে বড়বানল

এ সময় অরুণে বরুণে যুদ্ধ, যদিও
বাতাসে প্রেমগন্ধ।

ওরে ও বাঁধা রাস্তার পথিক, তোরা কেউ
এদিকে আসিস না
ওরে ও প্রাসাদপুরীর বন্দি, মন দে
দরজার কারুকার্যে
গায়ে মাখ সোনার রুপোর ধুলো, নিয়ে নে
আরও যত চাস ধুলো
এদিকে মরুভূমে ভূমিকম্প, আঁধারে
উন্মূল খনিগর্ভ
এ তুফান তোরা কেউ দেখবি না, এ শুধু
পাগলে পাগলে খেলা।

বকুল, বকুল, কথা বলো

বকুল গাছের নীচে যার জন্য প্রতীক্ষায়, এক পায়ে দাঁড়ানো এতক্ষণ
সে এলো না
এ রকম প্রায়ই সে আসে না, তার না-আসা মানায়
বকুল গাছটি তো ছিল ব্যগ্র চোখে, ছুঁতে চেয়েছিল হাত
দেখা হলো না তাকেও।

এরকম হয়, নদী দেখতে যাওয়া হলো, নদী নেই
শুয়ে আছে নীল ইতিহাস
অড়হর খেত থেকে উঁকি মারলো শোলার টুপির নীচে
কার নগ্ন মুখ
অলীকও সে হতে পারে, অথবা নিছক এক খয়েরি শিকারি
কোথা থেকে উড়ে এলো চিঠির খসড়ার মতো, পরেও যা লেখা হয়নি
সে রকম পাতা
দুপুর তিনটে দশে ভাঙা ঘাটলার নীচে তীব্র শিস বেজে ওঠে
কেউ কি শুনেছে
পুরোনো প্রবাদ বলে, না শোনাই ভালো
তখন আকাশ ঠিক ততই দুরধিগম্য, যেন শ্বেতকেতুর সারল্য

মাঠ ঘাট, আল জাঙ্গাল, জঙ্গল পেরিয়ে ফের অসমাপ্ত
দিনে ফিরে আসা
বকুল, বকুল, কথা বলো!

দুটি আহ্বান

ঠাণ্ডা ঘরে রিভলভিং চেয়ারে যে ধোপদুরস্ত মানুষটি
বসে আছে
টেবিলের নীচে তার খালি পা
গাঢ় ভুরু, কণ্ঠস্বরে প্রতিষ্ঠার স্ববিরোধ
চশমায় বিচ্ছুরিত ব্যক্তিত্ব, হাতের আঙুলে সিগারেট ধরার
অবহেলা
কেউ জানে না সকাল থেকে তার নিম্ন উদরে ধিকিধিকি ব্যথা
একটা আগুন, যা কিছুই পোড়ায় না, শুধু জ্বলে
একটা অন্যমনস্কতা, যা কোথাও যায় না, মনের চারপাশেই
ঘুর ঘুর করে
সে চোখ তুললে দু'জন আগন্তুক, তখনই সে শুনতে পেল
রাত্রির সমুদ্র-গর্জন!

সেদিন চাঁদ টেনেছিল সমুদ্রকে
সেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে লাফিয়ে উঠেছিল এক
উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঝিনুক
বাতাসে পূর্বপুরুষদের দীর্ঘশ্বাসের রলরোল
আকাশ নেমে আসে খুব কাছাকাছি, কয়েক লহমার জন্য
তখনই একটা বিদ্যুতের হাত, এক ঝলকের তীব্র বাসনা
ছুঁড়ে দিন একটা মালা
ঢেউয়ের মাথায় দুলতে দুলতে দুলতে দুলতে
আসবে কিংবা ফিরে যাবে, একবার গভীরে, একবার তীরের দিকে
কখনো দীপ্ত, কখনো অন্ধকারময়
কখনো কৈশোর স্মৃতি, কখনো সব হারানোর মতন রক্তিম...
বালির ওপরে অন্ধকারে বসে আছে এক বালির মূর্তি
একটু আগে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই মানুষেরা সব ছাদের নীচে
চলে গেছে
দিগন্ত শুধু, একজনেরই জন্য
সিন্ধু সারসেরা ট্রি ট্রি ডাকছে
প্রেমের চেয়েও তীব্র, মাতৃস্নেহের মতন আদিম একটা টান
জীবন বদলের একটা মুহূর্ত
খিদে-তেষ্টা তুচ্ছ করা এক অধীর অপেক্ষা
সব কিছুই অন্য রকম হয়ে যেতে পারে, অন্য রকম, অন্য রকম
বালির স্তূপ ভেঙে উঠে দাঁড়ানো বোতাম ভাঙা শার্ট

আর ছেঁড়া চটি পরা, দাড়ি-না কামানো মুখ, একটি তেইশ বছর
সে কি বাল্মীকি না রত্নাকর এখনো
পেছন থেকে ভেসে আসছে কাদের ডাক, কারা তার জামা ধরে
টানছে
সে ছুটে যেতে গেল জলের দিকে
কোনো নারী তার সামনে দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়ালো না
তবু সে শেষ মুহূর্তে ঘুরে গেল অন্য দিকে
সমুদ্রের মালা মিলিয়ে গেল, হাওয়ায় উড়ে এলো একটি
খয়েরি খামের চিঠি...
সেই পাহাড়ের কোনো কৌলিন্য নেই
চূড়ায় নেই মন্দির, সানুদেশে নেই নিসর্গ লোভীদের
ব্যস্ততা
নাম-না-জানা বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটা সরু পথ
সেই পথ, সেই পাহাড় এতদিন তাকে ডেকেছিল
এমন ডাক আসে ঘুমের মধ্যে, এমন ডাক আসে আকস্মিক অপমানের
প্রতিশোধের মতন
কেউ বলেছিল কয়লা খনিতে কালো হয়ে এসো
কেউ বলেছিল, স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে ধুলো কুড়িয়ে আনো
কেউ বলেছিল চোখের জল দিয়ে ওষুধ বানাও
ভাঙো অরণ্য, বিষ মেশাও শিশুদের শরীরে
শব্দ ও অক্ষরের মধ্যে বুনে দাও চকচকে রুপোলি লোভ
নারীকে দেবীর আসন দাও, তারপর তার গর্ভপাত করো
বসে থেকো না, দৌড়োও, সবাই দৌড়োচ্ছে, পায়ে পা দিয়ে ফেলে দাও
সামনের জনকে
সেই রকম একদিন হঠাৎ সে নিমন্ত্রণ পেল
সবুজ শাওলায় ঢাকা লোমশ একটি পাথর অপেক্ষা করছে
তার জন্য
ঘোর অপরাহ্ণে তার জন্য প্রতীক্ষা করেছে
পাহাড়ে হেলান দেওয়া এক টিলা
অভিমুখী পথটিতে অনেক দিন কেউ যায় নি, তবু চিনতে
অসুবিধে নেই
দু'পাশের বন তুলসীর ঝাড়ে বাল্য প্রেমের সৌরভ
প্রথম কোনো স্তন স্পর্শের মতন কাঁপছে পৃথিবী
নভোলোকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে নিস্তব্ধতা
সেই পাথরের বেদী, একটি নিঃসঙ্গ শিমুল গাছ তাকে কিছু দেবে
যা অন্য কেউ পায় নি

সে জানে, সে জানে, সে ছুটে যাচ্ছে
তবু যাওয়া হলো না
জুতোর পেরেকে রক্তাক্ত হলো তার পা, সে বসে পড়লো মাটিতে
তখনই সে শুনতে পেল পাতা খেলানো বাঁশির শব্দ
পা ক্ষত বিক্ষত হলে সামনে যাওয়া যায় না, পেছন ফেরা যায়
অনায়াসে
সেই বাঁশির সুরে দুলতে লাগলো তার মাথা
সে কবে পোষা সাপ হয়ে গেছে সে নিজেই জানে না...

চেয়ারটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে, চোখ থেকে চশমা খুলে
সে বললো, এখন সময় নেই, ব্যস্ত আছি, ব্যস্ত আছি
খুব ব্যস্ত...

আত্মজীবনীর খসড়া

বাঁশি বাজানো শিখতে শুরু করেছিলুম উঠতি বয়সে
সবাই বললে, ওরে, ও কম্ম করিস নি
গরিবের ছেলে দিন রাত বাঁশি ফুকলে নির্ঘাৎ টি বি
ত্রিপুরা থেকে কিনে আনা প্রিয় বাঁশিটি দান করে দিলুম এক বন্ধুকে
সে দু' চারদিন ফুঁ দিতে না দিতেই
মথুরার রাজা হয়ে চলে গেল
আমায় টি বি পোকায় খায় নি, খেয়েছে পঙ্গপাল!

পকেটে যখন ট্রাম-বাস ভাড়ার বিষম টানাটানি
তখন এক শুভানুধ্যায়ী প্রস্তাব দিলে, একটি প্রাক্তন সুন্দরীর
আত্মজীবনী লিখে দিতে পারবি?
সে নাকি এক সময় ছিল বাংলা সিনেমার বিবি, এখন কোনো এক
সাবান ব্যবসায়ীর রাঁড়
স্ত্রীলোকটির কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল, কিন্তু পারিশ্রমিক দেবে ভালোই
মন্দ নয়, বলে আমি পা বাড়াতেই মঞ্চ থেকে নেমে এসে
শিশির ভাদুড়ী আমার গালে কষালেন এক থাপ্পড়
আমি রাগের মাথায় ঝটিতি কিছু করে ফেলার আগেই
তিনি নিজেই ঘুরে পড়ে গেলেন মাটিতে, এবং
অক্কা!

এরপর নির্জন রাতে নিজের পৌরুষটি হাতে ধরে বসে থাকা ছাড়া
আর উপায় কী?

তারপর সেই এক দাঙ্গা হাঙ্গামার সাড়া জাগানো বছরে
সামান্য রুখু দাড়ি রেখেছিলুম ও লুঙ্গি পরে ঘুড়ি ওড়াতুম বলে
বেমক্কা আমাকে সন্দেহ করলো মুসলমান বলে হিন্দুপাড়ার বীরপুঙ্গবেরা
তখন নিরীহ মুসলমান ডিমওয়ালা কিংবা শালকরদের
মাথা থেঁৎলে দেবার জন্য বেরিয়েছে অসংখ্য বাঁশ ও
শাবল
ওদিকে অন্য কোনো পাড়ায় ছোটজাতের হিন্দুরাও
কচুকাটা হচ্ছে টপাটপ
তখন একজন আমাকে বললো, পেন্টুল খুলে দেখা তো
শুয়োরের বাচ্চা
আমি প্রকৃত শুয়োরের বাচ্চার মতন উদোম হতেই
তাবৎ পৃথিবী কেঁপে উঠলো জন্তু-জানোয়ারদের পুলক শীৎকারে
বস্তুত আমার ঐ ব্যাপারটির সঙ্গে ষাঁড় না শুয়োরের বেশি মিল,
সে সম্পর্কে আমি এখনও নিশ্চিত নই!

বন্ধু বলে যাদের জড়িয়ে ধরতে গেছি, তারা পিঠ ফেরাতেই
ঢেলেছে বিষ
সেই বিষে আমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, নির্জনতা খুঁজতে গেছি রঙ্গালয়ে
এই তো দেখছি কয়েকটি বহুরূপী এখানে সেখানে লেখা ছাপাবার জন্য
গোপনে উমেদারি করে যায়,
আবার
বাইরে গ্যালারি কাঁপাবার জন্য তুলে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার জিগির
কেউ গায়ে জড়িয়েছে সুবিধেবাদী মার্ক্সবাদের নামাবলী, মাথার টিকিতে
জবাফুলের মতন বেঁধে নিয়েছে
লেনিনের নাম
তারপর দুরন্ত সত্তর দশকে চেয়ার ভেঙে সামান্য আহত হয়ে
কমরেড মাও সে-তুঙ আমায় বললেন,
চলো, নদীতে গিয়ে ওসব অতি বিপ্লবীপনা ধুয়ে ফেলি
আমি জলের নামে ডরাই শুনে উনি হেসে বললেন, ভয় কী,
আমি তোমায় সাঁতার শেখাবো
এরকম কথা-না-রাখা যেন ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ডিগবাজি
তিনি নিজেই টুপ করে ডুবে গেলেন বিস্মৃতির গভীরে
আমি এখনও খাবি খাচ্ছি...

সে আসবে, সে আসবে

পশ্চিমের অবনত সন্ধ্যায় এক নদীর কিনারে দাঁড়ালো সে
একজন শতাব্দীর ভ্রাম্যমাণ, ইতিহাসের পথ ভোলা পথিক
তার দু'চোখে প্রতীক্ষা, তার নিশ্বাসে ব্যাকুলতা
ঠিক এইখানে, এই শ্মশানপ্রান্তে শিশুগাছটির নীচে
কেউ একজন আসবে তার জন্য, কথা আছে, সে নিয়ে আসবে মুক্তি

একদিন এইখান থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছিল তার, যখন এই গাছটির
জায়গায়
সদ্য বীজ থেকে বেরিয়েছিল অঙ্কুর, নদীটি ছিল বর্ষার মতন ঝঙ্কৃত
যখন বাতাস ছিল শিশুর হাসির মতন টাটকা, জ্যোৎস্না ছিল
ভালবাসার মতন
যখন ফসলের ক্ষেতে লাগেনি রক্তের ছিটে, ঘুমের মধ্যে ধাতব শব্দ
যখন এক রাজকুমার অঙ্গে নিয়েছিল গেরুয়া, এক সেনাপতি পদচুম্বন
করেছিল এক ভিখারিণীর

এক কবি দেবমন্দিরের বেদীতে বসিয়েছিল তার হৃদয়েশ্বরীকে
তবু একজন কেউ বলেছিল মানুষের জন্য এই বসুন্ধরা সুন্দরতর হবে
পাহাড়ের গায়ে মেঘের মতন কোথাও আড়ালে রয়ে গেছে মাধুর্য

সে আসবে, সে আসবে, সে আসবে...

যার জন্য সারা জীবন

আরও একটু সামনে যেতে হবে
মাত্র আর একখানাই খাড়া পাহাড়, দুটো পাগলা ঝোরা
এখানে বসিস নি, খুকি, ওঠ, আমি হাত ধরে তুলছি, বেলা যে বেশি নেই
কিংশুকের রেণুর মতো ঝরে পড়ছে আসন্ন সায়াহ্ন
অকস্মাৎ অতি চিকন আলোর মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে রাস্তা
এই দিগন্তে ধুলো আমার খুবই চেনা, সারা অঙ্গে সাত জন্মের ধুলো
সমস্ত অনিত্যতার মধ্যে আমার এই জন্ম দাগ!

পায়ের তলায় কাঁটা, রক্ত বিন্দু?
পায়ের তলায় এই সামান্য আদিম বর্ণ, আঃ কী আনন্দ
এতক্ষণে রমণী হলে, নীরার চেয়েও অধিকতর নারী
মন্দিরের মূর্তি নও, রাত্রি-জাগা শব্দ-খেলা নও
ব্যথায় তোমায় ওষ্ঠ কাঁপে, শিল্প তোমায় অমর হাসি দেয়নি
পায়ের তলায় এই সামান্য আদিম বর্ণ, আঃ কী আনন্দ
আমার দাঁত, আমার জিভ আজ ধন্য হলো!

এসো আবার চড়াই-উৎরাই
কতটা পথ এসছি, কত দুর্নিবার, বাকিটা আর কিছু না
দু'দিকে গাঢ় জঙ্গলের হাতছানি, বাতাস ডাকছে এসো
বসতে পেলেই শুতে চাইবে এমন লোভ মাথায় আর ক্লান্ত মজ্জায়
সুন্দরের সশস্ত্র মোহ, এর আগে কি দেখিনি কক্ষনো?
এখানে বসিস নি, খুকি, ওঠ, আমি হাত ধরে তুলছি, বেলা যে বেশি নেই
আমরা সেই সেখানে যাবো, যেখানে তৃণ সদ্য জেগে উঠছে!

ওদিকে এমনকি ঝড়, নীরা!
আমরা কি আগুন খাইনি এই সেদিন ঘোর পাতালে যাইনি পিকনিকে?
চতুর্দিকে কাড়াকাড়ির খেলা, আমরা কারুক্কে হারাই নি, হার মানিনি
তারের ওপর দিয়ে হাঁটা, সবাই বললো, গেল এবার গেল
শরীর যেন প্রবাসী হাঁস, প্রতিটি দিন ভ্রমণ কৌতুক
মাত্র আর একখানাই খাড়া পাহাড়, দুটো পাগলা ঝোরা
হু হু শব্দে নামছে আকাশ, এখনই নয়, একটু দূরে থাকো!

দ্রিদিম দ্রিম দ্রিদিম দ্রিম ধ্বনি
ধন্যবাদ, আমরা কোনো উৎসবের আমন্ত্রণ আজকে নিচ্ছি না
ঝামরে উঠছে প্রায়ান্ধকার, চূড়ার কাছে সাত ঈগলের ডানা
আমরা আজ সেখানে যাবো, যার জন্য সারা জীবন এত সমস্ত কাণ্ড
শরীর যেন প্রবাসী হাঁস, প্রতিটি দিন ভ্রমণ কৌতুক
চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে, হঠাৎ যদি গড়িয়ে যাই নিম্ন গোলক-ধাঁধায়
আমায় ধরে রাখিস, খুকি, কোমল হাতে অনিঃশেষ মায়া...

বিকেলের বর্ণফেরা

ঘাটের পৈঠায় বসে আছে এক জলকন্যে, এখনো হয়নি ঠিক সন্ধে
নিথর দিঘির পিঠে মেঘের তরল ছায়া, যেন সব কথার নিষেধ
ঈষৎ বাতাসে ওড়ে চুল, ভুরু, ডম্বরু কোমর খাঁজে দু'টি পদ্মপাতা
মুখের ভঙ্গিমা তার নৈঋতে ফেরানো, যেন মুখ তার না দেখাই ভালো
বস্তুত জলের নীচে তার কোনো বাস নেই, কঠিন ভূমিতে কেউ নেই
আকাশেও কিছু নেই, স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নে, এ শুধু একাকী বসে থাকা
বিকেলের বর্ণফেরা, চূর্ণ ঝড় ধেয়ে এলে সে কোথাও যাবে না থাকবে না।

মন্ত্র

তোমার এতই ভালো লাগছে গড়বন্দীপুর, এই থিকথিকে কাদা,
পচা কাঁঠালের গন্ধ?
নীল রঙের শাড়িতে কত চোরকাঁটা, যেন অসংখ্য তীরবিদ্ধ তুমি
পা ধোবে এই শুকনো নদীর ঘাটে?
এখানে অনেক দীর্ঘশ্বাস ছিল, সব উড়ে গেল তোমার হাসির শব্দে
এখানে অনেক লুকোনো কান্না ছিল, এখান সেই সব চোখ
তোমাকেই দেখছে
আমাদের এই গড়বন্দীপুরে তুমি, তুমি যেন বিলেত-অ্যামেরিকার চেয়েও
দূরের কোনো স্বর্গের দেবীর মতন
গতবার সরস্বতী পুজোর মণ্ডপে আগুন লেগেছিল, তুমি সেই প্রতিমার
চেয়েও
সুন্দর গো
এখানে শ্বেত কমল ফোটে না, তোমার পা ফেলার মতন সবুজ ঘাসও নেই
ঐ সাপটা দেখে তুমি ভয় পেও না, ও এমন কিছু না, জলঢোঁড়া
এসো এই বাজ-পড়া গাছটির পাশ দিয়ে
কালভার্টের মাঝখানটা ডেবে গেছে, তাতে কোনো দোষ নেই,
এক হাজার বছর ধরে ওটা এমনই আছে
সামনের এই গোয়ালঘরটি পেরুলেই আধখানা প্রান্তরের ওপাশে দেখবে
সেই গড়
যেখানে স্থাপত্য নেই, ইতিহাস নেই, আছে শুধু ভগ্ন স্মৃতিকথা
একটু সাবধানে এসো

বাবলা কাঁটায় তোমার শরীর যেন ছড়ে না যায়
পাঁজরা বার করা গোরুদুটিকে তুমি ধন্য করলে তোমার স্নেহদৃষ্টিতে
ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়া কার্তিক সাপুইয়ের ছেলেকে বুকে তুলে
আদর করলে তুমি...

হে দেবী, তুমি কি খরায় জ্বলা মাঠে বৃষ্টি এনে দিতে পারো
নেতিয়ে পড়া ধানের বীজে এনে দিতে পারো দুধ
তোমার স্পর্শে আমগাছগুলো থেকে পালিয়ে যাবে সব পোকা
বিদ্যুৎ চমকের মতন তোমার মুখখানি, তুমি আঁচল উড়িয়ে
গেয়ে উঠলে গান
তোমার খুশির লাবণ্যে থরথর করে কাঁপছে কচি কচি সবুজ পাতা
পানা পুকুরটায় আজই প্রথম ফুটলো একটা লাল শাপলা ফুল
গড়বন্দীপুরে আজ আনন্দের প্লাবন বইছে, তুমি এসেছো, তুমি সৌভাগ্যের
দুহিতা...

হে দেবী, এখান থেকে আবার পথ চিনে ফিরে যেতে পারবে তো?
মনে আছে সেই মন্ত্র?
যদি ভুলে যাও, গড়বন্দীপুরের গোলক-ধাঁধায় আটকে যাবে তোমার পা
তা হলে তুমিও একদিন হয়ে যাবে সাতটি সন্তানের জননী, দিনের শাকচুন্নী,
হাবার মায়ের মতন!

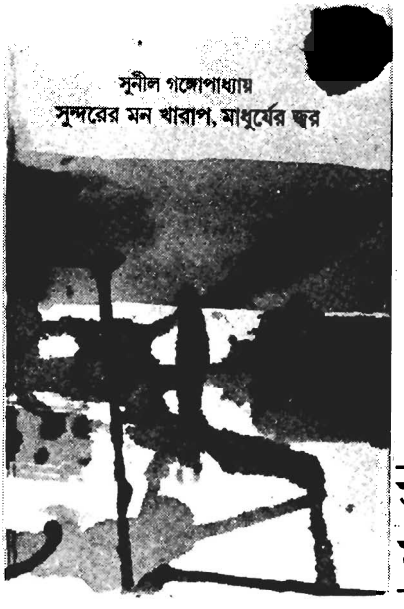

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর

সূচিপত্র

হে অদৃশ্য সকল দেখার শ্রেষ্ঠ ১৭৫, যৎসামান্য ১৭৯, নির্মাণ খেলা ১৭৯, অরফিউস ১৮০, ভাত ১৮১, অসীমের করতলে ১৮২, সমস্ত শরীরময় ১৮৩, শেষ কথা ১৮৩, দাও! ১৮৫, সবাই বললো ১৮৬, তবু তোর নামে ১৮৭, আর কিছু না ১৮৮, টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে ১৮৮, বীজমন্ত্র ১৮৯, অদৃশ্য কুসুম ১৯০, জ্বলতে থাকে আগুন ১৯০, মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের সামনে ১৯১, প্রতিদ্বন্দ্বীরা ১৯২, নিজের মাথার বালিশ ১৯৩, শব্দ ভাঙে ১৯৪, উদ্যত ছুরি ১৯৫, ডানা-বদল ১৯৬, অপু ১৯৮, সে আর ফিরলো না ১৯৮, সাদা দেওয়াল ১৯৯, মালা ২০০, ছবি ২০০, কে কাকে টানছে ২০১, অধরা ২০২, থেমে থাকা যাত্রী ২০৩, সুন্দরের মন খারাপ ২০৪, সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া, নির্জন বিমান ২০৪, আবছায়াময় কেল্লার মাঠে ২০৫, সীমান্ত কাহিনী ২০৬, দরজার আড়ালে ২০৮, রূপকল্প ২০৯, তস্য গলি ২১০, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত '১১, বাল্যস্মৃতির ঠোঁট ২১২, জন্মদাগ ২১৩, কাঁটা ২১৩, একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ২১৪

হে অদৃশ্য সকল দেখার শ্রেষ্ঠ

১

হে প্রিয়, হে নির্বাক কুসুম, এবে উন্মোচিত হও
হে তমস, বিদ্যুল্লতায় ঘেরা, মরুৎবাহন
হে অদৃশ্য, সকল দেখার শ্রেষ্ঠ, কাঙাল ভুবন
যে সমুদ্রে ওঠে না তরঙ্গমালা, নিয়ত জাগ্রত
যে স্বপ্নের ভিতরে সহস্রকান্তি দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস
হে প্রিয়, হে বাঙ্ময় নির্মাণ, দেখা দাও, দেখা দাও!

২

চলেছে দিন, দিনের পিঠে দিন, যেমন মরুর অভিযাত্রী
খাচ্ছি দাচ্ছি শুচ্ছি বসছি দুয়োর খুলে ঘূর্ণিমাতন দেখছি
ফুলের অভিঘাতেও হঠাৎ ফুলশয্যায় জ্বলে আগুন ফুল্‌কি
কেউ দু'দিকে কান টানছে, মাথার মধ্যে অন্য মাথা ঘুরছে
সবাই খুব জব্দ করে, চতুর্দিকে জব্দ হচ্ছে ছিনতাই
কে কতটা আয়না ঘেঁষা, তা দিয়েই তো বিস্তৃত সাম্রাজ্য
যেমন অকস্মাৎ সকালে এলো অন্য নামের তারবার্তা
হাত কাঁপছে, বুক কাঁপছে, ঠোঁটে তবু এরল ফ্লিনের হাস্য
অলীক অলীক সবই অলীক, দিনের বেলা কে যে কাকে চিনছে
চলেছে দিন, দিনের পিঠে দিন, যেমন মরুর অভিযাত্রী...

৩

আসুন, বসুন, চা খান
না খাবেন তো উচ্ছন্নে যান
কোন দিকে বাথরুমটা ভাই, এই যে ডান দিকে আলোর বোতাম
জিপ ফাস্‌নার আটকে গেছে রোমে, আমি যদি বেদুইন হতাম!
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, তাও যেন ছায়া আসছে পিছুপিছু।
সব দিকেই তো সব কিছু ফক্কা, তবু তো পাওয়া যাবে কিছুমিছু।
পান থেকে আর চুন খসে না, কিন্তু সিগারেটের ছাই ফেললে কার্পেটে
তুমি অমনি আধ-নম্বরী বেঁটে!
কোথায় এসেছো কিছুই জানো না, কেন এসেছো তা জানো?
ম্যাজিক হাভেলি, চতুর্দিকে গুহামুখ সাজানো

কেউ কারুকে দেখছে না, বসেছে হুল্লোড়ের আসর
এখানে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, এখানে তোমার বিবাহ-বাসর
কোনো রকমে রাস্তায় বেরিয়ে যার দিকে খুশি করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে
ভিখিরিকে কুড়ি পয়সা পুলিশকে দাও হাঁকিয়ে
এই সব কিছুরই শোধ তোলার আছে একটা দিব্যস্থান
যে খোঁজ পাবার সে ঠিকই জানে, সে সেখানে একলা মাস্তান।

৪

মাঝরাত্তিরের পরেও অনেকটা ঘুরে গেছে ঘড়ির কাঁটা
তবু কেন জেগে উঠলাম?
বাল্য বিবাহের মতন প্রথম প্রহরেই ঘুম এসেছিল
কেউ তো ঘুমকে শাসন করেনি, তবু কেন এই অভ্যুত্থান
ভূতে পাওয়ার মতন কেউ আমাকে টেবিলের সামনে বসায়
খোলায় কবিতার খাতা
কোন্ ভূত, কোন্ ভূত, আমার কাঁধে সিন্ধুবাদ নাবিক
একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আমার হাসি পায়
মদন মিত্তিরের দেওয়া পুরনো ডায়েরিটাকে আমি চুম্বন করি
এতগুলি সাদা পাতা, তোমরা পরবর্তী প্রজন্মের দিকে যাও
অগণন ক্রুদ্ধ, সুন্দর, মগ্ন, লাজুক তরুণ-তরুণীরা খেলা করছে সিন্ধুপারে
দূরত্বের আলোছায়া কী মধুর
কলম খোলা, আমি চুপ করে বসে আছি, আঃ কী প্রগাঢ় বিচ্ছিন্নতা
ছিন্ন পৃষ্ঠাগুলি অলঙ্কার ও উপমা হয়ে উড়ছে বাতাসে
বাইরে ঝিমঝিম করছে রাত, আমার নিজস্ব রাত
আমার শৈশব ঘড়ি টিকটিক করে বলছে, জেগে থাকো, জেগে থাকো
যেন আরও কিছু বলে, আমি ভাষা বুঝতে পারি না
আমারই আয়ুর ভাষা এত নৈর্ব্যক্তিক!

৫

জাগো হো ঘোড়সওয়ার, নীল ঘোড়সওয়ার

দিনের বেলায় তুমি পাথর পথের ধারে, রাত্তিরের রাজা
কিংবা রাত্তিরের রানী, বুকে হাত দিয়ে কেউ বলুক তো
ঠিক ঠিক চিনি
আমি রাত্তিরের দিকে, রাত্তিরের প্রবল আঙ্গিকে

আমার নিজস্ব কিছু পাগলামিরা ভূমি পায়, চাষবাস করে
শরীরেও আসে যায়, যতটুকু খোলা থাকে নিসর্গ পর্দায়
বৃষ্টি খায় আকাশের ছায়া
রুপালি আলোর মতো বৃষ্টি এসে ফিসফিসিয়ে ডাকে
চাঁদ গলা জল আসে, সাতাশ বছর মনে পড়ে
পাহাড় পেরিয়ে আসা সেই রাত, দ্রিমি দ্রিমি মাদলের ধ্বনি
মনে হয়, এই বুঝি অসীমের গীতিনাট্য, কসমিক হারমোনি
জলপ্রপাতের পাশে একা শুয়ে থাকা
নগরে-ব্যারাকে কিংবা পানশালায়। কদাচিৎ কয়েদখানায়
সব কিছু ভালোবাসা, মায়ার আঙুল ছোঁয়া ভালোবাসাময়
প্রতিটি দিনান্ত, আমি চেয়েছি নারীর কাছে দয়া
মনে আছে, দয়া নয়, দিয়েছিলে অশ্বক্ষুরধ্বনি
তোমার সুষমা তুমি কিছুই জানো না। তুমি সবকিছু জানো
রাত্রিকে বাজাও তুমি, সামান্য ও ভুরুভঙ্গে বয়ে যায় শিউলির গন্ধমাখা
নদী
অনন্তের তরীখানি থেমে যায় এই কিনারায়
এরই মধ্যে যদি ঘুম আসে
এরই মধ্যে হাতের আঙুল যদি ঘুমে ছুঁয়ে দেয়

জাগো হো ঘোড়সওয়ার, নীল ঘোড়সওয়ার...

৬

'কাল রাতের বেলায় গান এলো মোর মনে'
তখন আপনি ছিলেন আমার সঙ্গে, সবগুলি গুনগুন সঙ্গীতের স্রষ্টা
পূজা থেকে বিরহ, প্রকৃতি থেকে আরও দুঃখভরা গান
এ দুঃখ আমার নয়, যিনি লিখেছেন, তিনিও কি এত দুঃখী
কিংবা প্রত্যেক কবির মতন তিনিও বৈপরীত্যের বরপুত্র, সব প্রশ্নের
উত্তর ঘুলিয়ে দেবার সম্রাট?

জীবন চরিতে তাঁকে সত্যিই খোঁজা যায় না
কাল রাতের বেলায় এত গান, সর্বাঙ্গ জড়ানো গান
সেইসব সুখের মীড় ছবির রঙের মতো গড়িয়ে যায়, আয়তনে মেশে
যেন মাতিস্-এর আঁকা গান, ঝর্নায় অনেকক্ষণ ধারাস্নান
চোখ জড়িয়ে আসে
তারপর এক ঝলক স্বপ্ন দেখি আলখাল্লা পরিহিত তাঁকে

এ মূর্তি প্রভাত মুখুজ্যের গড়া নয়, বইয়ের র‍্যাকের পাশে ঠেস দিয়ে
থুতনিতে আঙুল, বড় ব্যাকুল ও কৌতূহলী, খুবই মহান ও সামান্য
আমার কোনো প্রশ্ন মনে আসে না
কান্নায় আমার গলা বুজে যায়, আমি ফুঁপিয়ে উঠি
একটু পরেই দেখি ঘামে ভিজে গেছে বিছানার চাদর
বাইরে প্যাঁচার ডাক শিহরিত রাত, থমথমে পৃথিবী
কুয়াশার মতন ছড়িয়ে পড়ে আমার বিস্ময়
রবীন্দ্রনাথকে দেখে হঠাৎ আমার কান্না এলো কেন, আমারও
কান্না জমে ছিল?
আঃ, বেঁচে থাকা এত আনন্দের!

৭

উনুন নিবে গেছে, ঘুমিয়ে আছে ওরা, ঘুমো
উদরে থাক খিদে, কপালে দেবো আমি চুমো
সারা গা ধুলো মাখা, শিশুরা শুয়ে আছে চাঁদে
তারার কুচি মাখা জড়িয়ে মড়িয়ে আহ্লাদে
আতুর, বিরহীরা, লক্ষ্মীছাড়া যত যারা
অকূল পাথারের জাহাজে ভাসে দিশেহারা
দুখিনী জননীটি ঘুমিয়ে খুকি হয়ে আছে
এখন বসুমতী রেখেছে তাকে খুব কাছে
ঘুমোও ষড়রিপু, ঘুমোও অবিচার, ক্রোধ
আমার জেগে থাকা দিনের সব কিছু শোধ!

৮

হে প্রিয়, হে নির্বাক কুসুম, এবে উন্মোচিত হও
হে তমস, বিদ্যুল্লতায় ঘেরা, মরুৎ বাহন
হে অদৃশ্য, সকল দেখার শ্রেষ্ঠ, কাঙাল ভুবন
দেখো কত একা আছি, বাতিস্তম্ভে জাগ্রত প্রহরী
নেই আভরণ, নেই না-পাওয়ার কোনো অভিমান
হে প্রিয়, হে বাঙ্ময় নির্মাণ, দেখা দাও, দেখা দাও!

যৎসামান্য

ওগো পরজন্ম, ওগো প্রিয় দিবাস্বপ্ন, পরম মধুর
তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যে, তাই তুমি এমন সুন্দর?

*

উপমাবাহুল্যে তুমি নষ্ট হলে, কবিদেরও করোনি সংযত
ওগো চাঁদ, আজ তুমি এত চেনা, প্রান্তরের একা
পোড়ো বাড়িটার মতো!

*

এর ঈশ্বর মাটি পাথরের পুতুল এবং ওর ঈশ্বর নিরাকার
ক্ষুধা নেই, নেই তৃষ্ণা তবুও কোন্ জিভ দিয়ে
রক্ত চাটছে মানুষের?

*

গোলাপ, চম্পক, যূথী...মানুষ করেছে কত ফুলের বন্দনা
ফুলেরা জানে না কিছু, একতরফা ভালোবাসা তবুও মন্দ না!

*

জামরুল গাছের নীচে যে দাঁড়িয়ে, বৃষ্টিভেজা ক্ষীণ-চাঁদ নাভি
শাড়িতে অজস্র যুঁই, সে-ই তো রচনা করে কবিতাটি,
আমি কেউ নয়!

*

ওদের যাদের খিদের অসুখ, ওরা তবুও হাসে এবং গান গায়
হৃষ্টপুষ্ট কুম্ভীরেরা দুপুরবেলা শুধুই কাঁদে, পরের দুঃখে
ভেজায় এত কাগজ!

*

লুকিয়ে রেখো না কোনো গোপন সিন্দুকে কিংবা লিখো না
দলিলে
না দিলে থাকে না কিছু, ভালোবাসা ডুবে যায় স্বখাত সলিলে!

নির্মাণ খেলা

'তালগাছের ডগায় শিরশির করছে মেঘলা বাতাস'
না ঠিক হলো না
চোখের সামনে একটা তালগাছ, আমি বারান্দায় বেতের চেয়ারে

বাতাসে সমুদ্রের গন্ধ
'ডগায়' না 'মাথায়'? 'শিরশির' না 'ঝিরঝির'
'তালগাছের মাথার ঝিরঝির করছে সমুদ্র-বাতাস'
না, ঠিক হলো না
সমুদ্রের বাতাস কখনো ঝিরঝির করে না
'তালগাছের শিখরে শোঁ শোঁ করছে সমুদ্র-বাতাস'
অনেকগুলি স-ধ্বনি, বেশি বাড়াবাড়ি
গদ্যের বদলে ছন্দেও ফেলা যেতে পারে
'তালগাছটার শিখরে দুলছে অমৌসুমী সমুদ্রের হাওয়া'
কলম নেই, খাতা নেই, হাতে কফির কাপ
পায়ের কাছে পড়ে আছে খবরের কাগজ
প্রথম পৃষ্ঠায় রক্তের ছড়াছড়ি
'দেবদারু গাছটাকে ঝাঁকাচ্ছে ঝড়, যেন সে কাঁপছে
কুঠারের ভয়ে'
তালগাছ কী করে হয়ে গেল দেবদারু?
সমুদ্রের হু হু হাওয়া কখন হয়ে উঠলো ঝঞ্ঝা!
আমি চেয়ে আছি প্রান্তরের দিকে, সরে গেছে মেঘ
এক অলীক বিভায় বারবার বদলে যাচ্ছে রূপ
মাথা-ভারী একলা তালগাছ মুহূর্তের জন্য সর্বাঙ্গ সুন্দর দেবদারু
কয়েকটা ভুলো-মনা পাখি পাতা ছুঁয়েই উড়ে গেল
ভয়ার্ত ধ্বনি রেখে
সেই ধ্বনির মধ্যে ঝড়ের আভাস
এমনই সূচ-বেঁধা, যেন সমুদ্রের নয়, মরুভূমির
রোদ্দুরে ঝলসাচ্ছে অজস্র নির্মম কুঠার
মিথ্যে নয়
'দেবদারু গাছের তুলিতে এখন আকাশে এক
অসমাপ্ত ছবি'

অরফিউস

সন্ধে নিচু হয়ে এসেছে, একটা ছোট্ট স্টিমবোটে আমি
যাচ্ছি ব্ল্যাক সী অভিমুখে
মুছে যাচ্ছে দু' তীর, এই মাত্র নীলজল মহানাগের ফণার

মতো লাফিয়ে উঠলো, হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি চলেছি
মৃত্যুর দেশে।
অন্ধকার কৃষ্ণ উপসাগর, কেন টানছো আমাকে?
কালো জাদুকর, কেন দেখাচ্ছো ঐ আঙরাখা?
জলের উচ্ছলতার মধ্যে মহাজাগতিক ধ্বনি, আকাশ থেকে জ্বলতে
জ্বলতে নামছে একটি রক্তিম নক্ষত্র
বাতাসে কয়েকটি শতাব্দী খেলা করছে আমার সামনে
কোনো একটি শতাব্দী আমার হাতে তুলে দিল তলোয়ার
আবার অন্য একটি শতাব্দী আমাকে দিল বীণা
অন্ধকার কৃষ্ণ উপসাগর, কেন টানছো আমাকে?
একটা রুপোর নদীর মতন মিলিয়ে গেল বসফরাস, শেষ সূর্যের
সোনালি শৃঙ্গের মতন হারিয়ে গেল সরু সরু জীবন্ত রেখা
জামার সব কটা বোতাম খোলা, চুল এলোমেলো, একটু ঝুঁকে আমি
ফেলে দিলাম তলোয়ার, রইলো শুধু
বীণা, তাতে আমি সুর লাগাতে জানি না
যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি একটা নিক্ষিপ্ত তীর, আমাকে যেতেই হবে
কালো জাদুকর, আমাকে কি অন্তত একটি গান শিখিয়ে দেবে
যা আমি রেখে যাবো?
কেউ জানবে না, তবু অদৃশ্য মূর্ছনায় সামান্য একটা চিহ্ন!

ভাত

ভাতের থালায় এত কাঁটাঝোঁপ, দরজায় ঝনঝন আওয়াজ
গরম বাতাসে আসছে গ্রাম্য ধুলো
ছোট ছোট শিশুরাও আজকাল দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শিখে গেছে

খবরের কাগজে টাটকা রক্তের গন্ধ
চতুর্দিকে হুড়োহুড়ি পদশব্দ, দেয়ালে এত আঙুলের ছায়া
আঃ, নিরিবিলিতে বসে যে দুটি ভাত খাবো, তারও উপায় নেই।

অসীমের করতলে

হে উদ্ভিন্ন চিৎকমল, শান্ত হও
এত ঝড়ের ঝাপট, এত ধুলোবালি, শান্ত হও
এত শব্দ, অক্ষরের কোলাহল, পরস্পর বিরোধী বাক্যের
ঘনঘটা, তুলোর বীজের ওড়াউড়ি, শান্ত হও!

ভাতের থালায় পাতলা ছবি, কুমারীর মুখে
ম্লান আভা, দু'একটা রাস্তায় ওড়ে অসুখের রেণু
ফিরে এসো
নদীর স্খলিত যাত্রা, চৈত্রের দুপুরে একাকিনী
দীর্ঘশ্বাস ছুঁড়ে দেয়, ভেঙে পড়ে সেতু
ফিরে এসো
গ্রামের শ্মশানে জাগে গ্রাম, ধান ক্ষেতে
রক্তের উৎসব, ফিরে এসো
চোখের আগুনে জ্বলে হঠাৎ আতশ বাজি
আধা মফঃস্বলে, ফিরে এসো
উৎস ভুলে গেছে ট্রেন, পাগলের মতো ছোটাছুটি
করে এক পাহাড় কিনারে, ফিরে এসো
যে-গাছতলায় বসে দরবেশটি গান গাইতো, গাছটিও নেই
রোদ্দুর একদা ছিল হিরণ্ময়, আজ শুধু ঝাঁঝ
ফিরে এসো।

হে উদ্ভিন্ন চিৎকমল, শান্ত হও
মূলাধারে ফিরে এসো, নিজস্ব মেধায় ফিরে এসো
দুটি চোখে ফিরে এসো, হাতের আঙুলে
ফিরে এসো
বিস্মৃতি আকীর্ণ পথে ঝুঁকে পড়ে তুলে নাও
একটি একটি কাঁটা
অসীমের করতলে সামান্যকে উপহার দাও!

সমস্ত শরীরময়

পাহাড় বিভঙ্গ করে উড়ে যায় মিহি জলকণা
ঘুমন্ত ধাতুর গায়ে অহেতুক মানুষের পা
স্বপ্নের ভিতরে আঁচ, বস্তুত আগুনই স্বপ্ন দেখে
তুষার-সম্ভব ঐ নগ-চূড়া যার জন্য
যার জন্য
যার জন্য
তুষার-সম্ভব ঐ নগ-চূড়া যার জন্য জেগে আছে
কয়েকটি অসীম
কয়েকটি অসীম
সে এখনো গঞ্জে-গ্রামে-নদী-হ্রদে শরীরে শরীর
মাটির শরীর
কর্পূর শরীর
সমস্ত শরীরময় যুদ্ধ চলে অগ্নি আর জলে...
সমস্ত শরীরময় যুদ্ধ চলে অগ্নি আর জলে...
সমস্ত শরীরময়...

শেষ কথা

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে
হাততালি দাও
গাঁদা ফুলের মালা আনো, বাচ্চা লোগ
পুকারো ইনকিলাব
ব্যান্ডমাস্টার, তোমার ভাই কোথায়?
ডুবো-জাহাজে কাজ নিয়েছে
সে রয়েছে
এখন গভীর জলে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও
মাইক টেস্টিং
মাইক টেস্টিং, হ্যালো
ঘোড়া ছুটিয়ে বৃষ্টি আসছে
এলো!

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে বধ্যভূমির দিকে
আগুন-রঙা মাটির মধ্যে
হাঁ মেলেছে
কয়েক লাখ পিঁপড়ে
পিঁপড়ে-মা ও পিঁপড়ে-বাবা সামলে রাখো
নিখুঁত রানীকুঠি
ব্যান্ডমাস্টার, তোমার ছেলে কোথায়?
গোল করো না
সবাই জানে সে রয়েছে
চিনির কারখানায়
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও,
মাইক টেস্টিং
মাইক টেস্টিং, হ্যালো
রাত নামেনি, আকাশ তবু কালো।

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে,
ঐ যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে
ক্যাংলা পানা, রুখু দাড়ি, বাজার খুঁটে খাওয়া
দাঁত মাজে না, চোখে পিচুটি, হ্রস্বি দীর্ঘি দূরের কথা
ক-অক্ষর গোমাংস
কুঁজিয়ে গেছে, চক্ষু বোজা
হাঁটছে দ্যাখো যেন বৃদ্ধ ডাঁশ
কেউ চেনে না, কেউ জানে না ও কে
রাত পেরুলে কাঁদবে না কেউ
লক্ষ্মীছাড়ার শোকে!

এক সত্যবাদী কয়েদি
ঐ যাচ্ছে ঐ যাচ্ছে বধ্যভূমির দিকে
মাটি ফাটছে, মাটি ফাটছে, মাটির পেটে খিদে
খিদের মধ্যে রংমশাল, চতুর্দিকে
এত বিশাল
জমজমাট মেলা
হাওয়ায় উলটে পড়ছে খুঁটি, সবাই মিলে ধরো, ও ভাই
হাত লাগাও, হাত লাগাও
আরও গভীরে খোঁড়ো

ব্যান্ডমাস্টার, তোমার যমজ কোথায়?
অন্ধ নাকি, দেখতে পাও না
সে রয়েছে বারুদ ভর্তি ঘরে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও, মাইক টেস্টিং
মাইক টেস্টিং
হ্যালো
সময় নেই
সময় এসে গেল!

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে
নিরেট গাধা, আহাম্মোক, যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা
কাঁক-কাঁকুড় জ্ঞান নেই, ও কী জানে সত্য কোন রঙের সুতো
কোন সুতোয় কী বোনা
হাড়পাঁজরায় লেপটে আছে যাবজ্জীবন মিথ্যে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও, কাড়া-নাকাড়া
দামামা-দুন্দুভি
আওয়াজ তোলো পাহাড় চূড়ায়, গলা ফাটাও
গলা ফাটাও আরো
দেরি কিসের, দেরি কিসের, দ্যাখো হঠাৎ উঠবে ঝড়,
দ্যাখো ঈশান কোণে
আসুক ঝড়, আসুক ঝড়, বৃষ্টি হোক, ও লোকটার
শেষ কথাটা কেউ যেন না শোনে!

দাও!

ইচ্ছেটাকে মোমের আলোর মতো
ঝড় বাদলে দশ আঙুলে আড়াল
তোমার কাছে সতত সংযত
ভেতরে ফোঁসে অতি নগ্ন চাঁড়াল!

ঘোর দুপুর, বিকেলে নানা ছলে
সামনে যাই, তবুও দেখা হয় না

কত মানুষ কত না কথা বলে
ওরা গলায় পুষেছে বুঝি ময়না?

দূরত্বের এমন সাজগোজ
শরীর নয় অমরতার সঙ্গী?
কাব্য-গানে ভালোবাসার খোঁজ
অশেষ নয়, শুধুই তার ভঙ্গি!

অহংকারে খুঁটেছি নানা ক্ষত
আগুন মুড়ে হয়েছি দেখ শিষ্ট
যেমন মাথা নোয়ায় পর্বতও...

গরল দাও, দিও না উচ্ছিষ্ট।

সবাই বললো

সবাই বললো, সামনে একটা নিরেট অন্ধ গলি
দাঁড়াও!
ছেঁড়া হীরের মালার মতন ছড়ানো এক ভোর
কে ওখানে কে সেখানে অলীক কথাবার্তা
দাঁড়াও! দাঁড়াও!
ডাইনে যাও, বাঁয়ে ফেরো, দেয়াল দেখে ফেরো
কুড়িয়ে নাও, যা খুশি পাও, টুকরোটাকরা ঠিকানা
দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাঁড়াও!

হঠাৎ কয়েক শতাব্দীর এক পায়ে থমকানো
একটি বোবা মূর্তি বললো চোখের সামনে সবাই
ঘুরছে
পোকায় খাওয়া কাগজপত্র, সাত পাগলের খেয়াল
ইতিহাসের নামে বিকোয়, পাঁজরা খোলা দেহ
ঘুরছে শুধু ঘুরছে
বাচ্চা ছেলের আঁকা একটা ছবির মতন রঙিন
বাস্তবতা, তালপাখার হাওয়ায় কাঁপা জীবন
ঘুরছে, শুধু ঘুরছে

দেয়াল তো নয়, অট্টহাস্য, গলিও নয় অন্ধ
গলির গলি তস্য গলি, সমুদ্রে সব যাবেই
দাঁড়াও! দাঁড়াও! দাঁড়াও!
চর্কি হয়ে ঘুরবে তুমি, তবু বলবে, দাঁড়াও
পা শূন্যে দু'হাত বাঁধা, তবু বলবে দাঁড়াও
ভাঙ্গা গলায় কান্না তুলে সবাই বলবে, দাঁড়াও!

তবু তোর নামে

এত সুন্দর
সেজেছিস কেন বসুন্ধরা?
দেখতে পাস না আমরা এখন জীয়ন্তে মরা!
ওরে ও ডাহুকী
ভিজে সন্ধ্যায় কেন ডাকাডাকি
সুবাতাস মুছে আকাশ ঢেকেছে কালবৈশাখী
ওরে ও অমুল
তরুর তলায় ভ্রষ্ট বকুল
কে গাঁথবে মালা আঙুল বিবশ, প্রাণ সঙ্কুল
আগুন লেগেছে
নদীর কিনারে ঘন কাশবনে
রূপের বিভায় সংহার এসে হানা দেয় মনে!

এত সুন্দর
সেজেছিস কেন বসুন্ধরা?
দেখতে পাস না আমরা এখন জীয়ন্তে মরা
জলতরঙ্গে
ভয় সঙ্গীত, বন্যার শোক
শ্রবণ বধির আবছায়াময় রঙিন দ্যুলোক
মরু সংসারে
রং ও রেখায় কুটিল দ্বন্দ্ব
তবু তোর নামে আমরা এখনো মেলাই ছন্দ!

আর কিছু না

চোখের সামনে এত আঠা, গেল কোথায় একটা ফর্সা পা
ঈর্ষা জ্বলে বুকের মধ্যে, চোখ ঢেকে যায়, পা দেখি না
একটা ফর্সা পা
সেই বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল, তার ওপরে একটিবার চুমু
আর কিছু না। আর কিছু না। অমরত্ব খাটের নীচে লুকোয়!
কখনো দোলে, বিশ্ব দোলে, ঠোঁটের সামনে সমুদ্রের ঢেউ
মাথার চুলে নরম হাত গভীরে টানে, আরও গভীর, গভীর
অন্ধকারে আয়না যেন, বিশ্বরূপ, তার ভেতরে এমন ঝড় বাদল
আমাকে তবু যেতেই হবে, যেতেই হবে, গুহার মধ্যে একলা অভিযানে
নশ্বরতার এমন রূপ, হীরক দ্যুতি, চোখ ধাঁধানো রূপ
ফুল ফোটার মতো ক্ষণিক, শরীরময়, জীবনময় এমন ভালোবাসা
আর কিছু না, আর কিছু না, আমার এই আত্মাটুকু নাও!

টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে

টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে
এই দুপুর, এই সন্ধে, কেউ এলো বৃষ্টি ভিজে শপশপিয়ে
কেউ রোদ্দুর থেকে নিয়ে এলো ভেজা ভুরু, কেউ নিয়ে এলো
শীতকালের উষ্ণতা
প্রচণ্ড পরিপূর্ণতার মধ্যে হঠাৎ এক নিমেষের কঠিন শূন্যতা
টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে

সিঁড়ির মুখেই বাধা, ইসমাইলের কাছে ধার
ওপর থেকে একজন সাঁতারের সঙ্গীর মতন বললো, এত দেরি?
একটুকরো হাসি উপহার দিল অপরের প্রেমিকা
একটা ধোঁয়ার সুড়ঙ্গ আমাদের টানছে, তার ওধারেই যৌবনের গন্ধমাখা
বিকেল
মাথায় টগবগ করছে সদ্য-পড়া বই, আমরা
পকেটে হাত দিয়ে খুচরো গুনছি

কেউ চামচে দিয়ে তুলে খাচ্ছে বিনা পয়সার চিনি
দুনিয়ার কত বাচ্চা এখনো দুধ খেতে পায় না, তাই তিন কাপ ইনফিউশান,
দুটো ফল্‌স
সমাজ বদলের দুরন্ত স্বপ্ন সব কিছুতেই স্বাদ এনে দেয়
একলা দূরে বসে যে মাট্‌ন ওমলেটের অর্ডার দেয়,
সে জাহান্নামে যাবে
নতুন কাব্যগ্রন্থের আঠার ঘ্রাণ, হসন্তের মাত্রা নিয়ে তুমুল বিতর্ক
আঙুলে জলের রেখায় আঁকা হচ্ছে ছবি, যা কোনদিন মুছবে না
টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে...।

বীজমন্ত্র

খাবি তো খা, খা! আর না খাবি তো
মরণ ঘুম ঘুমো! তোর মাথায়
চুমো দিয়ে এক্ষুনি চাঁদ নামবে নরকে, ওঃ সেখানে
রোজ রোজ কত যে মিথ্যে ভোজ সভা হয়,
তুই কিচ্ছু জানলি না রে বোকা!

লোক না পোক, লোক না পোক, বিশ্ব-সংসারে
তুই একা! যা পাবি খুঁটে খাবি
দেখার কিছু নেই, পেছনে ফিরলেই সব আড়াল
তুই জন্ম-চাঁড়াল, তোর লজ্জা কী, তোর
বীজমন্ত্র হলো বাঁচা!
তোর বীজমন্ত্র হলো বাঁচা!
তোর বীজমন্ত্র...

অদৃশ্য কুসুম

তুমিও তোমার বন্ধু, বন্ধুদের তুমি
তোমাকে পেয়েছে এই মৃদু রাত্রি
তোমাকে পেয়েছে বনভূমি
নদীর নির্জনে পাওয়া অন্য তুমি, যেমন সকালে
যেমন আড়ালে
যেরকম স্মৃতি কুয়াশার সূক্ষ্মজালে
প্রত্যেক আলাদা তুমি, আনন্দের ঝর্না তুমি,
বিদ্যুতের লতা
তুমি গভীরতা
তুমিই তো পাথরের ঘুম
আমাদের নীরবতা তোমাকে উৎসর্গ করা অদৃশ্য কুসুম...
অদৃশ্য কুসুম...
অদৃশ্য কুসুম...

জ্বলতে থাকে আগুন

শুকনো নদীতে ছিল দুঃখ
ভরা বর্ষায় স্রোতের তোলপাড় দেখে
ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
সদ্যস্নাত জারুল গাছটি দেখলে ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
এই মাত্র একটা শালিক ঠোঁটের ঝাপটানিতে
এক টুকরো খড় ফেলে গেল ভালোবাসার মতন
কিছু একটা টানে, সব সময় টানে
ভেতরে-বাইরে শোনা যায় আসছি আসছি শব্দ
একটা বোতাম ছিঁড়ে গড়িয়ে যায় অন্ধকারের দিকে
চশমাটা পড়ে আছে বারান্দায়, সে যেন কাকে দেখছে

একটা ছায়া-ছায়া নির্জন রাস্তা দেখলে
ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
দূর একটি টিলার ওপরে লুপ্ত মন্দিরের মতন মিশে আছে

ভালোবাসা
মনে পড়ে, মনে পড়লেই বুঁজে আসে চোখ
জ্বলতে থাকে আগুন!

মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের সামনে

হামবুর্গ শহরের অদূরে অটোবানে সংঘর্ষ হল দুটি গাড়ির
একটি গাড়ি থেকে ছিটকে, লণ্ডভণ্ড হয়ে সাত হাত দূরে গিয়ে পড়ল
উড়িষ্যার একটি নারী
গাঢ় নীল রঙের শাড়িতে রক্ত, প্রতিমার মতন ভুরু-আঁকা, স্বর্ণময় মুখখানি
ডুবে গেছে ঘাসে
আকাশ তখন বর্ষণ করছে অন্ধকার, মাটিতে তৈলাক্ত আগুন
নিস্পন্দ শরীরে শুধু ছটফট করছে দুটি পা
উড়িষ্যার রমণীটির বিলীয়মান চেতনার রেশ রয়ে গেছে দুটি পায়ে

ময়ূরভঞ্জের এক বাগানে খেলা করত এক কিশোরী
পুকুর থেকে উঠে এসে জল ছাপ দিতে দিতে সে চলে যেত বাথরুমে
ঐ পায়ে
কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতন তার পায়েও সহজাত ঘুঙুর
ভোরে ফুল তুলতে এসে তরুণ সূর্যকে সে দেখাত তার অঙ্গ বিভঙ্গ
তার আঙুলে লীলাকমল, স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে লোধ্র-লাস্য
একদিন সে কোনারকের সুরসুন্দরী হয়ে উঠে এল মঞ্চে
তারপর মঞ্চ তার পৃথিবী
তার পায়ের ছন্দে রচিত হল মন্ত্র
তার কোমরের খাঁজে সাপের মতন জড়িয়ে রইল সুর
তার দুই স্তনের মাঝখানে দোলে ত্রিতাল

উড়িষ্যার সেই মেয়েটি জার্মানির অট্টহাসময় জীবন থেকে
একটি জ্বলন্ত উল্কার মতন ছিটকে পড়ল রাস্তায়
এখনো একটু একটু কাঁপছে তার দুটি পা
সদ্যোজাত বাছুরের থুতনির মতন তার গোড়ালি
কোজাগরী রাতের লক্ষ্মীর মতন তার পদতল
অসংখ্য চুম্বনযোগ্য পদপল্লব যেন রাঙা ভাঙা চাঁদ জড়ানো

সূর্যাস্তের প্রথম ঝলকের মতন তার চোখের রং
তার দুটি পা, তার দুটি পা
মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের সামনে এসে...

ওঠো, কন্যা, ওঠো!

প্রতিদ্বন্দ্বীরা

আমি বন্দুক-পিস্তল ছুঁইনি কখনো, কিন্তু কোনো একসময়
নিশ্চয় আমার হাতে একটা তলোয়ার ছিল
মাঝে-মাঝে আমার ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, বাঁ হাতটা পেছনে নিয়ে
আমি একটু ঝুঁকে দাঁড়াই
তখন কারুকেই আমার ঠিক যোগ্য প্রতিপক্ষ মনে হয় না।

পুরনো তলোয়ারখানা ঝুলে আছে ভাঙা বাড়িটায়
সিঁড়ির পাশের দেয়ালে
টিকটিকি পেচ্ছাপ করে দেয় তার ওপর
খাপখানা মর্চে পড়ে ঝুরঝুরে
নিলামওয়ালা প্রায়ই এসে ঘুরে যায়, ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন আর
রেলিঙের কাস্ট আয়রনের কল্‌কাগুলো দেখে
আমি নিজের ডান হাতখানার দিকে তাকাই
চামড়ার নিষ্কলুষ, আঙুলের গাঁটে গাঁটে ঠিকঠাক জোর আছে
এখনো তুলে ধরতে পারি না এই অসিখানা?
কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোথায় গেল? তারা কি লুকোলো
মিছিলে কিংবা ফাটকাবাজারে
হঠাৎ অন্তরীক্ষে শুনতে পাই একটা ওঁ শব্দ, কিসের যেন প্রতিধ্বনি
বনজঙ্গল ও মরুভূমি আমাকে এক পলকের জন্য দেখায় বিশ্বরূপ
তখনই টের পাই আমি অনেক আগেই হেরে ভূত হয়ে আছি স্বেচ্ছায়
বাতাসের ঝাপটা লাগে মুখে, আঃ, হেরে যাওয়ার মধ্যেও
এত আনন্দ...

নিজের মাথার বালিশ

তুমি দেশের জন্য প্রাণ দিও না, দেশ-টেশ সব বাজে কথা
দ্যাখো, অন্ধকারের জাদুকর কাচপোকার টিপ দিয়ে
মোহর বানাচ্ছে
পায়রাগুলো ইঁদুর হয়ে ঢুকে যাচ্ছে গর্তে
দ্যাখো, রক্তের নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা হাঁস, তার গায়ে
একটা ছিটেও লাগেনি

দ্যাখো, কালকের শেয়াল হঠাৎ আজ কী করে হয়ে গেল বেড়াল
ওদের কোনও দেশ নেই
নারীর গর্ভে যখন ভ্রূণ হয়ে ফুটেছিলে, তখন তোমারও কোনও
দেশ ছিল না

সার সার অন্ধ ফৌজ কুচকাওয়াজ করছে পাহাড় সীমান্তে
ওদের অস্ত্রগুলো কোনও দেশ চেনে না
মৃত্যুও কোনও দেশকে চেনে না
তুমি চোখ মেলেছিলে প্রকৃতির মধ্যে, প্রথম দেখেছিলে আকাশ
তুমি জীবনের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, বাজে কাগজের ঝুড়িতে
ফেলে দিও না তোমার প্রাণ!

কত রকম রঙ গুলে লেখা হয়েছে দেশাত্মবোধক গান
সেই সব গানের উন্মাদনায় চাঙ্গা হয়েছে ছুরি-বন্দুকের কারখানা
হাওয়ায় উড়ছে মৃত্যু-ব্যবসায়ীদের হাসির ফুলকি
যারা লালকেল্লার মাচায় দাঁড়ায়, যারা মনুমেন্টের নীচে
দেশের নামে গরম গরম থুতু ছেটায়
যারা ভবিষ্যতের চোখ ধাঁধানো স্বপ্ন দেখিয়ে তোমার প্রাণ বলি চায়
দ্যাখো, তারা কত যত্নে মুড়ে রাখে নিজেদের জীবন
তাদের সন্তান-সন্ততিরা থাকে দুধে ভাতে, তোমার বংশধরেরা
হা-ঘরে হয় হোক

তুমি রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে তোমারই মতন একজনকে
মারলে কিংবা নিজে মরলে
ওখানে কোনও দেশ নেই
তুমি এক মিছিলে থেকে আর একটা মিছিল ভাঙতে গিয়ে
ছিন্নভিন্ন শরীরে লুটিয়ে পড়লে মাটিতে

ওখানে কোনও দেশ নেই
যারা হাততালি দিয়ে তোমাকে বলছে, যাও, যাও, আগুনে ঝাঁপ দাও
তারা একটু পরেই চলে যাবে ফুলের বাগানে
তুমি প্রাণ দিও না, নিও না, দেশ-টেশ সব বাজে কথা
মৈত্রেয়ীর প্রগল্‌ভতার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য কী বলেছিলেন মনে নেই?
সামান্য একটা দেশের জন্য তুমি পৃথিবীকে ছাড়বে কেন
নিজের বিছানার প্রিয় মাথার বালিশটার কথা মনে পড়ে না?

শব্দ ভাঙে

এমন বাড়ি, দেওয়াল ভরা গর্ত
সবাই আছে জেগে
এখানে কাঁপে ইহকালের মর্ত্য
প্রবল ঘূর্ণিবেগে।

সুন্দরের বিসদৃশ আয়না
ঘুরছে হাতে হাতে,
অলিন্দের আড়ালে কেউ যায় না
স্তব্ধ মধ্যরাতে।

ধুলোয় ফুল, আকাশমুখী শিকড়
বাগান এত দীন
জীবন থেকে ভালোবাসার শিখর
জনসভায় লীন।

কথার ঝড়ে কে যে কাকে থামায়
কে কোন নামে ডাকে
শব্দ ভাঙে, শব্দের ঘুম আমায়
টানছে কুম্ভীপাকে।

উদ্যত ছুরি

অনেকখানি খোলা আকাশের নীচে, মেঘলা, একলা
তুমি
শেষ কবে বসেছিলে?
তেমন দিন মনে পড়ে না?
ওগো অমৃতের পুত্র,
তোমার সারা গায়ে ডিজেলের ধোঁয়া
আর কারখানার কালি!
নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাপাদাপি করেছো কোনোদিন?
করো নি?
নামো নি নদীর জলে?
ওগো আদমের আত্মজ,
তোমার শরীরে এখন ক্লোরিনের গন্ধ
তোমার পোশাক থেকে ঝুরঝুর করে
খসে পড়ে
ব্লিচিং পাউডার!

নিজের হাতে
একটা গাছ কখনো
পুঁতেছো মাটিতে?
ছিঃ, সারাজীবন ধরে এত ফলমূল খেয়ে এলে
তার ঋণ শোধ করলে না?
বাতাসের কাছেও তুমি ঋণী
তুমি বাতাসকে হত্যা করতে চেয়েছো
সবুজ আলোর মতন অরণ্যগুলি তুমি সৃষ্টি করোনি
ধ্বংসে মেতে উঠেছো
তুমি বুনো ফুলের ঝাড়ে আগুন লাগিয়ে
সেখানে বসিয়েছো ইঁটভাটা
তুমি নিসর্গের সঙ্গীত
ঢেকে দিয়েছো হাজার রকম চাকার শব্দে
ওগো স্বায়ম্ভুব মনুর সন্তান
একটু থামো
একবার তাকাও নিজের দিকে
তোমার হাতে উদ্যত ছুরি
সেই বিদ্যুৎবর্ণ মোহময় ছুরি তুমি বসিয়ে দিতে চলেছো
তোমার আপন প্রপৌত্রের বুকে!

ডানা-বদল

সকাল বেলায় সেই দূত এলো আমার কাছে
বললো, সময় হয়েছে, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে
নিয়ে যাবো, একটু ঘুর পথে যেতে হবে
আমি তাকে বললুম, বৎস, একটু বসো
এখনো দ্বিতীয় কাপ চা খাওয়া হয়নি
বাইরে কী বিষম বৃষ্টি, ঝড় উড়িয়ে নিচ্ছে দিগন্ত
এরকম সময়ে বিমানও ওড়ে না
তোমার ডানা গুটিয়ে বসো এ চেয়ারে!
এসো বরং কিছুক্ষণ তিন তাস খেলা যাক
সঙ্গে কিছু খুচরো এবং ক্যাশ আছে তো?
মানুষ এসব সঙ্গে নিয়ে যায় না জানি, তবু
খেলতে ক্ষতি কী?
কিংবা চলো একটু পায়ে হেঁটেই ঘোরা যাক শহরে
তুমি ও আমি দৌড়োলে
কে জয়ী হয় তা দেখতে হবে
তুমি ওপারের দূত বলেই যে বেশি সুবিধে পাবে
তা ভেবো না!
চলন্ত বাসের পাদানিতে তোমার ও আমার মধ্যে
কে আগে পা রাখতে পারে
সে খেলাটি কি তোমার পছন্দ?
তুমি আমার কাঁধে চড়লে আমি তোমাকে নিয়ে
ডিগবাজি খাবো
অথবা যদি পুকুরে সাঁতারের খেলা খেলতে চাও
তুমি ডুবে গেলে আমি টেনে তুলবো
আমি সাপের ছোবল খেতে খেতে ছুঁড়ে দেবো
তোমার গায়ে
ওগো দেবদূত, তোমার মৃত্যুভয় নেই, তাই মুখ
এমন নিষ্প্রাণ বরফের মতন সাদা
রাস্তায় হঠাৎ হল্লা ও সোরগোল উঠলে
দৌড়োবার কী মধুর রোমাঞ্চ, একবার দেখে যাও অন্তত
আমাদের দুজনের খুনসুটি
সন্ধ্যে বেলায় ফর্সা আলো এনে দেবে!
আমরা দুজনে একসঙ্গে যাবো একটি নারীর কাছে
ওহে তুমি বেশি সুযোগ নিও না।

অলৌকিক ঐশ্বর্য দেখিও না, খুঁজে রাখো গজমতির মালা
ছদ্মবেশ ধরো, ঠিক আমার মতন, যেন আমার যমজ
তারপর দ্যাখো সে কার দিকে চেয়ে হাসে,
কাকে দেয় আঙ্গুলের স্পর্শ
তার বেশি কিছু চেও না, তুমি বন্দি হয়ে যাবে
আমি পথ খুঁজে পাবো না একা
দ্যাখো এই সেই নারী, এই মায়া, এই ভালোবাসার মোমপুত্তলী
শুনতে পাচ্ছ ঝর্ণার শব্দ?
তোমার কপালে কেন ঘাম, কান কেন রক্তিম?
দেবদূত, দেবদূত, সময় হয়ে গেছে
থেমে গেছে বৃষ্টি, আকাশে এখন হীরক দ্যুতি
তুমি কি মেতেছো খেলার নেশায়
আঙুলের স্পর্শের বেশি আর চাও আগুনের শিখা
সে আগুনে পুড়ে যাবে তোমার ডানা
চতুর্দিকে ফুটে উঠবে কুর্চি ফুল
দেবদূত, তোমার চোখে জল কেন
আমি তো তৈরি হয়েছি
এই দ্যাখো খুলে ফেলেছি সব মোহ
এই দ্যাখো বিদায় দিয়েছি সব বাসনা
আর দেরি নয়, আর দেরি নয়
সব কিছু অসমাপ্ত না রেখে গেলে
কোনো সুখ নেই, চলে যাওয়ার উত্তেজনা নেই
তুমি এখানে নির্বাসনে থেকে যাও
থাকো, থাকো, ধুলো থেকে খুঁটে খেতে শেখো
জুতো মুখে করে নিয়ে যেতে কেমন অপমান লাগে
একবার দ্যাখো
প্রেমিকার ঠোঁটে মুখ দেবার মুহূর্তে কে
বজ্রমুষ্টিতে টেনে ধরবে তোমার চুল
একবার বুঝে নাও, চোখের জল চাটো
আমাকে খুলে দাও তোমার ডানা
আমি শূন্যে উড়ে যাই!

অপু

অতসী ফুল-রঙা ভোর, দূরবীনের উল্টো পিঠ দিয়ে
দেখার মতন ছোট্ট রেল স্টেশান
ট্রেন চলে গেল এই মাত্র, হাতে একটা ব্যাগ, প্ল্যাটফর্মে
আমি
আর কেউ নেই, পাশের আবছা লাল রাস্তাটাও নীরব
আমার কোথাও যাবার তাড়া নেই
ক্রমশ আমার বয়েস কমতে থাকে, রোগা-পাতলা
হয়ে আসে শরীর, ছবির মতন জামা-প্যান্ট
বদলে যায়, হু-হু করে ছোট হতে হতে
একলা আমি, মনে হয় আমিই অপু
দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছি কেন, চোখ ফেটে
জল আসছে
এখানে কেউ আমাকে দেখছে না
একদিকে মা, অন্যদিকে বস্তুজগত আমাকে টানছে।

সে আর ফিরলো না

কাঠের আগুন নিবু নিবু, গোল হয়ে ঘুমে হেলে পড়েছে সবাই
ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই
শীতের আকাশ থেকে খসে পড়ছে একটি তারা, ঘুরতে ঘুরতে
থেমে গেছে সব গান, একতারা-মৃদঙ্গের ওপর খেলা করছে বাতাস
এই নীরব শূন্যতার মধ্যে নদীর ধারে
জল ফেরাতে গিয়েছিল
এক কন্যা
সে আর ফিরলো না।

কে আর তাকে মনে রাখবে
দু' বছর পাঁচ বছর বড়জোর
আকাশে কোনোদিন মালিন্যের দাগ পড়ে না
আকাশের বয়েসও বাড়ে না
শুধু এক বাজে-পোড়া তালগাছ অন্তরীক্ষের সঙ্গে

কথা চালাচালি করে
একজনের বিছানায় অন্য কেউ এসে শোয়
বালিশে অশ্রুর দাগ
এবারের বর্ষায় নদীর জলে খেলা করে চাঁদ
নদীও তাকে মনে রাখেনি!

শুকনো ঘাসে চচ্চড় শব্দ হচ্ছে
এমনই ক্রোধের মতো রোদ
তারই মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কুন্দকলি
আকাশ থেকে খসে-পড়া নক্ষত্রটির প্রতিবিম্ব...

সাদা দেওয়াল

সাদা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কি নিজেকে প্রশ্ন
করে না
কোথায় সাদা দেয়াল? সব দেয়ালে রক্তের ছোপ!
খবরের কাগজের কালো অক্ষর থেকে গড়িয়ে পড়ে রক্ত
মানুষের বুকে মানুষ ছুরি বসাচ্ছে, এই তো প্রতিদিনের
ইতিহাস
দূরপাল্লার ট্রেন ছুটে যাচ্ছে, হঠাৎ কেউ উপড়ে নেবে
লাইন
জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে চোখে পড়ে হরিৎ প্রান্তরে
জীবন নিয়ে আপ্লুত চাষা ও তার মস্থর বলদ
বাজপোড়া গাছটিতে বসে আছে বহুবর্ণ মাছরাঙা
শান্তশিষ্ট জলাভূমিতে মেঘের ছায়া
সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেতে দোল খাচ্ছে সবুজ ঘাস ফড়িং
ট্রেনের যাত্রীরা কেউ ঝালমুড়ি খাচ্ছে, কেউ ডুবে আছে
রহস্য কাহিনীতে,
কারুর কারুর চোখে আঁকা বালকের কৌতূহল
তবু এই সুন্দর ও চিরাচরিতের মধ্যেও রয়ে গেছে রক্ত-
লোলুপের দল
রথী মহারথী যাঁরা ঘুমোচ্ছেন এখন বাড়িতে, তাদের
রক্তগরম করা কথায়
যখন তখন প্রাণ দিতে পারে দু-দশটি মানুষ

সব মানুষই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব যারা বলে, তারাও
মানুষ মারে
মানুষ মানুষকে মারে, আর কেউ না। মানুষই
মানুষকে মারে
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব সাদা দেওয়াল
যারা অপরকে কষ্ট দিয়ে অনেক কিছু ভোগ করে যায়,
তারা
জীবনে অন্তত একটা সুখের সন্ধান কক্ষনো পাবে না,
অপর অচেনা একজন মানুষকে সুখী করার নির্মল
আনন্দ!

মালা

আমার নিজস্ব শূন্যতা একটা মালা হয়ে দুলছে
একটি মালা,
একটি মালা, আমার স্বপ্নের সারাৎসার
রেখা, রং ও আয়তনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে আমার শূন্যতা
তুমি নাও...

ছবি

শালিক পাখিটি বললো, ওঠো
দেয়ালের টিকটিকি বললো, ও অনেক রাত্রে ঘুমিয়েছে
জাগিও না
বালিশের নীচে বই, ঘড়ির মতন থেমে আছে
জানলায় বিন্দু বিন্দু জল
আড়মোড়া ভাঙে রাজপথ, কড়-কড়াৎ শব্দে যায়
তরকারির গাড়ি
একটি মেঘ নিচু হলো, অন্য মেঘ দেশান্তরে গেল
বিছানাকে সমুদ্রের মতো করে ভেসে থাকে

সহাস্য কৈশোর ছেড়ে সদ্য আসা দুঃখের যুবতী
ঠোঁটে তার কান্না লেগে আছে
হাতের আঙুলে হাওয়া বললো তাকে, জাগো
দেয়ালের আয়না বললো, থাক
রোদ্দুরের রং বললো, ঘুমের মধ্যেও ওর ঠোঁট কাঁপছে,
ছাপার অক্ষর বললো, কাঁপুক, কাঁপুক
আমি আছি!

কে কাকে টানছে

সিমলে পাড়ার ছেলে নরেন যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে
হাটখোলার মোড়ে দুই নাটুকে মাতালের সঙ্গে তার দেখা
অমৃতলাল আর গিরিশ, রাত কাটিয়েছে বিনোদিনীর বাড়িতে
নিদ্রাহীনতায় ও নেশায় এখন চারটি চোখ লাল
বীয়ার পান করতে করতে গিরিশের ঠাণ্ডা লেগে গেছে, তাই
স্যাণ্ডাৎকে দিয়ে ঝট করে আনিয়ে নিয়েছিল বী-হাইভ ব্র্যান্ডি
তখন হুইস্কি ছিল ঘোড়ার ওষুধ, বনেদী মদ্যপায়ীরা ছুঁতো না
রাজনারায়ণ দত্তর ছেলে, কেরেস্তান কবি মাইকেল মধুর দেখাদেখি
সিগারেট টানা ইদানীং ফেসিয়ান হয়েছে
অমৃতলালের মুখে সেই আগুন, গিরিশের ঠোঁটে পান
নরেনকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো দু'জন
গিরিশ খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললো, আরে আরে অত হনহনিয়ে
কোথায় চললে ভায়া, ডুমুরের ফুলটি হয়েচো, দেখাই পাই না।
আজ পেয়েছি, আর ছাড়চিনিকো, চলো যাই, বিনির বাড়িতে ফিরি,
তোমার গান শুনবো, দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলের গানও নাকি তুমি গাইচো
কেমন সে গান, রসে টইটম্বুর না ধর্মে মাখো-মাখো?

নরেন একটুক্ষণ হাস্য-পরিহাসের পর বললো, হাত ছাড়, গিরি, যাচ্ছি
দক্ষিণেশ্বর, এখন সময় নেই
গিরিশ ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, সেই পাগলা ঠাকুরটার কাছে?
সে তোকে কী দেয়?
চাকরি দেবে? সংসারের অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা ঘুচোবে?
ওসব বুজরুকি ঢের দেকিচি ভায়া, ওসব ছাড়ো, সুসময় অযথা বয়ে যেতে

দিও না। নরেন রাগ করে বললো, তুই শালা স্টেজে মাগী নাচাস,
তুই এসবের কী বুঝবি?
গিরিশও প্রমত্ত কণ্ঠে বললো, কী, আমি বুঝি না?
চৈতন্যদেবের নামে পালা নামাচ্ছি, দেখবি কেমন ফাটাবো
ভক্তির বন্যা বইবে, অডিয়েন্স কান্নার সমুদ্রে ভাসবে!
চল, মহলা দেখবি, আজই তোকে আমরা চাই!
নরেন বললো, তুই চল দক্ষিণেশ্বর, তোকেও আমরা চাই!
গিরিশ নরেনকে টানছে বিনোদিনীর দিকে, মঞ্চের ফুটলাইটের দিকে
নরেন গিরিশকে টানছে গঙ্গার উত্তর কূলে, পঞ্চবটীর প্রাঙ্গণে,
দিনের আলোর উৎসবে
কেউ কারুর হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে না,
তবু বিপরীত দিকে সমান টান
হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা নগর কলকাতা একাগ্র হয়ে দেখছে এই দৃশ্য
একদিকে মোহময় প্রমোদ, অন্যদিকে রসে-বশে মুক্তি
একদিকে শিল্প ও আত্মক্ষয়, অন্যদিকে ত্যাগ ও পরার্থপ্রিয়তা
খুবই মৃদু ও অসম্ভব জোরালো এই পারস্পরিক আকর্ষণ
কেউ জিতবে না, কেউ হারবে না
এক সময় হ্যাঁচকা টানে এ ওকে বুকে জড়িয়ে নেবে...

অধরা

দু'আঙুলে নুন তোলার মতো একটুখানি
তাতেই যেন ঝিলিক দিল আঁধার ঘরে মানিক।
*
রাস্তা ভরা গুল্ম কাঁটা, কমলবনে সাপ
তারই মধ্যে দেখি তোমার পায়ের জলছাপ।
*
নদীর ধারে শুয়ে থাকার রাত্রি শেষ, ভোরে
নীলরুমাল, শিশিরপাত, ঘাসফড়িং ওড়ে।
*

ধুলোর থেকে কুড়িয়ে নিলে হলদে পাখির পালক
ধুলোর মধ্যে হাসির ছটা, জলের মধ্যে আলো।

*

এক পলকে ভাঙলো কিছু, কেউ বলেনি কথা
শব্দ ঘুম, শব্দ জানে অন্য নীরবতা।

থেমে থাকা যাত্রী

শালুক-বিল ইস্টিশানে থেমে রইলো রাতের রেলগাড়ি
আমরা যারা হিল্লি-দিল্লি দিচ্ছিলাম পাড়ি
একটি নয়, দুটিও নয়, সাত ঘণ্টা দেরির
অস্থিরতায় জ্বলে উঠলো শরীর
ছেঁড়া কাঁথার মতন কিছু অন্ধকার, ভূতের মতন কয়েকখানা তাল
গাছ ছাড়া আর কিছুই নেই, দিকশূন্য দূরের চক্রবাল
মেঘ খেয়েছে চাঁদ, আকাশ জুড়ে শুধুই ছাই
সব কিছুই অনড়, তবু বাতাসে যাই যাই।

কামরা থেকে নেমে একটু জুড়োই মনস্তাপ
গর্ত ভরা বর্ষা, পাশে ফুঁসে উঠলো সাপ
যাঃ যাঃ বলে সরে গেলাম, ঝোপের ধারে খানা-
খন্দ এবং গত রাতের মৃতপশুর গন্ধ, আর হয়তো রাতকানা
পাগল একটা রয়েছে উবু হয়ে
নষ্ট-ঘুমে এই সমস্ত সয়ে
হঠাৎ ভাবি, যদি আমি হতাম কোনো সশস্ত্র বিপ্লবী
ভিয়েতনাম বা বোলিভিয়ার, নয় সামান্য কবি
হাতে একটা মেশিন গান, মাথার মধ্যে পবিত্র এক ক্রোধ
ট্রেন ডাকাতি-ফাকাতি নয়, বরং যারা এমন গতিরোধ
করেও যে-যার ঘরে ঘুমোয়, তাদের গৃহস্থালি
লণ্ডভণ্ড করে দিতাম গুলির ঝাঁকে, শুধুই জোড়াতালি
দিয়ে যারা দেশ চালাচ্ছে তাদের মুখে দিতাম দুই লাথি
এবং আমার সঙ্গী হতে সুনিশ্চিত পেতাম অনেক টনকো-যুবা সাথী।

রাত্রি জাগা বিরক্তিতেই মাথায় ঘোর চিন্তা এই সমস্ত
আসল যারা বিপ্লবী, সব ঘর গুছোতে ব্যস্ত

যে-যার পাতে ঝোল টানছে, শুরুৎ শুরুৎ শব্দে কান ফাটে
যারা স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তাদের কেউ নেই কোনো তল্লাটে
আমি নিছক শব্দ ছানি, কলম দিয়ে ছেটাই শুধু কালি
নিজের মুখেও লেগেছে তা, তবুও দিই নিজেকে হাততালি
যাকগে ওসব, যা চলছে তাই চলুক আমার কিসের মাথাব্যথা
মাথাটাকে ফাঁকা করাই এখন আসল কথা
বরং অন্ধকারের ঐ বিড়ি ধরানো পাগলটার পাশে
খানিক গিয়ে বসাই ভালো, পাগলরাই আসল সৎ, অবিচলিত
সকল সর্বনাশে!

সুন্দরের মন খারাপ

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর
অন্ধকারে ফুলকি ওড়ে, বারুদ মাখা ঝড়
চতুর্দিকে এত পাখির ভাঙা কণ্ঠস্বর

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর
নদীকে খায় শুকনো পথ, প্লাবনে ভাসে ঘর
মলিন রঙ, লীন রেখা, ক্লিষ্ট অক্ষর

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর...

সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া, নির্জন বিমান

বিকেলের সাদা মেঘে নির্জন বিমান
ভেসে যায়
রায়চৌধুরীদের ভাঙ্গাচোরা পুকুরঘাটের শেষ ধাপে
ছোট বউ পা ধুচ্ছে, দুঃখী কুমারীর মতো পা
বিমানের ছায়া তাকে খায়।

সাদা মেঘ, নির্জন বিমান, সাদা হাওয়া
কেউ কেউ দ্যাখে
অনেকেই দেখতে পায় না, যে রকম নলহাটির বামন বৈরাগী
লাল ধুলোর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, একা একতারায়
বেজে ওঠে স্বরের পঞ্চম
হঠাৎ বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে বাপ-পিতামহ
শিংশপা গাছে দুলছে যম।

এখানেই ছিল বাচ্চা বয়সের গুপ্ত খেলাঘর
চিহ্ন পড়ে আছে
মালবিকা শুয়ে ছিল, প্রথম মেয়েলি ঘ্রাণ তুলে দিল হাতে
চূর্ণ চূর্ণ ভালোবাসা আগাছা-ফুলের থেকে রেণু
আগুনের সঙ্গে চেনা হলো
জলের ভেতরে যুদ্ধ, আগুনে ও জলে
এখানেই বার বার হেরে যাওয়া, বার বার জয় অভিযান
এখন অস্পষ্ট কিছু ছায়া
সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া, নির্জন বিমান।

আবছায়াময় কেল্লার মাঠে

না-লেখা কবিতাটির একটি শব্দ হারিয়ে গেল আজ বিকেলবেলা
যেমন ভাবে মহাকাশে নিরুদ্দেশে যায় অন্তরীক্ষের নাবিক
কিংবা একটা ঘাসফুলকে না ছুঁয়েই উড়ে যায় প্রজাপতি
কিংবা একটা ঢেউ তীরের কাছে পৌঁছোবার আগেই ভেঙে যায়
সেই মুহূর্তে সেই শব্দটিই আমার জীবনসর্বস্ব, তাকে না পেলে
আমি কোথায় যাবো?
রাস্তায় এত মানুষের ভিড়, কেউ বুঝবে না আমার কী খোয়া গেছে
একটি শব্দ, একটি মাত্র শব্দ, চার অক্ষরের
হে বৃষ্টি-ভেজা মাদক বিকেল, তুমি কেন তাকে হরণ করলে?

তখন আমি সেই বিকেলের নামে মামলা দায়ের করি
দেবী সরস্বতীর আদালতে
হংসেশ্বরী হয়ে তিনি বীণা হাতে নিয়ে বসে আছেন

রাজভবনের পেছনের পটভূমিকায়
অনবরত ট্রামের কর্কশ আওয়াজ ও বাসের বিশ্রী ধোঁয়া তিনি মুছে দিলেন
হাতের এক ইঙ্গিতে
পূরবী রাগিণীর সুরে তিনি হাসলেন
নিজেকে সুন্দর রাখার চেষ্টায় তিনি এতই ব্যস্ত যে শুনলেন না
কোনো আর্জি
বিকেলটিকে বেমালুম খালাস করে দিয়ে তিনি বললেন, সমুদ্রে যাও
আমাকে বললেন, তুমিই তো আসল আসামী, নাও দণ্ডাজ্ঞা
চার অক্ষরের বদলে তোমাকে সেই তিন অক্ষরের
শব্দটি বসাতে হবে, মনে আছে?

হঠাৎ বজ্রের গম্ভীর গর্জন, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আর
আসন্ন অন্ধকার শূন্য করে দেয় জন পদবী
আমি একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, কৈশোরের ছবি ভেঙে যায়
সেই তিন অক্ষর? কোন্ তিন? মধ্যে যুক্ত বর্ণ আছে কি?
ছন্দ ভেঙেও বসানো যায়?

না-লেখা কবিতাটি একটি জোনাকি হয়ে উড়তে থাকে
আবছায়াময় কেল্লার মাঠে...

সীমান্ত কাহিনী

এই পাহাড়ের আড়ালেই একটা অন্যদেশ
সে কথা কি ঐ পাহাড় জানে?
জঙ্গল ছিঁড়ে খুঁড়ে নেমে এসেছে এক পাগলা ঝোরা
সমতলে গিয়ে সে নদী হবে
তারও ঠিক মাঝখান দিয়ে ভাগ হয়ে গেছে
দু'দেশের সীমানা
পাগলা নদীটি তা কিছুই জানে না
গাছগুলি পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করে উঠে যায় আকাশের দিকে
তারা মাধ্যাকর্ষণ মানে না
তারা সীমান্তরক্ষীদেরও চেনে না
একটা অন্ধকার খেলা করে আলোর মধ্যে

আর অন্ধকারকে ধরে রাখে এক বিন্দু আলো
একটা বাতাস পাখিদের নিয়ে যায়
একটা পাখি ঝড়কে সঙ্গে করে আনে...

নদীতে ভাসে তৃণখণ্ড, ডালপালা, কাঁটা ঝোপের ফুল
পাশ দিয়ে হেঁটে আসে মানুষ
রোগা মানুষ, ন্যুব্জ মানুষ, শিশু মানুষ, শিশুর জন্মদাত্রী মানুষ
হাঁটু ভাঙা মানুষ, চামড়ায় শ্যাওলা জমা মানুষ
নীরব, সন্ত্রস্ত, উদরে খিদের মশাল-জ্বলা মানুষ
তাদের মাথার ওপরে ইতিহাসের বাতাস
তাদের পায়ে পায়ে প্রাগৈতিহাসিক যাযাবরদের
পথভ্রান্ত ভুলছন্দ
তারা পিছনে তাকায়, তারা সামনে দেখতে পায় না
তাদের অতীত ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে
তাদের ভবিষ্যৎ নেই
বৃক্ষগুলি স্থির, বাতাস এখন বন্ধ,
মাটিতে কোনো আভা নেই, আকাশে নেই দ্যুতি
এরই মধ্যে দিয়ে আসছে কালো কালো রেখা ও বিন্দুর মতন মানুষ
মানুষের কাছে পরাজিত মানুষ
পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে ছন্নছাড়ার দল
এক সময় তারা অবসন্ন হয়ে থামে
ত্যাড়াবেঁকা পুতুলের মতন ঘুমিয়ে পড়ে...

যেখানে শূন্যতা ছিল, সেখানে গড়ে ওঠে বসতি
সেখানে রাত্রিগুলি দিন হয়, দিন থেকে রাত
সেখানে জন্ম-মৃত্যু ছেলেমানুষের মতো
হঠাৎ হঠাৎ আসে যায়
সেখানে হাসির মধ্যে খেলে যায় কান্নার বাতাস
কান্নার মধ্যে মিশে যায় হাসির জলপ্রপাত
সেখানে খুদকুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয় পরমান্ন
সেখানে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শিশু মহানন্দে পান করে
স্তন্যের বদলে ধুলো মাখানো স্নেহ
তারই মধ্যে এক একদিন বন কাঁপিয়ে আসে বনের রাজা
কুঠার হাতে আসে কাঠ ব্যবসায়ীরা
রাইফেল হাতে নিয়ে আসে মানুষ শিকারি দল
ট্রাক বোঝাই করে কেউ কেউ নিতে আসে যাবতীয় মূল্যবোধ

বিদ্যুৎ তরঙ্গে কথা চালাচালি হয় এদেশ থেকে ওদেশে
প্রকৃতি বিশেষজ্ঞদের মাথাব্যথার কাহিনী ছাপা হয়
সচিত্র, নানা রকম ভাষার খবরের কাগজে
রাজনীতির রঙ্গকর্মীরা উচ্চাসনে উঠে গলা ফাটান
কেউ কেউ সন্ধের দিকে চুপি চুপি আসেন
গণতন্ত্রকে আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কাগজের বেলুন বানাবার জন্য
আবার এইসব কাগজপত্র ছিঁড়ে খুঁড়ে কিছু কিছু নারী
চলে যায় মরুভূমির দেশে
একাধিক রাজধানীতে দাবি ও প্রতিবাদ লোফালুফি হয়
হঠাৎ ছুটে আসে ঘূর্ণিঝড় কিংবা বন্যার ঢল
শকুনের মতন মাথার ওপর ঘুরতে থাকে আকাল
কিংবা সবার অজান্তে এসে পড়ে বুনো হাতির পাল
তাদের সারল্যমাখা মুখে কোনো হিংসে নেই
তাদের বাৎসরিক পথ খুঁজে নেওয়া পায়ে কোনো ধ্বংস-সাধ নেই
তবু সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে তারা দূরান্তে মিশে যায়...

নদীর ধারে পড়ে আছে দু'একটা ছেঁড়া কাঁথা
ভাঙা শানকি, তোবড়ানো টিনের গেলাস, খুঁটি বাঁধার দড়ি
আর কেউ নেই
শূন্যতাকে গ্রাস করেছে শূন্যতা, ঝিমঝিম করছে স্তব্ধতা
গাছ থেকে খসে পড়ে পাতা, শিকড়গুলি নামে আরও গভীরে
অরণ্য জেগে আছে অরণ্যের নিয়মে
পাগলা ঝোরার জলে শুধু প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে
একটা আলো, একটা অলৌকিক আগুনের ছায়া
মানুষের উদরের খিদের মশাল...

দরজার আড়ালে

দরজায় ঝনঝন শব্দ হলে ছুটে যাই
বাইরে কে?
অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু, না কোনো ফেরিওয়ালা?
অস্পষ্ট আলোয় ঠিক চিনতে পারি না
একটুখানি হাসিমাখা মুখ

এ কি বহুকালের দূরত্ব না জামরুল গাছের ফুল
এখানে অন্ধকার থাকার কথা নয়, তবে কি চশমার ধুলো
আমি যাকে চিনতে পারছি না, সেও আমাকে চেনে না?
দরজার বাইরে তুমি কে?
ঝনঝন শব্দে আনন্দের ঘূর্ণি উঠেছিল আমার শরীরে
যেন ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার ছুটে গিয়ে দেখার কথা
একটু ফাঁক করা আড়াল, অথচ এত সুদূর
কোনো এক ঝড়—গোধূলিতে হাত ছাড়াছাড়ি হয়েছিল কারুর সঙ্গে?
বাচ্চারা খেলছে নীচের উঠোনে, পাখির মতো তারা হাসছে
সিঁড়ি অদৃশ্য হয়ে গেছে। মুছে যাচ্ছে পেছনের দেয়ালগুলো
শুধু একটা দরজা, এ পাশে আমি
ও পাশে তুমি কে?

রূপকল্প

দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া রাস্তার ধারে দু'হাত তুলে
ডাকছে একটা গাছ
একজন বন্দি মানুষ জল চাইছে?
ফিরে যাওয়া যায় না
মিলিয়ে নেওয়া যায় না রূপকল্পটা
কচুরিপানার ওপর মৃদু বাতাস
এক নৌটাঙ্কির নর্তকী উরু ধুচ্ছে ওখানে
তার খলখল হাসির শব্দ নিয়ে
উড়ে গেল এক ঝাঁক শালিক
কাঁটা বাবলা ঝাড়ের তলায় কার
একটা ছেঁড়া জামা
একটা অকেজো বাঁশি
ওখানে গুপ্ত ধনের মতন রয়েছে এক
ট্র্যাজিক কাহিনী
যদি ফিরে যাওয়া যেত
শুকনো ঘাসের ওপর নিশ্চিত দেখতে পেতাম
ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল
বাঁক ঘুরে গেল রাস্তা সাদা রোদ্দুরে...

তস্য গলি

মনে পড়ে সেই সব গলি-ঘুঁজি শুরু আছে, শেষ নেই
গুলি সুতোর মতন শুধু খুলে যায়, সেখানে পাঁচফোড়নের
গন্ধ, ঢাকা বারান্দা
থেকে কেউ ছুঁড়ে দেয় কাঁঠালের ভূঁতি, বাঁশের খাঁচায়
পোষা ময়না
কৃষ্ণ কথা কয় অতি কর্কশসুরে, একতলা থেকে
তিনতলায় কেউ কারুকে
তার চেয়েও উঁচু গলায় ডাকে, এক রক থেকে আরেক
রকে লাফিয়ে যায়
হুলো, জানলার পর্দা সরিয়ে চেয়ে থাকা এক বন্দিনী
রাজকন্যার কাজল
টানা চোখ, সেই চোখে দূর প্রতিবিম্বিত অশ্রু।
কোনো কোনো বাড়ির দরোজা
মাসের পর মাস বন্ধ, একটা বড় তালার চারপাশে
মাকড়সার জাল, আবার
কোনো কোনো বাড়ির দরজা হাট করে খোলা
ভেতরে কোনো জন-মনুষ্যের শব্দ নেই,
শুধু ধুলোয় রয়েছে পায়ের ছাপ আর ভাঙা আয়নার কাচ
হঠাৎ দুপদাপ করে
দৌড়ে গেল একদল ছেলে। ঘুড়ি ধরার জন্য তাদের চোখ
আকাশের দিকে যদিও
এই গলি থেকে আকাশ দেখা যায় না, একটি মেয়ে
তারপরেই ধীর পায়ে
মিলিয়ে গেল অন্যদিকে। দেখলেই মনে হয় যেন সে
আজই ফ্রক ছেড়ে
শাড়ি পরেছে, সে কেন চকিতে একবার ক্রুদ্ধ ভাবে
তাকিয়ে নিল আমার দিকে, কী আমার
দোষ কে জানে! একটি বাড়ির চৌকাঠ গড়িয়ে আসে
জল, ভেতরে ঘেউ ঘেউ করছে
কুকুর, হঠাৎ এক বৃদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন মা কালীর নামে।
তার ঠিক পরেই
দুদিকের দুই অলিন্দ থেকে দুই জমকালো শাড়ি
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় পরনিন্দে, কলের
গানে ভেসে আসে কানা কেষ্টর কীর্তন, সেই সঙ্গে

কোন বাচ্চা পড়ুয়া পাল্লা দিয়ে
মুখস্থ করে পাণিপথের যুদ্ধ, নিচু পাঁচিলের ওপর
গোলা পায়রাদের প্রেম,
মাথার ওপর ঝন্ ঝন্ করে নিঃসঙ্গ চিলের ডাক...
গলি ক্রমে সরু হয়ে আসছে। ক্রমশই অন্ধকার, তবু
কেউ যেন হাতছানি দিয়ে
ডাকে, পেছনে ফিরে তাকাতে গা ছমছম করে...
তেপান্তরের মাঠ নয়, নাইরোবির
জঙ্গল নয়, উত্তর কলকাতার গলির গোলকধাঁধায়
আমি পথ হারিয়ে ফেলি,
আমি ফিরে যাই কৈশোর থেকে বাল্যে, আরো
পিছনে...

শেষমুহূর্ত পর্যন্ত

এসো
এসো, ভালোবাসা দাও, দেরি
হয়ে যাচ্ছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, দাও,
দাও, আঙুলের ডগা থেকে। এক্ষুনি
খসে পড়বে গাছের একটা পাতা, দাও, দাও
ভালোবাসা। দু'হাত বাড়িয়ে দাও
দেরি হয়ে যাচ্ছে
দেরি হয়ে যাচ্ছে
জাহাজ ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রে, দাও
দাও ভালোবাসা, কাঙালি ভোজের শেষ খাদ্য কণা
দাও, দাও
ভুরুর সামান্য ভঙ্গি, দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভালোবাসা,
ভালোবাসা।
আর কিছু চাই না, আর কিছু না, দাও, দাও
একটা জলস্তম্ভ ভেঙে পড়বে এক মুহূর্তে
একটা ঝড় নিভে যাবে এক ফুঁয়ে, দাও
সমস্ত শরীর ভরে
শরীর ফুরিয়ে গেলে ইথার-তরঙ্গে,

শুশ্রূষায়
দাও, দাও, যবনিকা নেমে আসছে
শব্দ ডুবে যাচ্ছে শব্দের অসীমে
আকাশ ডানা মেলে ঝাঁপ দিল নীচে
দাও, দাও, আর সময় নেই
দাও ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা...

বাল্যস্মৃতির ঠোঁট

জানলার কাছে এসে ঝাপটা মারছিল একটা জারুল শাখা
তাকে বিদায় জানালাম
সে এক ভাঙা চাঁদের রাত
ঝড়-বাদল হচ্ছিল খুব, সে সব গত শতাব্দীতে খুব মানাতো
ওদের গর্জনে কান দিও না, এই বলে আমরা
টেবিলে তাস বাঁটতেই
শুরু হলো ভূমিকম্প
সেও তো কয়েকটা শতাব্দীর ওলোট-পালোটের গল্প
এমন কিছু না!

সেদিনের তাস খেলা ঠিক জমলো না,
আমরা সমুদ্রে গেলাম
কপাল ধুতে
সমুদ্র তখন সমুদ্রকে ছেড়ে উঠে আসছে
আকাশ তখন আকাশ থেকে উধাও হয়েছে
এসব কিছুই কিছু নয়, সভ্যতার মধ্যরাত্রে এমন অনেক কিছুই
ঘটে থাকে
আমি জ্যোৎস্নার সরলরেখার দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতেই
জ্যোৎস্না দুলতে থাকে, ছিঁড়ে যায়, তার আড়ালের
এক মায়াময় দেশ
আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে
আমি হেসে পিঠ ফিরিয়ে নিই
তখনই কী সুন্দর একটা সকাল ভাতের থালার মতন

ঝকঝক করে সাড়া দেয়
শুনতে পাই প্রভাত ফেরীর কাঁচা কাঁচা গান
আমার বাল্যস্মৃতির ঠোঁট নড়ে ওঠে...

জন্মদাগ

কিংশুক থেকে খসে পড়ছে রং, এবার সাদা ফুলের পালা
সোনামুখী রেল স্টেশনের একটু বাইরে আমি একলা দাঁড়িয়ে আছি
আজ ট্রেন আসবে না
সদ্যস্নাত শালগাছগুলির শিখরে কিসের এত কোলাহল
কাকের বাসায় ডেকে উঠেছে কোকিলের ছানা?
কেন এই কথাটা মনে পড়লো হঠাৎ
ওপরের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না
অনেকদিন কোকিলের ডাক শুনিনি
অনেকদিন এমন ছাউনিবিহীন ঘুমন্ত স্টেশনে একা দাঁড়াইনি
জুতো খুলে পা রাখি মাটিতে, একটা শুকনো পাতা বললো,
এসো—
ইস্পাতের রেখার ওপর ওপর ঠিকরে পড়ছে রোদ, বাতাসে
বাল্যকালের গন্ধ
লাল ধুলোয় খেলা করছে মৌলিক বস্তুবিশ্ব
একটা অদৃশ্য সুতোয় দোল খাচ্ছে অনাদি কালের বিন্দু বিন্দু উপাদান
আর একটু ঝুঁকলে, আরও গভীরে গেলে,
হয়তো আমি দেখতে পেয়ে যাবো
আমার জন্মদাগ!

কাঁটা

তোমার পায়ে কাঁটা ফুটেছিল। টিটলাগড়ে আলপথে। তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে পড়েছে। তুমি 'উঃ' বলতেই আমি বললাম, দাঁড়াও, নড়ো না। তোমার পায়ে আমি হাত দেবো, এ জন্য তোমার লজ্জা! তোমার পা তো ফাটা ফাটা নয়, লজ্জা কি! তোমার পা কোদালের মতন বড় বিশ্রী নয়।

নরম এবং যতটা ছোট হলে মানায়। জাপানি মেয়ের মতন খুব নরম, খুব ছোট নয়, অবশ্য কোন জাপানি মেয়ের পা আমি এ পর্যন্ত হাতে ছুঁইনি যদিও।

আমি মাটিতে বসে, হাতে তোমার পা। তুমি দাঁড়িয়ে একটু বেঁকে, শরীরের ভঙ্গি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতন। তোমার লাল টুকটুকে চটি, পায়ের পাতাও লালচে।

কোথায় ব্যথা?

যেখানে কাঁটা ফুটেছে।

কোথায় কাঁটা?

আমি জানি না।

ঠিক, কাঁটার কথাটা আমারই জানা উচিত।

আমি তোমার পায়ে হাত বুলোতে লাগলাম।

উঃ, দেখ, কোথায় কাঁটা!

এই তো দেখছি।

আমি সত্যই দেখছিলাম, দু'হাতের মুঠোয় তোমার নরম যতটা ছোট হলে মানায় পায়ের পাতাটি ধরে টিটলাগড়ের সেই অবনত সন্ধ্যায় আমি গভীরভাবে দেখছিলাম। কাঁটা দেখিনি, দেখেছি গোলাপি সৌন্দর্য। কিন্তু কাঁটা খুঁজতেই হবে, নইলে তোমার পায়ে হবে ব্যথা। বিষ। এই তো এখানে, খুব ছোট, প্রায় দেখাই যায় না। এত ছোট কাঁটা, হাত দিয়ে তোলা যায় না। ঠোঁট দিয়ে তোলার জন্য আমি তোমার পদ-চুম্বন করলাম। তুমি 'এই অসভ্য' বলে আমার মাথায় হাত রাখলে, দেবী মূর্তির মতন ভঙ্গি।

তুমি এখন স্বাধীন স্বাস্থ্যবান পায়ে অন্য পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও। আমি তোমাকে আর দেখি না। তুমি আমার দেখাও চাও না। জানি না, তোমার পদতল এখনও গোলাপি কিনা। কিন্তু সেই ছোট কাঁটাটা আমি রেখে দিয়েছি, খুব গোপনে, খুব ভেতরে, লুকিয়ে। প্রায়ই টের পাই।

একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে

রবীন্দ্রনাথ সঠিক বলে গিয়েছিলেন রামের জন্মস্থান কোথায়
যারা তা মানতে চায় না
তাদের কবিতা ও গানে, শিল্পে ও মনোসুষমায় কোনো অধিকার নেই
যারা পুতুল-দেবতা মানে না, তারা ভুলে যায়
মসজিদ-গীর্জা-গুরুদোয়ারগুলিও আসলে পুতুল

তারা আত্ম-ছলনাময় পুতুল-খেলা খেলতে চায় তো খেলুক
তারা বিশ্ব নিখিলের মধুরে-মধুর চিনবে না কোনোদিন!
এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ থেকে গেল
কিছুতেই বড় হতে চায় না
এখনো বুঝলো না যে 'আকাশ' শব্দটার মানে
চট্টগ্রাম কিংবা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়
মানুষ শব্দটাতে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই
ঈশ্বর নামে কোনো বড়বাবু এই বিশ্বসংসার চালাচ্ছেন না
ধর্মগুলো সব রূপকথা
যারা সেই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে
তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে পায় না
তারা গর্জন-বিলাসী, অনুভব করতে পারে না ঐকতান
কিছু কিছু মানুষ আমাদের সাবালক করার জন্য মাথা খুঁড়ে গেলেন
তাদের বড় বড় ছবি ঝোলানো হয়, আসলে গ্রাহ্য করে না কেউ
আয় কানাই, আয় কামাল, তোরা আয়
পৃথিবী ভর্তি বুড়ো-খোকাদের পাগলামি দেখে
আমরা একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করি!

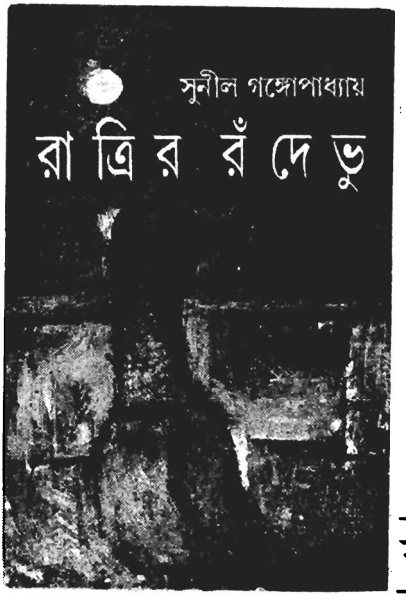

রাত্রির রঁদেভু

সূচিপত্র

আমায় সে চিনেছিল? বলো, বলো ২১৯, যারা হারিয়ে গেছে ২১৯, বর্ষণমালা ২২০, অলীক মানুষের সন্তান ২২২, সাঁকোটা দুলছে ২২৩, অভিসার ২২৫, নির্মাণ খেলা: দুই ২২৫, রাত্রির রঁদেভু ২২৭, বলে দিতে পারি স্পষ্ট ভাষায় ২২৭, কবিতা গদ্য ২২৮, এক বিরহী ও অন্ধকারের গান ২৩০, ঝড় বৃষ্টির এমন হুল্লোড় ২৩১, একটি পাতা খসা ২৩১, তুমি ২৩২, এক জীবনে ২৩৩, ব্যক্তিগত ইতিহাস ২৩৩, হায়, ধর্ম! ২৩৪, একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা ২৩৮, জলকে ভয় কি, ভয় তো শুধুই জল ২৩৮, তোমার হাত ২৩৯, সময়ের চিহ্নগুলি সময় মানে না ২৪০, নিজস্ব ভাষা ২৪১, মুহূর্তের অস্থিরতা ২৪২, সাঁজোয়া গাড়ির সামনের দিকে ২৪২, আমাকে যেতে হবে ২৪৪, একবার বুক খালি করে বলো ২৪৫, লাল ধুলোর রাস্তা ২৪৫, কোথায় আমার দেশ ২৪৬, এ জন্মের উপহার ২৪৭, ভুল স্টেশানে ২৪৭, তিনটি প্রশ্ন ২৪৮, বুকের কাছে ২৪৯, নির্মাণ খেলা তিন ২৫০, স্টিফেন হকিং-এর প্রতি ২৫১, এক পলক অতীত ২৫২, শিল্প নয়, তোমাকে চাই ২৫৩, আমার আমি ২৫৪, ছেলে মেয়েদের গল্প ২৫৫, নিজস্ব বৃত্তে ২৫৬, এইভাবেই প্রতিদিন ২৫৬, এক বনমানুষ ২৫৭, এত চেনা ২৫৮, চলে যাবো? ২৫৮, নন্দনকাননে দ্রৌপদী ২৫৯

আমায় সে চিনেছিল ? বলো, বলো

একবার চোখে চোখ, তারপর দু' দিকের পথ
আমায় সে চিনেছিল ? কিংবা সে দেখেছিল আড়ালে কারুকে ?
তাতে কিছু আসে যায় ? কথা নেই, দু'জনে দু'দিকে চলে যাওয়া
পেছনে ফিরিনি আর, আমার রাস্তায় কত বাঁক
দু' চারটে খানাখন্দ, জল-কাদায় কুচিকুচি আলো
জুতোয় কাঁকর ফুটছে, একা সিগারেট কিন্তু দেশলাই কোথায়
আমায় সে চিনেছিল ? চোখে চোখ, ছিল কোনো ভাষা ?
এক হোঁচট, টর্চ নেই, অলীক শরীর যায়, আসে
আমায় সে চিনেছিল ? আমাকে, না সে কাকে দেখেছে ?
শুয়ারকা বাচ্চা সব, কালো কুত্তা, হঠ যাও, মারবো এক লাথ
বন্ধ সব দোকানের তালাগুলো ভেঙে দেবো একেক ধাক্কায়
আমায় সে চিনেছিল ? বাতাসের ঘূর্ণি থেমে গেছে
আকাশে ইয়ার্কি বুঝি, এত তারা, উপড়ে নেবো সব
আমায় সে চিনেছিল ? বলো, বলো, সে কোথায় গেল ?
অন্ধকার বাড়িগুলি, সব জানলা পোড়াবো ফুৎকারে
এ বিশ্ব উচ্ছন্নে যাক, অমরত্ব মূর্খের রটনা
করতলে ধরে রাখা জল, তার খেলা, সেই দর্পণে জীবন
আমায় সে চিনেছিল ? বলো, বলো, কার চোখে চোখ ?

যারা হারিয়ে গেছে

'বেণুবনে' বয়ে গেল হিল্লোল, আমি শুনতে পেলুম বাঁশঝাড়ে
শরশর আওয়াজ
আহা 'দখিনা পবন' তুমি এত স্নিগ্ধতা দিলে এই বিকেলে
কিন্তু কবিতায় আর কোনোদিন তোমার বন্দনা করতে পারবো না
তুমি থেকে যাবে রবীন্দ্রনাথের গানে
এখন কি আর কেউ 'বিরলে রোদন' করে না ?
দেখতে পাই না, ভাষাও তাকে ভুলে যাচ্ছে
'ওলো সই, ওলো সই', সমস্ত মনের কথা শেষ হয়ে গেছে
পঞ্চাশ বছর আগে
কোথায় হারিয়ে গেলে 'বাতায়ন' ?

‘গবাক্ষে’র আড়ালেও কেউ থাকে না ব্যাকুল প্রতীক্ষায়
‘সকরুণ বেণু’ আর বাজবে না কোনোদিন
তবুও আমি এক একবার পেছন ফিরে
খুব তীব্র ভাবে ফিরিয়ে আনতে চাই
‘মম’ ও ‘মুই’-কে
কিন্তু কলম মানতে চায় না
কলমও তো আর ‘লেখনী’ নেই যে !

বর্ষণমালা

১

এক পশলা বৃষ্টি খেয়ে বেড়াতে বেরুলো ছটফটে
কিশোরী নদীটি
সরল কদমগাছের দিকে চোখ টিপে বললো, যাবি ?
আকাশ একটু একটু করে নেমে আসছে, আবার উঠছে
আবার নামছে
কলাগাছের ছেঁড়া পাতায় কে যেন বাজাচ্ছে বাঁশি
ও বাঁশিওয়ালা, তুমি একবার ফুরুস ফুলগুলোকে কাঁদাবে না ?
পেঁপেগাছের পিঁপড়ে ঝাঁপ দিল মহাশূন্যে
মাটি থেকে সাত ইঞ্চি উঁচু দিয়ে ঘর্ঘরিয়ে ছুটে
গেল একটা রথ
রাস্তাটা একটু রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো
লিচু গাছের নতুন পাতারা পায়ের ধুলো নিচ্ছে
পুরনো পাতাদের
ডানায় পতাকা উড়িয়ে কোঁচ বক নদীটিকে বললো,
চল না কল্যাণেশ্বরীর মেলায়
নিমফুলের মৌমাছি ভুলে গেছে ঘর গেরস্থালির কথা
দিনের আলোয় একটা সাদা প্যাঁচা উড়ে গেল রাত্রির দেশে
তিনটে কাঠচাঁপা বন্দি করে রেখেছে রাজপুত্রের মতন
এক টুকরো রোদ
ও বাঁশিওয়ালা, তুমি একবার তোমার বন্ধুর ঘুম ভাঙাবে না ?

২

সেদিনও ছিল আকাশ ভাঙা বৃষ্টিময় সন্ধে
তোমার বুক মাদক ছিল, মৃদু ঘামের গন্ধ
নরম চাঁদ, দু'খানি চাঁদ, গোলাপি রঙা বৃন্ত
চক্ষে ধাঁধা, জিহ্বা তবু ভুল করেনি চিনতে
এসেছিলে কি নিরাভরণ নদীর মতো তন্বী
বুকে ছিল কি সুধা ? হায়রে ক্ষুধার্তের মন নেই
প্রথম নারী, তোমার চাঁদে আমার সেই স্পর্শ
অমৃত নয়, ঘামের নুন, তাই কেঁপেছি হর্ষে

৩

দৌড়োতে দৌড়োতে লাল মাটির প্রান্তর ভরা
বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে
বারান্দায় উঠে এলে তুমি
কে সেখানে বসে আছে
বেতের চেয়ারে, ওষ্ঠে সিগারেট
ভেজা শাড়ি লেপ্টে গেছে তোমার বাতাবি-নিতম্বে
সরস্বতী মূর্তির মতন কোমর
নাভিতে মেঘের ঘ্রাণ
সেই লোকটির হাতে কলম, কোলে একটি বাঁধানো খাতা
সে হয়তো কবিতা লিখছিল, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল
সাত লক্ষ কল্পনার সুতো
সরস্বতীর বন্দনা ছেড়ে সে দেখছে তোমাকে
তোমার উরুর ডৌল
সমস্ত বৃষ্টিময় দেশ ভরে গেল রভস গন্ধে
সেই পুরুষটির জাদুদণ্ডে জ্বলে উঠলো দাবানল
কলম আর খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে উঠে এলো
তোমার কাছে দয়া চাইছে যেন, আলিঙ্গনে উদ্যত
এক শরীরের নিঃসঙ্গতা অন্য শরীরের নিঃসঙ্গতাকে
গরলের মতো পান করতে চায়
ইতিহাস তখন স্তব্ধ হয়ে থাকে অন্তরীক্ষে
দেবতারা হাততালি দেয়, সন্ন্যাসীরা মুখ নিচু করে কাঁদে
বাঁশিওয়ালা তার বাঁশি বাজিয়ে আরও বৃষ্টিকে ডাকে
কয়েকটা শালিক শুধু দেখে গেল মেঝেতে গড়ানো
সেই না-লেখা কবিতা

৪

বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একা
বকুল ফুলের মতন বৃষ্টি, ঝরেছে বকুল, বৃষ্টি বকুল
ঝাপসা বাতাসে একটি ঝলক অচেনা নিজেকে দেখা

৫

বেলা যায়, বেলা যায়, শোনোনি সন্ন্যাসী ?
পাহাড় শিখর থেকে গড়ানো পাথর যেন, ক্ষয়ে আসে দিন
ধারাস্নানে সুষুপ্ত পৃথিবী
খেয়া ঘাটে কেউ নেই, একা একা নৌকোখানি দোলে
ফিরে এসো হে সন্ন্যাসী, তোমার দু' পায়ে এত ক্ষত
আর কত দূর যাবে ? জীবন ফুরিয়ে এলে তবু কোনো
পথ বাকি থাকে ?
জীবনই জীবন-সত্য, তার ওপারে আর-কিছু নেই
ফিরে এসো, হে সন্ন্যাসী, বাসনার মধ্যে ফিরে এসো
সাজ খোলো, ছোট ছোট দুঃখে কাঁদো, শিশুটিকে
কোলে তুলে নাও
ফিরে এসো, হে সন্ন্যাসী, কত ক্ষমা চাওয়া বাকি আছে
জীবন ফুরিয়ে এলো; খেয়াঘাটে নৌকোখানি একা একা দোলে

৬

সুন্দর শুধু ব্যথা দেয়, শুধু বুক মোচড়ায়
সুন্দর নরম ডানায় আগুন ঝরায়
সুন্দর যেন হঠাৎ বৃষ্টি, অলীকের মতো তৃষ্ণা ছড়ায়
সুন্দর চায় গোপন অশ্রু, পূজারীকে পায়ে ঠেলে চলে যায়
সুন্দর আরও সুন্দরতর হয়ে আলেয়ার মতন ঘোরায়

সুন্দর তার নরম ডানায় আগুন ছড়ায়...

অলীক মানুষের সন্তান

যে গ্রামে আমি জন্মেছিলাম, সেই গ্রাম অদৃশ্য হয়ে গেছে
বদলে যায়নি, একেবারেই শূন্যে বিলীন

গাছপালা নেই, পাখির বাসা, নির্জন পুকুর ঘাট, মানুষের কলস্বর
কিছুই নেই
পায়ে চলা পথ নেই, মেঘলা আকাশ নেই
যে তুলসীতলায় নতুন মামিমা অভিমানে চোখের জল ঝরাতেন
সেখানে একটি ঘাসও নেই
যে গ্রামে আমি জন্মেছিলাম, সেই গ্রাম অদৃশ্য হয়ে গেছে
তবে কি আমি কোথাও জন্মাইনি ?
আমার ছেলেকে আমি যখন পড়তে বসাই, তার চোখে
এঁকে দেবার চেষ্টা করি সেই গ্রামের স্বপ্ন
যদি সেও মনে না রাখে
তা হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার জন্ম
এক অলীক মানুষের সন্তান হয়ে সে কোথায় আশ্রয় খুঁজবে ?

সাঁকোটা দুলছে

মনে পড়ে সেই সুপুরি গাছের সারি
তার পাশে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো গ্রাম
মাটির দেয়ালে গাঁথা আমাদের বাড়ি
ছোট ছোট সুখে সিদ্ধ মনস্কাম ।

পড়শি নদীটি ধনুকের মতো বাঁকা
উরু ডোবা জলে সারাদিন খুনশুটি
বাঁশের সাঁকোটি শিশু শিল্পীর আঁকা
হেলানো বটের ডালে দোল খায় ছুটি ।

এপারে ওপারে ঢিল ছুঁড়ে ডাকাডাকি
ওদিকের গ্রামে রোদ্দুর কিছু বেশি
ছায়া ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায় ক'টি পাখি
ভরা নৌকায় গান গায় ভিন দেশি ।

আমার বন্ধু আজানের সুরে জাগে
আমার দু'চোখে তখনো স্বপ্নলতা
ভোরের কুসুম ওপারে ফুটেছে আগে

এপারে শিশির পতনের নীরবতা ।

আমার বন্ধু বহু ঝগড়ার সাথী
কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি
মার কাছে গিয়ে পাশাপাশি হাত পাতি
গাব গাছে উঠে সে-হাতেই কাড়াকাড়ি ।

আমার বন্ধু দুনিয়াদারির রাজা
মিথ্যে কথায় জগৎ সভায় সেরা
দোষ না করেও পিঠ পেতে নেয় সাজা
আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা ।

আমাদের ছুটি মন-বদলের খেলা
আমাদের ছুটি অরণ্যে খোঁজাখুঁজি
আমাদের ছুটি হাসি কান্নার বেলা
আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি ।

খেলায় খেলায় জীবন পৃষ্ঠা ওড়ে
খেলায় খেলায় ইতিহাস দেয় উঁকি
এদিকে ওদিকে পৃথিবীর পিঠ পোড়ে
কত না মানুষ ভুরু কুঁচকিয়ে সুখী ।

বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে
ভেঙে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধূ ধূ
খেলার বয়েস পেরোলেও একা ঘরে
বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু ।

সাঁকোটির কথা মনে আছে, আনোয়ার ?
এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে
এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার
সাঁকোটা দুলছে, এই আমি তোর কাছে ।

অভিসার

সরল নির্জন রাস্তা মধ্য রাতের জ্যোৎস্নায়
নদী হয়ে আছে
হঠাৎ ডেকে ওঠে কোকিল
তুমি যেই মুখ তুললে অমনি খসে পড়লো
একটি স্বর্ণ চাঁপা
জলে ভাসছে সেই ফুল, ভিজে যাচ্ছে তোমার খালি পা
তোমার কানের লতির পাশে একটি জোনাকি
তুমি ঢেউ সরিয়ে সরিয়ে হেঁটে আসছো
শিঞ্জিনী নেই, তবু নাচের মতো শব্দ হচ্ছে রিনরিন
আমি বসে আছি পাহাড়-প্রান্তে এক পিপুল গাছের তলায়
তুমি নদী নিয়ে আসছো, স্বর্ণচাঁপা কোকিল আর
জোনাকি নিয়ে আসছো
হ্যাঁ, এটাই সত্যি, আর সব মিথ্যে
আমরা তিনতলার সিঁড়ি ভাঙা লোডশেডিং ঘর মিথ্যে
তোমার ঘুসঘুসে জ্বর, লোহার খাটে শুয়ে থাকা মিথ্যে
চব্বিশ ঘণ্টার হরতাল হচ্ছে কোনো এক অলীক নগরীতে
তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই
আমি বসে আছি পাহাড়-প্রান্তে, তুমি ভেসে এসেছো
জ্যোৎস্নার নদীতে
এই স্পর্ধিত সত্য চিরকালের...

নির্মাণ খেলা : দুই

রতিকৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রমা দোলে
জলে ভেসে আছে খানিক আকাশ খানিক মেঘের ছেঁড়া অবকাশ
রাত্রিবসনা এ কেমন নারী দেবতাকে দেয় নীল তরবারি
বুক পেতে দেয় উরু ঝলসায় মায়া সিন্দুক খোলে...

এই চারলাইন লেখার পর আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। প্রায় মধ্যরাতে দোতলার জানলা থেকে পুকুরের জলে চাঁদের দোল খাওয়া দেখে কবিতার প্রথম লাইনটি মনে আসে। চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর যাবতীয় জলের যৌন সম্পর্ক। প্রথম লাইনটি সে জন্য স্বাভাবিক। দ্বিতীয় লাইনটিতে অনেক দ্বিধার কাটাকুটি আছে। প্রথমে লিখেছিলাম,

'জলে ঢেউ ওঠে, জলে বিভঙ্গ আকাশের এক কণা'... । তেমন পছন্দ হলো না। ছন্দের চালটা বদলালে মন্দ কী ? দ্বিতীয়বার লেখার পর 'ছেঁড়া অবকাশ' নিয়ে একটু খটকা লেগেছিল, তারপর ভাবলাম, চলুক না !

তৃতীয় লাইনে নীল তরবারির বদলে প্রথমে লিখলাম 'মায়া তরবারি', এটা খুব সহজে প্রথাবাহিত ভাবে আসে। প্রথার ভূত মাথা থেকে তাড়ানো খুব শক্ত। কিন্তু চতুর্থ লাইনে 'মায়া' শব্দটা আমার আবার দরকার। মায়া তরবারির চেয়ে মায়া সিন্দুক অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, তখনই দেখতে পাই নীল তরবারি।

চাঁদ যখন দেবতা ছিল, তখন যৌন টানের নামই ছিল প্রেম। দেবতারা আসলে প্রেম জানে না। নীল আমস্ট্রং-এর পায়ের ধুলো পড়ার পর চাঁদ আর দেবতা নেই। তাছাড়া, এই চার লাইনের মধ্যে আমি কোথায় ? কাটাকুটি করে লাইনগুলি এই ভাবে রূপান্তরিত হয় :

এত শব্দ কেন, দিগন্তে কেন আগুন ?
বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে নেমে গড়িয়ে যায় রক্ত
কারা হঠাৎ হঠাৎ আমার কান ধরে টানে ?
ঘাড় মুচড়ে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেয় মুখ
মানব সভ্যতার মধ্যে কত শতাব্দীর আবর্জনা, এত নোংরা গন্ধ
মধ্যরাতে ঘর ছেড়ে, বাইরে চলে আসি
বুকে ভরে নিশ্বাস নিই, সেই বাতাসে মেশানো অশ্রু
নদীর জলে লুটোপুটি খাচ্ছে চাঁদ, এ যেন বিশ্ববিশ্রুত প্রেম
নিঃশব্দ নিশীথে দোলে হাওয়া
ওরা কিছুই জানে না
বারান্দায় একা বসে সমস্ত শরীর ও শ্বাস উষ্ণ হয়ে ওঠে
সাঙ্ঘাতিক ইচ্ছে করে নদীতে উন্মুক্ত হয়ে নেমে পড়তে
কিন্তু তাকে স্পর্শ করার আগে বারবার প্রশ্ন করি, আমাকে
ভালোবাসবে নদী ?

[এতে ছন্দ নেই, এত গদ্যময় হয়ে গেল রাত। আর লিখতে ইচ্ছে করে না। কলম সরিয়ে রেখে বারবার মনে মনে আওড়াই : রতিকৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রম' দোলে। রতি কৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রমা...]

রাত্রির রঁদেভু

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, বুক মুচড়ে মনে হয় যেন
এই শেষ দেখা
সহসা গোধূলি মেখে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে ঝাপসা সুদূরে
একটি পাখির শিস মাঝে মাঝে শুনি
কোনোদিন দেখাও হবে না
ধূসর মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি পান্থপাদপের মতো
এইখানে কথা ছিল রাত্রির রঁদেভু
কে কোথায় গেল
ফুলের রেণুর মতো মৃদু ডানা মেলে উড়ে যায় দীর্ঘশ্বাস।

পিঁপড়ের মুখে ধরে রাখা একটি চিনি-বিন্দু, এই যে জীবন
তার স্রোত থেকে কে কখন
নিঃশব্দে তলিয়ে যায়, কিছু অভিমান লেগে থাকে
ইস্কুলের ঘণ্টাধ্বনি, তারও স্রোত অবিস্মরণীয়
তবুও সিঁড়ির মুখে হাত তুলে বলতে ইচ্ছে হয়
যেও না, যেও না, ফিরে এসো
সান্ধ্য সম্মিলনে ফিরে এসো
প্রবাসে বা নিরুদ্দেশে অনেক বসন্তখেলা বাকি রয়ে গেছে
বকুল শাখার নীচে পাতা আছে ফুলের বিছানা...

পান্থপাদপ তো নয়, এ যে একটা বাজের থাপ্পড় খাওয়া গাছ
অন্ধকারে একা মুখ চুন করে আছে
তার হাহাকার শুধু নিজেই সে শোনে :
আমাকেও কি কেউ বলবে, ফিরে এসো, যেও না, যেও না !

বলে দিতে পারি স্পষ্ট ভাষায়

ওরা মেতে আছে কিসের নেশায় জানি না, আমি ছুঁয়ে আছি তোমাকে
ওরা হেসে খেলে বানালো এবং ভাঙলো, গণতন্ত্রের মহিমা
চাকা খুলে মুখ থুবড়ে পড়লো গ্রীস, রোমের দাপট টুকরো
পথের ধুলোয় বসে আছে এক অন্ধ, তাকে ঘিরে আছে মানুষ

তার গান শুনে মন ভরে যায় বিষাদে, আমি ছুটে যাই একলা
সারা সৃষ্টিতে কেউ নেই শুধু তুমি, বন্ধ ঘরের জানলা
অটোমান সাম্রাজ্যের কাছে ধ্বস্ত, একদা ছিল যে দুনিয়া
অস্ত্রের বিভা, জয়ের প্রবল হাস্য, শোষক এবং শোষিত
সবাই নদীর কিনারে গাছের পাতা, গ্রাস করে নেয় প্রকৃতি
অন্ধ গায়ক ধুলোয় জ্বেলেছে আগুন, নোখের ডগায় মন্ত্র
সে-ই শুধু জানে সময় যায় না ফেরানো, সময় তো নয় পোষ্য
ছাই দিয়ে লেখে ভূমির ওপর কবিতা, যে পড়েছে সে-ই জেনেছে
আমি ছুটে যাই দেয়াল বিহীন ঘরের নীরব জানলা খোলাতে
যারা মেতে আছে দরজা ভাঙার খেলায়, রাত্রি শেষের বেলায়
শস্যের ক্ষেত রণভূমি চায় বানাতে, 'আমি' নই, বলে 'আমরা'
তারা থাক যত রঙিন স্বপ্নে মদির, সঙ্গীতহীন বধির
আমি এত ঝড় শেষেও তোমাকে চিনেছি, শেষ নিঃশ্বাসে চেয়েছি
তুমি নও কোনো রূপক অথবা উপমা, কালির আঁচড়ে রচনা
বলে দিতে পারি স্পষ্ট ভাষায় তুমি, রক্ত মাংসে প্রেম।

কবিতা গদ্য

—আত্মপ্রকাশ উপন্যাসখানা লিখতে তোকে কে মাথার দিব্যি
দিয়েছিল, সুনীল ?
হারামজাদা ছেলে, কবিতা লিখছিলি, হঠাৎ গদ্যের দিকে ঢলাঢলি
করতে গেলি কেন ?
ওরে লোভী পামর, তুই দু' কূল খোয়ালি ?
—কে তুমি, কে তুমি কেন আমাকে এমন বকুনি দিচ্ছো, মুখ দেখাও
জানো তো আমি আমি নিয়তিবাদ মানি না
রক্ত মাংসের না হলে গ্রাহ্য করি না দেবী সরস্বতীকেও !
—কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠা ছেড়ে কেন গেলি খবরের কাগজের গদ্যের দিকে
খুব টাকার আহিঙ্কে হয়েছিল, তাই না ?
—টাকা নয়, দু' মুঠো ভাত, তখন প্রায় খেতে পেতাম না
বিদেশ ফেরত এক কাঠ-বেকার
ট্রাম-বাস ভাড়াও থাকতো না, ওয়েলিংটনের মোড় থেকে শ্যামবাজার
পর্যন্ত যেতাম পায়ে হেঁটে
গদ্য তবু মজুরি দেয়, কবিতা যে কিছুই দেয়নি

—কবিতা কিছুই দেয় না ?
—কে তুমি, কে তুমি, মুখ দেখাও !
—বিশ্বাসঘাতক ! গদ্যের বর্ম পরেছিস বলে আজ
উচ্চারণ করতে পারলি, কবিতা কিছুই দেয় না
রক্ত মাংসের সরস্বতীর টুকরো দেয়নি ?
স্বর্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মাধুর্য-নিশানের ছোঁয়া পাসনি তখন ?
—ন্যাকামি করো না, ওহে অশরীরী, ওহে মধ্যরাত্রির কণ্ঠস্বর
সরস্বতীর টুকরো, স্বর্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এসব ঢপ কথা
বাঁচতে চেয়েছিলাম, শূন্য পকেট, জীবনভরা শূন্যতা, তবু
বাঁচতে চেয়েছিলাম, তুমি কী জানো আমার দুঃখ !
—এগুলোর নাম গদ্য ? লক্ষ্মীছাড়া আঙুল পুড়ে যায়নি কেন তোর ?
—পুড়েছে, আঙুল নেই, রক্তাভ নোখ নেই, আছে শুধু কলম
—আর ?
—সাদা পৃষ্ঠাকে কালো করার প্রতিজ্ঞা
অন্ধের মতন এক সুদীর্ঘ সফর, প্রতিটি দিন অসমাপ্ত
—পেয়েছো কি মধ্য যামে যা ছিল পাবার ?
—বেলাভূমিতে লাল লাল কাঁকড়াগুলো কি সমুদ্রকে পায়
নাকি সমুদ্র শুনতে পায় তার বন্দনাকারীদের ভাঙা গলা ?
জীবন এ রকম
—কবিতা তোমাকে কিছুই দেয়নি ? কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস, কিছু চিঠি
পাটভাঙা জামা, না-ছেঁড়া টেকসই জুতো ?
—কেন গদ্য ভাষায় কথা বলছো, ওহে অদৃশ্য যাত্রা দলের বিবেক ?
ট্রাম লাইনের কর্কশ শব্দের মতন গদ্যে ঝঙ্কৃত হচ্ছে প্রেম
সব দিকে গদ্য, কবিতাকে আক্রমণ করছে গদ্য, টিনের চালে
অগভীর চোখ ধাঁধানো রোদ্দুরের মতন গদ্য, তবু তুমি কবিতাকে
আঁকড়ে ধরতে চাও, কে তুমি ?
—আমি রাস্তার একটা বাঁক, তোমার জামার একটা হারানো
বোতাম, সুনীল !
—এখন আমি, রাত একটা চল্লিশে এই যা লিখছি
তা কবিতা না গদ্য ?

এক বিরহী ও অন্ধকারের গান

প্রথমে বন্দনা করি শুদ্ধ অন্ধকার
একা দেখা রূপ যার সহস্র প্রকার !

তুমি বর্ণময়ী, তুমি আকাশ পত্রিকা
প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শিল্প, মূর্তিমতী শিখা
তোমাকে প্রথম দেখি চক্ষুহীন চোখে
যখন ত্রিশঙ্কু আমি এলোকে ওলোকে।
গর্ভগৃহে তুমি ঢেউ, দোলালে আমাকে
সুমেরু শিখর থেকে ঘোর কুম্ভীপাকে
কালপুরুষের সখী, বাত্ময় স্তব্ধতা
তুমিই আমার কণ্ঠে দিয়েছিলে কথা
মৃত্যুর সপত্নী নও, সত্যের জননী
চিন্তাদ্বার খুলে দিলে, তুমি চিন্তামণি
একা-দেখা রূপ যার সহস্র প্রকার
জয় অন্ধকার, বলো, জয় অন্ধকার !

আমরা আঁধার বেচে খাই, আমরা আঁধার কিনে খাই
এর এস্টক অফুরন্ত ভাবনা কিছু নাই
তোমার কতকখানি চাই ?
লে লে বাবু ছ-আনা
যে-কোনো টুকরো ছ-আনা
চৌকো গোল তিন কোণা
চিনি মেশানো অন্ধকার, রাঙতায় মোড়া অন্ধকার
আয় রঙ্গ হাটে যাই
একটু আঁধার চেটে খাই
এক পয়সার লটারি যেমন-তেমন নিতে পারি
সবাই মিলে দিচ্ছে ছুট
অন্ধকারের হরির লুট
ভাঙা-সাঁকো নদীর ধার
জলের দরে অন্ধকার
তোমার অন্য কিছু চাই ? তুমি চোখটি বোঁজো ভাই
আমরা আঁধার বেচে খাই, আমরা আঁধার কিনে খাই !

আঁধারের সহোদরা, কতকাল দেখিনি তোমায় !

ঝড় বৃষ্টির এমন হুল্লোড়

সকাল বেলাতেই ঝড় বৃষ্টির এমন হুল্লোড়,
ইচ্ছে হলো
কিছুটা বয়েস কমিয়ে ফেলা যাক না
জট পাকানো নানা রঙের সুতো, কয়েকটা গিঁটও কি
খোলা যাবে না ?
বাগান নেই, দাঁড়াই ছয়-বাই-তিন বারান্দায়
আমার কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিচ্ছে আকাশ
গেঞ্জির নীচে ভালোবাসার কাঙাল বুক
বুক ভর্তি রোম সাদা-কালো
চোখে দিগন্তের ধুলো
ঝমঝম শব্দে অশ্বারোহীরা ছুটে যাচ্ছে নিম্ন রাস্তা দিয়ে
ইস্কুল-বাচ্চাকে উদরে চেপে বাতাস ঠেলে এগোচ্ছে
এক তরুণী মা
একটা ফুটফুটে সাদা বেড়াল এখন হয়ে গেছে রুমাল
ভিজতে ভিজতে স্বচ্ছ হলো আমার শরীর
এখন নিজেকেই খুব আদর করতে ইচ্ছে করে
জট পাকানো নানা রঙের সুতোর একটা গিঁট
অন্তত একটা গিঁট
খুলছে, খুলবে না ? এই তো খুললো

একটি পাতা খসা

গাছের ডাল ভাঙে, শুকনো পাতা ঝরে
আমিও ভাঙি রোজ, নিজের কিছু ভাঙি
ব্রিজের মুখে দেখা, আকাশে লাল মেঘ
অরুণ আভাময় বললে চোখ তুলে
এখানে কেন এত গন্ধ দেহ দেহ
এখানে কারা এত শব্দ ভুল করে
এখানে নিশ্বাসে রক্ত মাখামাখি
এ সেতু বন্ধন হঠাৎ খুলে যাবে...
মানুষ ছায়া হয়, ছায়ারা ফিরে আসে

তোমার ভুরু কাঁপে, আকাশ চিরে যায়
হাতের নীল ছাতা মাটিতে ফেলে দিলে
কুড়িয়ে নিতে এল ছায়ার প্রহরীরা
ব্রিজের নীচে নদী পাগল নদী হলো
তোমার শাড়ি ঢেউ নিমেষে বুক খোলা
অচেনা চাহনিতে বললে চলো চলো
এসব গোধূলিতে ফেরার পিছুটান
আমার অক্ষির একটি পল্লব
সহসা ছিঁড়ে গেল বাতাসে উড়ে গেল
ঘূর্ণি জলে মিশে কিছুই কিছু নয়
তবুও আমি আর আগের মতো নেই
একটি পাতা-খসা গাছ ও আমি এক...

তুমি

শ্রাবণ সন্ধ্যায় তুমি, তুমি পূর্ণ শ্রাবণ বর্ষণে
শ্রাবণ না আশ্বিনের, তুমি কার, কে তুমি, কে তুমি ?
কে তুমি আমি তা জানি, সামান্য রমণী, মেলে আছো দুই ডানা
চোখ তুমি, ঈষৎ খয়েরি মণি তুমি, গাঢ় ভ্রূপল্লব তুমি
নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম, আগুনের ভেতরে আগুন
আঙুলের ডগা থেকে শিহরন, সোনালি বুকের দোল দোল
নারী ও কিশোরী তুমি, এই খুকি, এই মহামায়া
আয় আয় সর্ষে ক্ষেতে লুকোচুরি, আয় আয় কালো জলে ডুব
ইস্কুলের পথে বাধা, ভেজা ফ্রক, উরুর কম্পনে, হাস্যে তুমি
মরাল গ্রীবায় তুমি, ছেঁড়া জুতো, সেফটিপিন, হা হা
রাত্রির রাস্তার মতো প্রশ্নচিহ্ন, কখনো বা চাঁদের ঝলসানি
শ্রাবণ তোমার, তুমি অশ্রু স্বেদে ভাসাও স্বদেশ !

এক জীবনে

স্বপ্ন দেখার রাত, আচমকা জেগে ওঠার রাত
কখন মিলিয়ে গেল একটা নীল সরোবরে
পদ্ম ফুলের পাপড়ি মেলছে, ভোর
মোষের পিঠে চেপে বাঁশি বাজাচ্ছে একটা শ্যামলা রঙের বাচ্চা
সূর্য ওর খিদে আনে, সূর্য সকলের খিদে আনে
রোদ্দুর সবাইকে সাজগোজ করে তৈরি হতে বলে
সবুজ শান্তির মতন ধান খেতে লকলক করছে
দুপুরবেলার উনুনের আঁচ
জল কাদায় কোন এক পলাতকের পায়ের ছাপ !
বাতাস যখন-তখন একটা যাই যাই রব তোলে
সোনাঝুরির উড়ন্ত রেণুতে যাই যাই
বকের ডানায় যাই যাই
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিতে বিশাল ঝংকারের মতন
বেজে উঠছে যাই যাই
কথা শেষ হলো না, কথা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে
বেত গাছের ডগার মতন কাঁপছে বাল্যকালের লিপ্সা
অনির্ণয় হাত জোড় করে বলছে, যাই
অন্ধকার সুড়ঙ্গ, অমীমাংসিত ধাঁধাগুলি বলছে যাই
জীবন বয়ে চলেছে নিজের নিয়মে
এক জীবনে কী আর সব হয় !

ব্যক্তিগত ইতিহাস

পিঠে এত অস্ত্রের আঘাত, ভুল করো না, প্রত্যেকবার পালাইনি
পিঠ দিয়ে আড়াল করে সামনে তো কারুকে রক্ষা করাও যায়
সামনে যে থাকে, সব সময়ই কি সম্মুখযুদ্ধ,
সামনাসামনি ভালোবাসা হয় না ?

দু'হাত বাড়ালেই কি শুধু অস্ত্র,
আঙুলের ডগায় থাকে না স্নেহ ?
আমি জামা খুলে দাঁড়াতেই তুমি পিঠে হাত দিয়ে বললে,

আঙুলের ডগায় থাকে না স্নেহ ?
আমি জামা খুলে দাঁড়াতেই তুমি পিঠে হাত দিয়ে বললে,
ইস, এত ক্ষত তোমার ?
এ যেন পাথরগোড়ার রাস্তার মতন
আমি হেসে বললাম, না, রাস্তা নয়, এ সেই অতিকায় কূর্মের পিঠ
যাতে লেখা থাকে অনেক ইতিহাস
সব ইতিহাস গৌরবের নয়
সব সময় পিঠ দিয়ে রুখে সামনের কারুকে বাঁচাইনি
এক এক সময় ভালোবাসাহীন বন্ধুত্ব দেখে দৌড়ে
বাঁচবার চেষ্টা করেছি
ভালোবাসাহীন হিংস্রতায় আমি ভয় পেয়েছি
কাপুরুষের মতন ছুটেছি এদিক ওদিক
এসো, তুমি সামনে এসো, হাত পেতে নাও
আমার আত্মসমর্পণের বীরত্ব ।

হায়, ধর্ম !

শনিবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯২
মাঠে মাঠে রবিশস্য বোনার কাজ চলছে সারাদিন
নামলো সন্ধ্যা
পাতলা অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়েছে দূরের পাহাড়
পাখিরা ফিরছে, বাতাস বইছে বিপরীত দিকে
এখন ঘরে ফেরার সময়
যাদের ঘর নেই তারাও ফেরে
ওদের ক্লান্ত পা, গলায় গুনগুনে স্বর, মাথায় জড়ানো গামছা
পাম্প হাউজে এসে টিউবওয়েলের জলে ধুয়ে নিল হাত মুখ
আঃ কী নির্মল, ঠাণ্ডা জল, ধরিত্রীর স্নেহ
জুড়িয়ে দেয় শরীর
একটা বিড়ির সুখটান, তারপর উনুন ধরাবার পালা
কয়েকজন রুটি পাকাবে, দু-একজন রাঁধবে অড়হড় ডাল,
ভেণ্ডির সবজি
আর একজন না-সাধা গলায় গাইবে গান :
"হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা

কো করি তর্ক বঢ়াবৈ সাখা...”
যে গায় এবং যারা শোনে, তাদের এক ঝলক মনে পড়ে
সুদূর পূর্ণিয়া জেলার গ্রামের বাড়ি, ঘরওয়ালী ও
বাল-বাচ্চার মুখ
ওরা এখন পঞ্জাবের ভাড়াটে চাষী
অন্যের জমিতে এক মৌসুমের ঠিকা
দিনভর সূর্য পোড়ায় মাথা, নিঙড়ে নেয় মজ্জা
সন্ধেবেলা পেটের মধ্যেই জ্বলে উনুন, চোখ দিয়ে খাওয়া
ডাল-রুটি
তারপর খোলা আকাশের নীচে খাটিয়ায় চিৎপটাং
বিড়িতে টান দিতে দিতে ঘুমোবার আগেই দেখা দু-একটা স্বপ্ন
জীবন এর চেয়ে বেশি কিছু দাবি করেনি...
রুটি সেঁকা হয়ে গেছে, ফুটন্ত ডালে যেই দেওয়া হলো লঙ্কা
ফোড়ন
তখনই এলো দুই আগন্তুক, হাতে সাব মেশিনগান
ছদ্মবেশ ধরার কোনো চেষ্টাই নেই, চোখে নেই দ্বিধা
কেউ কারুকে চেনে না, এদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও শত্রুতা
ছিল না
সেই দুই কাল্পনিক দেশপ্রেমিক ছেলেখেলার মতন চালিয়ে দিল
গুলি
উল্টে গেল ডালের গামলা, ছড়িয়ে গেল বাসনা-নিশ্বাস লাগা
রুটি রাশি
জানলোই না কেন তারা মরছে, বুঝলোই না মৃত্যুর রূপ কেমন
পঁচিশজন সেখানেই শেষ, বাকিদের ছিন্নভিন্ন হাত-পা
এবার ছুটে আসবে শকুন-শেয়ালের পাল....

দুই আততায়ী অস্ত্রের নলে ফুঁ দিয়ে ধীর পায়ে উঠে গেল
জিপে
গ্রামের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা
কোনো বাড়িতে শ্বেত শ্মশ্রু এক বৃদ্ধ পাঠ করছেন গ্রন্থসাহেব :
“সাধো মন কা মান তিআগউ
কাম ক্রোধু সংগতি দুরজন কী তাতে অহিনিস ভাগউ...”
জমির ফসলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুবাতাস
এই মাত্র চাঁদ উঠে ছড়িয়ে দিল জ্যোৎস্না

তুলসীদাসের দোঁহায় রামের গুণগান করছিল যে শ্রমিকটি

তার কণ্ঠ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে
রামচন্দ্রজী, তোমার ভক্তদের তুমি রক্ষা করলে না ?
যারা অযোধ্যায় মসজিদ ভেঙে রামমন্দির বানাবার জন্য উন্মত্ত
তারাও কেউ এইসব মানুষদের বাঁচাতে আসবে না কোনোদিন
গুরু নানক, আপনি দেখলেন আপনার রক্তপিপাসু ভক্তদের
এই লীলা
গুরুজী, গুরুজী, আপনার নামে ওরা জয়ধ্বনি দিয়ে গেল ?

জম্মু থেকে এই শনিবারই একটা বাস ছাড়লো
সকাল সাড়ে আটটায়, যাবে কাঠুয়া
ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, শোনা যাচ্ছে মিশ্র কলস্বর
মায়েরা সামলাচ্ছে বাচ্চাদের, এক কিশোরীর হাতে
জিলিপির ঠোঙা
জানলায় থুতনি-রাখা তার ছোট ভাইটির চোখে বিশ্বজোড়া
বিস্ময়
আকাশ আজ প্রসন্ন নীল, উপত্যকায় উড়ছে কুসুম রেণু
যাত্রীরা কেউ ফিরছে গ্রামের বাড়িতে, একজন যাচ্ছে বিয়ে
করতে
আপন মনে বাসটা যাচ্ছে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
একটা বাঁক পেরুবার মুখেই বজ্রপাতের মতন বিস্ফোরণ
উড়ে গেল জিলিপির ঠোঙা ধরা কিশোরীর হাত
বালকটির ছিঁড়ে যাওয়া মুণ্ডুতে চোখ দুটো নেই
সন্তানকে বুকে জড়ানো জননী আর্ত চিৎকারেরও সময়
পেলেন না
কালো বোরখা পরা আর একটি রমণীর নিস্পন্দ শরীর
এই প্রথম উন্মুক্ত হলো প্রকাশ্যে
বলশালী পুরুষদেরও শেষ হয়ে গেল সব নিশ্বাস
মোট সতেরো জন, বাকিরাও মৃত্যুর অতি কাছাকাছি দগ্ধ
কেউ একজন যেন কৌতুক করে রেখে গিয়েছিল একটা
পেনসিল বোমা
সেই হত্যাকারী আল্লার সেবক, ধর্মের ঝাণ্ডা তোলার জন্য
রক্তনদী বইয়ে দিতেও দ্বিধা নেই
যারা প্রাণ দিল তারাও আল্লার সন্ততি
পাঁচ ওয়ক্ত নিত্য নামাজ পড়া দুই প্রৌঢ়ও নিস্তার পায়নি
এক মৌলবী সাহেবের ডান পা অদৃশ্য হয়ে গেছে
হায় আল্লা, হে খোদাতালা, হে খোদাতালা...

মনরোভিয়া, ডেট লাইন একত্রিশে অক্টোবর
কোথায় গেল সেই পাঁচজন আমেরিকান নান ?
আজীবন ব্রতচারিণী, তারা শরীর-মন নিবেদন করেছিল
যীশুকে
আর্তের সেবায় গিয়েছিল দেশ ছেড়ে অমন সুদূরে
কোথায় তারা ? না, হারিয়ে যায়নি, পাওয়া গেছে পাঁচটি
শরীর
লাইবেরিয়ায় যুযুধান দু পক্ষের গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে
ভূলুণ্ঠিত, বেআব্রু, রক্ত-কাদায় মাখামাখি
পরম করুণাময় যীশু কি সেই সময় চোখ বুজে ছিলেন ?

বোসনিয়া-সারবিয়াতে শুরু হচ্ছে গ্যাস যুদ্ধ
এতকালের প্রতিবেশী, শুধু ধর্মভেদের জন্য এত ঘৃণা ?
পশুরাও তো এমন ধর্মে বিশ্বাস করে না
মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের পুড়িয়ে মারছে যে বর্ণগর্বী হিন্দুরা
তারাই বাড়িতে বসে শ্লোক আওড়ায়, সব মানুষেরই মধ্যে
রয়েছেন নারায়ণ !

অন্য কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম, কলম সরছে না আমার
না, কবিতা আসছে না, ইচ্ছে করছে না ছন্দ মেলাতে
খবরের কাগজে, বেতারে, দূরদর্শনে শুধু মৃত্যুর নির্লিপ্ত ধ্বনি
অসহায় বিরক্তিতে ছটফট করছে আমার সমস্ত শরীর
ধর্মশাস্ত্রগুলির মহান বাণী টুকরো টুকরো মনে পড়ে, তাতে
আরও কষ্ট হয়
'হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর দণ্ড তব ?'
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি, কয়েক পা গিয়েই মনে হয়
কোথায় যাচ্ছি ?
কেন উঠলাম, কেনই বা ফিরে গিয়ে বসবো টেবিলে
কবিতা হবে না, তবু লিখে যাচ্ছি এই পঙ্‌ক্তিগুলি
না, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের জন্য নয়, উন্মাদ জল্লাদদের
জন্যও নয়
শুধু আগামী শতাব্দীর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া এই সামান্য
দীর্ঘশ্বাস
মানুষকে ভালোবাসা ছাড়া মানুষের আর কোনো ধর্মই থাকবে
না
তখন, তাই না ?

একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা

একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা, তার তলাতে আমরা ন'জন
কাঁথাটার ওপরটায় বেশ নকশা কাটা, সুতোয় তোলা ফুল ফুটেছে
অনেক সুনিশ্বাসের গন্ধ
আঙুলে সূচের খোঁচায় বিন্দু বিন্দু রক্ত প্রায় দেখাই যায় না
সে সব তো পুরোনো কথা, কেই-বা আজ মনে রেখেছে
একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা, তার তলাতে আমরা ন'জন
পিঠের নীচে তেঁতুল পাতা, তাতে সব পিঠ এঁটে যায়
কিন্তু এই ছেঁড়া কাঁথায় শীত যাবে না, গা ঢাকে না
এদিক টানলে ওদিক উদলা
এ পাশের এই পুরুষটির যে গায়ে একটা গেঞ্জিও নেই
ও পাশের ওই মেয়েটির তো জ্বর এসেছে, ওর জন্য মায়া হয় না ?
শিশুটিকে শীত দিও না, ও যে আজ খায়নি কিছুই
সারাটা রাত কাঁথার টানাটানি চললে কে ঘুমোবে ?
ঘুম না হলেই ঝগড়াঝাঁটি
ঘুম না হলেই ধানের ক্ষেতে ফসল উধাও
একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা তার তলাতে আমরা ন'জন
তবে কি আর গড়বে না কেউ তাজমহল, বা
নদীর ওপর হবে না আর নতুন সেতু
গানের জলসা শূন্য থাকবে, মাছি উড়বে ?
একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা, তার তলাতে স্বপ্নও নেই ?

জলকে ভয় কি, জল তো শুধুই জল

জলকে ভয় কি, জল তো শুধুই জল
কিছু বুক-ডোবা, কোথাও পায় না পা
দিগন্ত ছোঁয়া তবুও অকূল নয়
এদিকে শ্যাওলা, ওদিকে পদ্মদাম
নীলিমা ভেঙেছে সবুজেটে মৃদু ঢেউয়ে
কেউ ভেসে যায়, কেউ ফিরে আসে কাছে
জলকে ভয় কি জল তো শুধুই জল
সাঁতার জানো না বাংলার যৌবন !

জলের ভেতরে আবাল্য লুকোচুরি
পথ নেই আর এরকমই পারাপার
আচমকা ঘাড় ঠুসে ধরে যদি কেউ
বুক ফেটে যায় তবু আকুপাকু শ্বাস
এক ঢোঁক খাওয়া আঁশটে ঘোলাটে জল
চরণামৃত যেমন নোংরা হয়
সাপের লেজের ছেঁটকানো ছিটে ফোঁটা
মিনু বৌদির অশ্রুর মতো স্বাদ।

রাত্রি ছড়ানো শান্ত গভীর জল
চাঁদের ছায়ায় হাতছানি দিয়ে ডাকে
জল নেই, রুখু মাঠে জ্বলন্ত স্রোত
শুকনো নদীর চরায় দীর্ঘশ্বাস
তবু ডাকে ঠিক শরীরের মতো ডাকে
রতি ব্যাকুলতা, ঈর্ষার বাহুপাশ
লকলকে জিভে নিজের রক্ত চাটে
ঘুমের ভেতরে ছুটে আসে হু হু বান

জলকে ভয় কি, জল তো শুধুই জল....

তোমার হাত

নিছক জ্যোতিষী বলেই তুমি লোকটার সামনে বাড়িয়ে দিলে
তোমার সাবলীল হাত
তোমার মায়াবিনী হাত
অস্পৃষ্ট, নির্জন বেলাভূমির মতন হাত, দিগন্তে লালচে আভা
বাতাসে ওড়া নিশ্বাসের মতন কত অসমাপ্ত রেখা
অসমতল প্রসারিত দেশ
ঈষৎ কাঁপা আঙুলে দুলছে তেইশ বছরের হৃদয়
অনেক গোপন দুপুর, অনেক কান্না
তোমার হাত, অলৌকিক ইঙ্গিতময় হাত
ঐ লোকটা কী বিড়বিড় করছে তোমার হাত ছুঁয়ে
জানো না, জ্যোতিষীরা সবাই অন্ধ হয় ?

সময়ের চিহ্নগুলি সময় মানে না

চাঁপা গাছটি যুবতী না বুড়ি
চাঁপা তার বয়েস জানে না
পাহাড় ডিঙিয়ে আসা ঝরনার দুধারে কত নুড়ি
সময়ের চিহ্নগুলি সময় মানে না
বাতাস কী কথা বলে শীর্ণতোয়া নদীটির কাছে ?
আছে, আছে, আছে।

সেই বার্তা নিয়ে উড়ে যায় একটি আচাভুয়া পাখি
কোনো কোনো মানবীরই মতো তার ডানা
আকাশে তখন কালো দুরন্ত বৈশাখী
শুধু মনোলোকে দেয় হানা
চরাচর মুখ গোঁজে, পাশ ফেরে অরণ্যের ঘুম
নগরে তখন বৃষ্টি, নাগরীর নূপুর মত্ততা
ভেঙে দেয় রাত্রির নিঝুম
কথা ভাঙে, কথা ভেঙে ভেঙে হয় পাহাড়ের মতো নীরবতা.....
বাতাস তবুও কিছু বলে কানে কানে
সম্রাট অশোক তার মর্ম লিখে গেছেন পাষাণে।

ছাতিম গাছের নীচে বসে আছে যে-অন্ধ ভিখারি
অন্ধকারে মুছে যায়, ভোরের আলোর সঙ্গে জাগে
হাতের আঙুল কাঁপে, মুখে বল্মীকের ঘর বাড়ি
সে ওখানে গেড়ে আছে গৌতম বুদ্ধেরও কিছু আগে
গ্রামে গঞ্জে শুকনোস্তনী ঘোরে আম্রপালী
দিবাস্বপ্নে হানা দেয় মার
আয়ুর কৃপণ যত মুষ্টি আঁটে, খসে যায় বালি
ঘানির চাকায় ঘোরে মায়ার সংসার
বাতাস গোপনে তবু কী যে বলে খর্জুর বৃক্ষকে
মরুদেশ কাঁদে সেই শোকে।

পিতার অতৃপ্তি পুড়ে ছাই হলো গ্রামীণ আগুনে
পিতামহ রেখেছেন কাঠের সিন্দুকে দীর্ঘশ্বাস
কেউ যায় নিরুদ্দেশে, কেউ বাঁচে গোলাপের পাপড়ি গুনে গুনে
পাপোশের ধুলো চেটে যেন কার হলো স্বপ্ন নাশ।
দর্পণের উল্টো পিঠ কেউ মনে রাখে ?

ঘড়ির শিকারি চেনে কালপুরুষের মৃদু হাসি ?
মুষ্টিবদ্ধ বাঘনখে যারা বন্ধুদের গাঢ় আলিঙ্গনে ডাকে
তাদেরও উত্তরমেঘ নয় অবিনাশী
বাতাস তবুও বলে, আয়, কাছে আয়
দিন যায়, কেন বৃথা যায় !

হে সময়, একমুখী ধাবমান তীর, হে সময়
হে শতাব্দী, অলীক সীমানা
গানের মুদারা-তারা, প্রতীক্ষিত সম, শেষ নয়
আমি আছি, আমি নেই, তবু সব জানা
বাতাস কখনো ঘূর্ণি, আবার স্রোতের মতো বলে যায় হৃদয়ের কাছে
আছে, সব আছে !

নিজস্ব ভাষা

আমি এখনো কোনো পাখির ভাষা জানি না বটে, কিন্তু গাছের ভাষা জানি। এক রকম দু'রকম গাছ নয়, অনেক রকম গাছের।

সুতরাং ইস্টিকুটুম পাখিটির সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমি দেবদারু গাছকে অনুবাদক হবার জন্য অনুরোধ করি। আমাদের সংলাপের মধ্যপথে পাশের রাধাচূড়া গাছটি হেসে ওঠে। হাসির কোনো অনুবাদ করবার দরকার হয়না, পাখিটি ও আমি একসঙ্গে বুঝি।

পাখিটি তখন জানালো, যে খবর তুমি গোপনে চেয়েছিলে, তা সর্বজনীন হয়ে গেল। এমন অনুবাদের ভাষায় কথা কইতে গিয়ে আমি আগেও অনেকবার নিরাশ হয়েছি। যেমন, প্রিয় নারীর ভাষা বোঝা কত শক্ত। তার চেয়েও শক্ত তাকে আমার ভাষা বোঝানো। সেই নারী রাজপথকে মনে করে মশারি আর দুঃখকে মনে করে সাঁতার। সেই জন্য আমি পাহাড় ও নদীর সাহায্য চেয়েছি। নদীর ভাষা নারীরা বোঝে, কিন্তু নদীমাত্রই বিশ্বাসঘাতক। নদীও নারীকে চায়। আমার কথা না জানিয়ে নদী সেই নারীকে তার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার কথা জানায়।

পাহাড়েরও পক্ষপাতিত্ব আছে। সে এক নারীর বদলে অন্য নারীর প্রতি উপমা বদল করে। যাকে আমি মরালগ্রীবা বলেছি, তাকে সে মাধবীলতা বলে। একমাত্র বিশ্বাস করা যায় রাত্রির আকাশকে। উদার উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু প্রকৃত নিঃসঙ্গ না হলে

সেরকম আকাশ কেউ দেখতে পায়না কখনো।
তাই বলা হয়না, বলা হয়না, কিছুই বলা হয়না!

মুহূর্তের অস্থিরতা

বারুদ রঙের এক বাড়ি, তার বারান্দায়
শীতের রোদ্দুরে
আমারই মনুষ্যদেহ।

বাগানে অনেক ডালপালা, তার এক ডালে
কুসুম ফোটেনি
সেখানে আমার আত্মা।

কখনো আমার হিম আত্মা এই নরদেহ
চেয়ে চেয়ে দেখে
দেখার মতন দেখা।

কখনো লৌকিক চোখদুটি সুড়ঙ্গ দেখার
মতো সরু চোখে
আত্মার দর্শন চায়।

কিছুই মেলে না
মুহূর্তের অস্থিরতা ঘূর্ণি বাতাসের মতো উড়ে গেলে
আয়নায় রক্তের ছাপ পড়ে
আমারই থুত্‌নির রক্ত—

সাঁজোয়া গাড়ির সামনের দিকে

সাঁজোয়া গাড়ির সামনের দিকে উত্থিত লিঙ্গের মতো
কামানের ডগায়
কেউ একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিল।

বৃষ্টি ভেজা সেই মালার সাদা ফুল, কোনো নারীর নরম করতল ছুঁয়ে এসেছে
সেই ফুল থেকে উড়ে এলো একটা পাপড়ি, বাতাসে এক পাক ঘুরে
লাগলো সৈনিকটির হেলমেটের ঠিক নীচে, কপালে
সৈনিকটি সেটা তুলে ফেলতে গিয়ে অনুভব করলো
তার অস্ত্রগুলো হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এত ঠাণ্ডা
তার শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে
সাব মেশিনগানের ম্যাগাজিন খালি করে সবকটা বুলেট
সে ছড়িয়ে দিল রাস্তায়
তারপর গা গরম করে নাচতে লাগলো দু'হাত তুলে...

রাস্তায় গড়িয়ে যাওয়া সেই বুলেটগুলোর একটা
কুড়িয়ে পেল এক পাঁচ বছরের বাচ্চা
দৌড়োতে দৌড়োতে বাড়ি ফিরে সে হাতের রক্তিম মুঠো খুলে
সদ্য জেগে ওঠা একটা ঝর্নার স্বরে বললো,
মা, এই দ্যাখো
মা তখন বাগানে একটা মুমূর্ষু টিউলিপ চারায় জল দিচ্ছিলেন
পাহাড়ের কুয়াশার মতন মুখ তুলে দেখলেন
ছেলের চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,
ছিঃ, এটা নোংরা, ধরতে নেই রে !
মায়ের হাতে কোন বীজাণু লাগে না, তিনি সেটা তুলে নিয়ে
ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নদীর জলে
নদীও সেটা গ্রহণ করতে চাইলো না, নদী ভুরু কোঁচকালো
মেঘের মতন ঢেউ তুলে যাচ্ছে নদী, একটা আলাদা তরঙ্গে
বুলেটটাকে গর্ভ থেকে তুলে
ফেলে দিল এক নির্জন বালিমাখা ঝোপের মধ্যে....

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে
এই পৃথিবী থেকে মুছে গেছে সমস্ত সীমান্তের কাঁটাতার
এখন অস্ত্র বলতে আছে শুধু মানুষের শরীর
এখন সব যুদ্ধই অতি ব্যক্তিগত, খুবই নিভৃত, যে
হেরে যায়, সে বেশি হাসে
সেই রকমই একটি দিনে এক যুবতী আর তার সখা ছুটে যাচ্ছে
নদীর প্রান্ত দিয়ে
একটা ঝোপের পাশে এসে তারা দেখতে পেল সেই বুলেট
যুবতীটি সেটা কৌতূহলে তুলে নিতেই বুলেটটি বলে উঠলো
এতদিনে আমার মুক্তি হলো, শোনো একটা

ফুলের মালার গল্প....
সেই ঝোপটাতে ফুটে আছে অনেক নাম-না-জানা কুসুম
গল্প শুনতে শুনতে ছেলেটি তুলতে লাগল একটির পর একটি
মেয়েটি মাথার চুল ছিঁড়ে গেঁথে নিল দুটি মালা
তারপর সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে মালা দুটিকেই
দুলিয়ে নিল গলায়
ফুল-শরীরে নগ্ন হয়ে নামতে লাগলো নদীর জলে
নদী ছলোচ্ছল খুশিতে বললো, এসো—

আমাকে যেতে হবে

এলোমেলো বাতাসে ঘুরছে আমার না-লেখা কবিতা
সকালের ঘুম ভাঙায় আমার না-লেখা কবিতা
চায়ের টেবিলে অতিথি, তার মাথার পেছনের দেয়ালে আমার
না-লেখা কবিতা
সমস্ত কথা মিলিয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের মতন
আমি জুতোর ফিতে বাঁধছি, আমার বুকে টনটন
করছে না-লেখার দুঃখ
প্রথম লাইনটি ম্যাজিকের মতন অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার আড়ালে
পথে পথে এত জনস্রোত, তার সঙ্গে মিশে আছে আমার
না-লেখা কবিতা
নারীর এক-পাশ ফেরা মুখ, অশ্রুত হাসি, ঝনঝন করছে
আমার না-লেখা কবিতা
বিকেলের ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ আমি ছটফট করে উঠি
এ পৃথিবীর সব কিছুর বিনিময়ে যেন যেতে হবে
আমার না-লেখা কবিতার কাছে
আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে, আমাকে
যেতে হবে !

একবার বুক খালি করে বলো

মনে করো তুমি মধ্যরাত্রি পেরিয়ে পৌঁছোলে সেই জঙ্গলে
ডাকবাংলোর দরজায় প্রকাণ্ড তালা
বারান্দায় পড়ে আছে একটা মরা কবুতর
তুমি মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলে নাচানাচি করছে অন্ধকার
ধুলো চেটে চেটে খাচ্ছে বাতাস
আর কেউ নেই, তোমার সঙ্গীর নাম নিঃসঙ্গতা
বেশ, এবারে বসো পা ঝুলিয়ে, শুরু হোক কথাবার্তা....

তোমার বয়েস কত ? চুয়াল্লিশ
আর নিঃসঙ্গতার বয়েস ?
তুমি যখন ঘুমোতে যাও, তখনও কি সে জেগে থাকে ?
আলো নেই একবিন্দু, তবু কী দেখেছো তুমি ?
তোমার খিদের মতন ভালোবাসা, না ভালোবাসার মতন
খিদে ?
লঘু যৌবনে ভুল মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে তুমি কী চেয়েছিলে
তলোয়ার, না টর্চ ?
প্রশ্ন চিহ্নের চেয়ে তোমার বিস্ময় চিহ্নের ব্যবহার বেশি ?
তোমার পাশে বসা সঙ্গীটি তোমার কাঁধে কখনো হাত রাখে ?
তোমার তখন শরীর কেঁপে ওঠে, না নিঃশ্বাসগুলো লম্বা হয় ?
আকাশের দিকে তাকিয়ে তুমি কখনো সাদা মেঘ, সাদা মেঘ
বলে কাতর চিৎকার করেছিলে ?
অনেকগুলো সুতো ছিঁড়তে ছিঁড়তে তুমি খুলতে পেরেছো গিঁট ?
প্রথম কবে শুনেছিলে একটা অদৃশ্য রথের তীব্র ঘর্ঘর শব্দ ?
শেষ কবে তোমার চোখের জল উপহার দিয়েছিলে ?
কাকে ?
বলো, বলো, একবার বুক খালি করে বলো,
চুপ করে থেকো না !

লাল ধুলোর রাস্তা

চলন্ত ট্রেন থেকে দেখা একটা লাল ধুলোর রাস্তা
আমি ঐ রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি, আবার আমিই ট্রেনের জানলায়

আমার দু'পায়ে পৃথিবীর রং, কাঁধে একটা পুঁটুলি
ট্রেনের কামরায় অট্টরোল, আমার পাশ দিয়ে হাঁটছে
একটি ছাগল চড়ানো বুড়ি

লাল ধুলোর রাস্তাটা কোথায় গেছে ? দু'পাশে ফসল-কাটা মাঠ
মাঝে মাঝে দু'-একটা তালগাছ, অচেনা বুনো ঝোপ
ঐ দিকের দিগন্তে লেগে আছে বড় মায়াময় জীবন
বিকেলের বাতাসে উড়ছে সম্ভাবনার নীল যবনিকা....
রাস্তাটা এখন অদৃশ্য, ট্রেন ছুটছে আরও দুরন্ত ছটফটানিতে
সকলেরই কোথাও না কোথাও পৌঁছোনোর ব্যগ্রতা
অথচ আমি হেঁটে যাচ্ছি, একটা ছাগলের বাচ্চা তুলে নিলাম বুকে
বুড়িটি ফিক করে হেসে অনাদি কালের ছবি হয়ে গেল।

কোথায় আমার দেশ

বাগানে নাম-না-জানা আগাছার উঁকিঝুঁকি, তবু মনে হয়
এক কোণে পরমার্থ মাথা গুঁজে আছে
উড়ে যায় গ্রীষ্ম-পরী, দৃশ্যের বিভায় এত আগুনের আঁচ
আমার মাটিতে চোখ, আমার মাটিতে কান
ধুলোমাখা ঠোঁট
বৃষ্টি নেই, অশ্রু নেই, আকাশ হারিয়ে গেছে কানামাছি ভিড়ে
হে মাটি, তুমি কি দেশ, তুমি কি জন্মের গল্প জানো ?
কোথায় আমার দেশ, সীমান্তের কাঁটাতারে
ছেঁড়া সুতো, ইতিহাস গড়াগড়ি যায়

বলো বলো, হে বধির, কোন্ দিকে যাবো
ছুরিকা ও ক্ষেপণাস্ত্র, মাথা নিচু করে আমি
এঁকে বেঁকে ছুটি
পৃথিবী এমন ছোট, দু'পা গেলে শেষ হয়ে যায়
কোথায় আমার দেশ, কোন্ দিকে, কোন্ অমরায়
শূন্যের গোলকধাঁধা, ধ্বংসের সহস্র আলো,
ধিক তোকে ওপেনহাইমার

মাটি এত প্রিয়, কত প্রণয়ের গন্ধ মাখা, তবু
মাটির গভীরে নেই
স্বপ্নের স্বদেশ !

এ জন্মের উপহার

কোলের ওপরে মাথা ভোরের আঙুলে মালা গাঁথা
বৃষ্টি মেঘময় দিন আবছায়া কিছুটা রঙিন
আমাকে ডেকেছো তুমি তোমার নিজস্ব বনভূমি
থেমে আছে সব কথা তোমারই রচিত নির্জনতা
সোঁদা গন্ধময় ঘাস মনে হয় সহসা প্রবাস
ঝরনা নদী নেই কাছে কুলু কুলু শব্দ তবু আছে
ওষ্ঠের অমৃতপান মালাখানি অলীকের গান
এখন পড়ে না মনে বেঁচে আছি কোন্ সন্ধিক্ষণে
নেই লোভ তৃষ্ণা ক্ষুধা মূর্তিমতী তুমিই বসুধা
এই দৃশ্য এই মায়া তোমার ছায়ার সঙ্গে ছায়া
এ জন্মের উপহার শরীরের ক্ষণিক উদ্ধার
গানখানি শেষ শুনে ঝাঁপ দেবো আবার আগুনে ।

ভুল স্টেশানে

ভুল স্টেশানে নেমে গেল মোয়াজ্জেম, তখন
মিশমিশে মাঝরাত
সে অনেক দিনের কথা, সবটা ঠিক মনে পড়ে না
স্কুল সখার সঙ্গে মান অভিমানের কোনো ব্যাপার ছিল ?
কিংবা সেই স্টেশানেই ছিল তার বাড়ি
শুধু মনে পড়ে ঘুমন্ত কামরা থেকে যেন ঝাঁপ দিয়েছিল
সে

রাত জাগা চোখে চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে অন্ধকার

দেখা আমার নেশা
দৃশ্যের চেয়েও অদৃশ্যের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টি
কখনো আবছা জোৎস্নায় সরলবর্গীয় বৃক্ষেরা
আমায় ডাকে
আদিম হ্রদ থেকে হঠাৎ যেন মাথা উঁচু করে শৈশব
দেশ-দেশান্তরে যখনই রেলগাড়িতে ঘুরি, রাত্রে ঘুম আসে না
ঠায় বসে থাকি জানলায়, অন্ধকার চলচ্চিত্র দেখায়
নিজের গালে হাত বুলাই, কনুইয়ের ফুস্কুড়িকে আদর করি
বড় একা লাগে, বড় চমৎকার লাগে
বিদেশের কোন্ অচেনা স্টেশানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
আমি আচমকা চেঁচিয়ে উঠি, মোয়াজ্জেম, মোয়াজ্জেম !

তিনটি প্রশ্ন

প্রণামের ছলে খুব কাছে এগিয়ে গিয়েছিল আততায়ী
প্রণামের কী যে অভারতীয় অপব্যবহার !
তারপর তিনটি বুলেট, ধ্বনি নয়, বিমূঢ় প্রতিধ্বনি
নগ্ন বক্ষ ফুঁড়ে বেরুচ্ছে রক্তের ধারা, তিনি তবু এগিয়ে গেলেন কয়েক পা
প্রার্থনা মঞ্চের দিকে, হাত জোড় করা, প্রার্থনা আর হলো না
তিনি শুধু শেষ উচ্চারণ করলেন, হে রাম
রামরাজত্বের রাম, দরিদ্রের কাল্পনিক মুক্তিদাতা, না নাথুরাম ?
ছন্নছাড়া, অতিকাতর, উদভ্রান্ত, তবু স্বাধীনতার বিবেক,
তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে ।

সবাই বলে, গান্ধীজী মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য
প্রাণ দিয়েছিলেন
ক'জন মুসলমানের বাড়িতে গান্ধীজীর ছবি টাঙানো থাকে ?
পাকিস্তান-বাংলাদেশে কেউ গান্ধীজীর নাম সচরাচর
উচ্চারণও করে না
কেউ মনে রাখেনি, দেশ বিভাগের জন্য যিনি মাতৃহীন শিশুর মতন
অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন
হিংসার দৈত্যের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন ক্ষুদ্র শরীরে অসীম সাহসী
অহিংসার তেজ নিয়ে

কেউ মনে রাখেনি, মনে রাখলেই জাগবে পাপবোধ
তিন খণ্ড হতে চায় আরও অনেক খণ্ড, কাঁটাতারের বেড়াজালে
তিনি কোথাও নেই
ছুরিতে ভাগ করা তাঁর স্বদেশে আজ ঝলসাচ্ছে
আরও অসংখ্য ছুরি
সবরমতী আশ্রমের সামনেই গড়াচ্ছে রক্তস্রোত....

তিনটি গুলির প্রতিধ্বনি আজও বুকের মধ্যে তোলে
তিনটি প্রশ্ন
পাবে ? পাবে ? পাবে ?
সনাতন ধর্মকে বসাও সিংহাসনে, সমস্ত মানুষ মুক্তি পাবে ?
পূর্বে ও পশ্চিমে ধর্মের ধ্বজা নিয়ে গড়া হলো যে-যে রাষ্ট্র
সেখানে ইসলামের সমভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ?
কেউ অমিত ভোগের লাস্যে হা-হা করে হাসে
কেউ ক্ষুধায় ভূমিতে জিভ ঘষে
ধর্ম ব্যবসায়ীরা কেউ ধর্ম মানে না
বাবরি মসজিদে ধর্ম নেই, রাম মন্দিরে ধর্ম নেই
হিন্দু মুসলমানকে মারবে, মুসলমান হিন্দুকে মারবে
পেছনে মুণ্ডওয়ালা একদল অদ্ভুত প্রাণী খুন করবে
আর একদল পেছনে মুণ্ডওয়ালাদের
মন্দির ভাঙবে, মসজিদ ভাঙবে, আবার মন্দির ভাঙবে, আবার মসজিদ ভাঙবে
এর বস্তিতে আগুন, ওর বস্তিতে আগুন
আবার মারো, এ ওকে মারো, সে তাকে মারুক
শিশুকে কেড়ে নিক, জননীকে পোড়াক
আবার ধ্বংস, আবার আগুন, আবার মারো,
মারো, মারো, মারো
শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছোবে ?

বুকের কাছে

শুকনো ডালে দুলছে আলোয় হলুদমাখা আলোকলতা
ওর ভেতরে কিছু একটা লুকিয়ে আছে
আকাশভরা ছেলেবেলার গানগুলো কে হারিয়ে দিল পুড়িয়ে দিল

সে গান ছাড়া মানুষ বাঁচে ?
বৃষ্টি-মাদল নদী শুনছে, আর কে শুনছে, যার যেখানে যাবার সময়
দু-একবার পেছনে চাওয়া
পোশাক টানে কিসের কাঁটা
দিঙনাগেদের খেলার ভুবন ছড়িয়ে আছে শব্দ-রেখায়
ব্যস্ত পাগল বুকের কাছে।

এমন দিন, কিছু রঙিন, কিছু ভুলের জীর্ণ পাতা,
নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে দ্যাখো, দ্যাখো
ঐ তো সেই অপ্সরাদের গানের খাতা ?
ধরো ধরো, মাঝি মাল্লা দৌড়ে এসো, চক্ষে ধাঁধা
নদীতে নেই, পাখির বাসায়
ধুলোর মধ্যে সুরের কণা
সর্ষে খেতে দুলছে ভ্রমর, চিরকালের সেই মধু-চোর
সেও জানে না ফুলের মধ্যে আর একটা কী লুকিয়ে আছে।

নির্মাণ খেলা—তিন

কাঁখে গাগরী, চলেছে নাগরী, সুঠাম তনুখানি
ছন্দ মিলে ঘেরা
[এরকম লাইন মনে এলেও তা নিয়ে কবিতা লেখা চলে না। কোমরের বদলে 'কাঁখে'র মতন আর্কেইক শব্দ কখনও কখনও ব্যবহার করতে ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে 'নাগরী' ও 'তনু' যোগ করলে একেবারে বৈষ্ণব কবিতার ধাঁচ এসে যায়। কিছু কিছু বাংলা গানে তবু এখনও এ রকম চলে। আমি গান লিখি না।
কিন্তু ছবিটি ? নারী শরীরের বর্ণনা প্রত্যেক পুরুষ কবির কলমে শিক্ষানবিশির পরীক্ষার মতো। সারা জীবন ধরেই এই শিক্ষানবিশি চলে। যারা ছবি আঁকে তাদের যেমন বহু ভঙ্গিমায় নগ্ন নারী-শরীরের রেখাচিত্র রচনায় পারদর্শিতা আয়ত্ত করতে হয়। গোধূলিবেলায় নরম আলোয় একটি বা কয়েকটি রমণী কোমরে কলসি দুলিয়ে পুকুর থেকে জল আনতে যাচ্ছে, এই দৃশ্য চিরকালের। শুধু দেখার চোখ ও ভাষা বদলায়।]
কাঁখে সোনার কলস যায় নদীর কিনারে, দ্যাখো
কুচকুচে কালো এক রাধা
এত পাতলা শরীর যেন খায় না দু'বেলা, তার
বিষের লতায় চুল বাঁধা

[পেতলের কলসি খুব ঝকঝকে করে মাজলে সোনার চেয়েও উজ্জ্বল হয়। আমরা কেউ সত্যিকারের সোনার কলস দেখিনি। 'সোনার কলস' আবার অনেক সময় কোনও নারীর যৌবনের উপমা। 'কী করে বলো তো ভাঙলে তোমার সোনার কলসখানি ?' লতা দিয়ে কোনো মেয়ে চুল বাঁধে কি না তা আমি জানি না। কিন্তু 'বিষের লতায় চুল বাঁধা' এমন বিদ্যুৎ ঝলকের মতন এসে গেল যে বদলাবার প্রশ্নই ওঠে না। 'পাতলা শরীর' না 'চিকন শরীর' ?]

আজ বাতাস উধাও আজ আকাশ কঠিন, আজ
মানুষের চোখে চোখে খরা

[এ কী, এ রকম তো লিখতে চাই নি। একটি রোগা গরিব, কালো কিশোরীর নদীতে জল সইতে যাওয়ার বর্ণনা শুরু করেছিলাম, তার মধ্যে খরা টরা এসে গেল কেন ? কী ভাবে যে আসে কে জানে। এটাই তো কবিতায় ম্যাজিক। এর পর অবধারিত...]

আজ আকাশ উধাও, আজ আকাশ কঠিন, আজ
মানুষের চোখে চোখে খরা
ছেঁড়া শাড়িটি কখনো ছিল নীল বা নীলের মতো
এখন সকল রং হরা

দেখা যায় না কোমর, ওর বুকের আঁচলে ধুলো
মন ছাড়া হাঁটে পায় পায়
ঠোঁটে অতীব গোপন কথা কাকে সে
শোনাতে পারে ?
নদী তাকে ডাকে আয় আয়

[নারীর বর্ণনা কিছুই হলো না। বাকি রয়ে গেল, পরবর্তী কিংবা তারও পরবর্তী কবিতার জন্য !]

স্টিফেন হকিং-এর প্রতি

যখন তাঁর বয়েস একুশ
প্রখ্যাত কয়েকজন ডাক্তার সখেদ গাম্ভীর্যে বলেছিলেন
স্টিফেন, তুমি আর বড় জোর আড়াই বছর বাঁচবে,
আমাদের আর কিছু যে করার নেই !
অসুখের নাম মোটর নিউরোন, চিকিৎসা শাস্ত্রের অতীত
একটার পর একটা অঙ্গ পঙ্গু করে দিয়ে হৃৎপিণ্ডের গলা টিপে
মারে

তবু সেই একুশ বছরের যুবকটির মস্তিষ্ক সেই অসুখকে চ্যালেঞ্জ
জানিয়েছিল
তুমি আমার শরীরকে হারাতে পারলেও আমাকে জয় করতে
পারবে না
দ্যাখো, আমি বাঁচবো, বাঁচার সমস্ত সম্ভোগ নিয়ে বাঁচবো

একদিকে নষ্ট হতে লাগলো শরীর, অন্য দিকে তীক্ষ্ণতর
হতে লাগল মেধা
আজ স্টিফেন হকিং-এর বয়েস পঞ্চাশ বছর
এই শতাব্দীর দ্বিতীয় আইনস্টাইন
অপ্রতিদ্বন্দ্বী পদার্থবিদ, মহা বিশ্বতত্ত্বকে ধরেছেন গণিতে
চলৎ-শক্তি নেই, তবু তিনি জানেন এই পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য
এবং ধ্বংস নিয়তি
যাকে বাঁধা যায় না, সেই সময়কেও বেঁধেছেন ইতিহাসে
কথা বলতে পারেন না, আবিষ্কার করেছেন নীরব প্রেমের ভাষা
তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী, তিনি দিয়েছেন অনুভবের
মাধুর্য
তিনটি সন্তানের অলৌকিক পিতা হতে গিয়ে
প্রত্যেকবার বলেছেন,
অসুখ, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমার জেদ
সীমাহীন করেছো

কবিদের পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞানীকে জানাই সহমর্মিতা
এই একজন স্রষ্টা, তিনি মৃত্যুর মুখে চুনকালি দিয়ে
নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছেন অনবরত....

এক পলক অতীত

নীল রঙের গাড়িতে যে-লোকটি এই মাত্র পেরিয়ে গেল
শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়
সেই লোকটিই একদিন মাঝরাতে, ঐখানে, বাজারে রেলিং-এর সামনে
ভুঁইফোঁড় আততায়ীদের হাতে অকারণের চেয়েও অকারণে
মার খেয়ে লুটিয়ে পড়েছিল ধুলোয়

তারপর অন্তত কোটিখানেক মানুষের পা মাড়িয়ে গেছে
সেই জায়গাটা
দোকানগুলো বদলে গেছে, অন্যরকম গন্ধ
শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় রমরম করছে সন্ধেবেলা
হকারের চিৎকারে
কষা মাংসের দোকানের সামনে ভিড়, দোতলা বাসের ধোঁয়ায়
ঢেকে গেল তিনটি রমণীর মুখ
নীল গাড়ির লোকটির চোখে চশমা, হাতে সিগারেট, ওষ্ঠে
গম্ভীর রেখা
সে এক পলকের জন্য দেখলো, সেই মাঝরাতের ধুলোয়
পড়ে থাকা ছেলেটি, সারা মুখে রক্ত মাখা
জামার পকেট ছেঁড়া, এক পায়ে চটি নেই
সে পাগলের মতন খুঁজছে তার হারিয়ে যাওয়া
কলমটা
শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছিল, না পায়নি ? ঠিক মনে পড়ে না....

শিল্প নয়, তোমাকে চাই

শিল্পে গড়া আঙুল, তাই হাতছানিতে মায়া
কেন ডাকলে চন্দনের বনে হঠাৎ নিরালা সন্ধ্যায়
অনেক দূর চলে এসেছি, অনেক পথ ধাঁধা
বয়েস এমন পাকদণ্ডি যখন তখন হোঁচট
কেন ডাকলে চন্দনের বনে হঠাৎ নিরালা সন্ধ্যায়
ভুলেই গেছি কোথায় সেই যৌবনের হালকা-পাখা দিন
তোমার বুঝি এখনো সেই খেলার সাধ, নীরা ?

পাথরে গড়া মূর্তি নও, স্নিগ্ধ জ্যোতি, ছিলে অমূল তরু
আমি তখন ঘূর্ণি ঝড়ে অশান্তির রুদ্র টংকার
তবু আলিঙ্গন চেয়েছি, পাথর নয়, শিল্প নয়, নীরা
বাতাস-ধোয়া পায়ের পাতা তুমি শুধুই নারীর মধ্যে নারী
রমণী নয়, খুকি, তোমার গ্রীবায় ছিল সারাৎসার লীলা
স্পন্দ্যমান স্তনদুটিতে শুনেছি কান পেতে তোমার উন্মোচনের ধ্বনি
আমার হাত, খুনির নয়, কবির নয়, ঘামে সিক্ত হাত

এখন মাঝে মাঝেই আমার ব্যাকুলতার চোখে দেখার ভুল
রমণী নয়, পাথর, যেন বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত তুমি
ইচ্ছে করে পাথর হতে চাও কি তুমি, হৃদয়ে নয়, পায়ে
পায়ের আঙুল, জঙ্ঘা-উরু, শরীরী নয়, তোমার নয়, নীরা
যেন খোদাই শিল্প, যেন তোমার রূপ অনশ্বর হোক
কেউ চেয়েছে, কেউ তোমাকে জাদুঘরে, প্রদর্শনী শালায়
গৌরবের বন্দিঘরে রাখতে চায়, স্তুতি প্রশংসার নির্বাসনে
তুমিও তাই মেনে নিয়েছো, নরম পা পাথর হতে রাজি ?

কেন ডাকলে চন্দনের বনে হঠাৎ নিরালা সন্ধ্যায়
কোনোদিন কি ফিরবো আর, ফেরার পথে কাঁটা
যদি বা ফিরি, পুরনো সাজ পোশাক নিয়ে, ইঙ্গিতের টানে
কার জন্য ? পাথুরে পা, আধেকলীনা শিল্প কিংবা নারী
আমার নীরা, অথবা ভাস্কর্য হতে হতে ঈষৎ থামা
না না, আমি তোমাকে চাই, মূর্তি নয়, তোমাকে চাই, নীরা
স্বরূপ নিয়ে আয় রে সখী, শরীরে থাক ছটফটানি আলো !

আমার আমি

একটা ডালপালা মেলা গাছের নীচে আমি দাঁড়িয়ে
গাছটা আমাকে আমিত্ব দিচ্ছে
গুপ্ত জলপ্রপাতের মতন ফুঁড়ে উঠছে বাল্যকাল
রোদ্দুর, রোদ্দুরে চকখড়ির অসংখ্য রেখাচিত্র
গাছটা আমাকে আমিত্ব দিচ্ছে

পায়ের নোখে পথ হারা এক পিঁপড়ে কী সুন্দর
এই নিস্তব্ধতার মধ্যে শুনতে পাচ্ছি পিঁপড়েটার পদশব্দ
বাতাস এক ঝলক দেখালো বিশ্বরূপ
খসে পড়লো একটা পাতা
ঝুঁকে তুলে নিলাম, সেই পাতাটায় লেখা আমার জীবনী
পড়তে পড়তে আমি হাসি । এত অচেনা রোমাঞ্চকর
শুধু দুটো একটা কাটাকুটি । জলের দাগ
এক কণা সেই জলের ফোঁটায় জাদু দর্পণ

চোখে ঘোর লাগে, মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়
খুব অচেনা এক আমি।

ছেলে মেয়েদের গল্প

এক পুলিশের দুই ছেলে
একজন ক্লাশ টেনে, অন্যটি চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে
একজন জেলখাটা দেশপ্রেমিকের তিন ছেলে মেয়ে
দু'জন এখনও হাবুডুবু খাচ্ছে, একজন পাড়ার মস্তান
একজন অধ্যাপকের দুটি সন্তানই বিদেশে
এক রেল খালাসীর পাঁচটি, কে কেথায় আছে, ঠিক নেই
এক আদর্শবাদী মন্ত্রীর সবেধন নীলমণিটি
ফুলে ফেঁপে উঠছে কূট বাণিজ্যে
এক সরকারি কর্মচারীর চকচকে মেয়ের স্বয়ংবর সভায়
নেমন্তন্ন খেয়ে ধন্য ধন্য করে গেল চার হাজার
উপহারদাতা
এক চিনিকল মালিকের ছেলে রোজ মুঠো মুঠো চিনি খায়
আর প্রবন্ধ লেখে দীন দুঃখীদের নিয়ে
ফুটপাথে খেলা করে তিনটে বাচ্চা, তাদের কে মা ?
আর কে বাবা ?
এক সাহিত্যিকের ছেলে হরদম ওড়াউড়ি করে বিমানে
জনসভায় গলা ফাটাচ্ছেন যে নেতা, তাঁর ছেলেটি বোবা
এক বাড়ির ঝি পোয়াতি, কাকের বাসায় কোকিলের ছানা...

একবার চাকাটা উল্টোপাল্টা ঘুরিয়ে দাও
মাতৃসদনের সব চাক্তিগুলো এলোমেলো হয়ে গেল
মনে করো
পুলিশ ভুল করে গুলি করে মারছে নিজেরই ছেলেকে ?
ঘুঁটে কুড়ুনীর ছেলে বাণিজ্যের লাইসেন্স পেয়ে গেল
মন্ত্রীর কাছ থেকে ?
সরকারি কর্মচারির চকচকে কন্যা যার গলায় মালা দিল নিরিবিলিতে
সে আসলে রেলখালাসীর কনিষ্ঠটি
চিনি খাচ্ছে ফুটপাথের বাচ্চা আর মালিকের ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে
চাকরির

কিংবা
চড়কের মেলায় এই সব ছেলে মেয়েরাই প্রবল ফুর্তিতে
এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নেচে
চলেছে...

নিজস্ব বৃত্তে

আংটির ভেতরে চাঁদ, সেই চাঁদ এইমাত্র স্নান করে এলো
চাঁদ তো চাঁদেরই মতো, আংটিটাই কিছুটা জটিল
অনাঘ্রাত কুসুমের মতো এই অঙ্গুরীয় কোনোদিন ছোঁয়নি অঙ্গুলি
নিরালায় পড়ে থাকে, নিরালাকে নরম আলোয় ঘিরে রাখে
ঝরে পড়ে শুকনো পাতা সারারাত শিশিরের মতো শব্দ হয়
আর সব মুছে যায়, কুকুর ও মানুষের হল্লা শুধু নিজেরাই শোনে
গভীর নিশীথে জেগে আমি বনপথে যাই বৃত্তটিকে খুঁজি
সে কেবলই সরে যায়, ফুলের রেণুর মতো পড়ে থাকে
গুঁড়ো গুঁড়ো চাঁদ।

এইভাবেই প্রতিদিন

একই বাড়িতে থাকি, সবাই অচেনা
একশো বাহান্নটা দরজা, প্রত্যেকটি দরজার আড়ালে
অন্য মানুষের গল্প, এতগুলি অজ্ঞাতজীবনী
লিফ্‌ট ওঠে, লিফ্‌ট নামে, ছায়াময় মুখ
প্রশ্ন নেই। তাই কেউ উত্তরও দেয় না। হাসি দিতে হয়
অত্যন্ত নিমগ্ন হয়ে যে যার নিজের নাকের ডগা দেখে।
মাথার পেছনে থাকে আয়না, চক্ষুহীন দেখা
মাখনের মতো ঘাড়, চুড়ো বাঁধা চুল, বিদেশি সুগন্ধ মাখা নারী
এত ঘনিষ্ঠতা, এত গরম নিশ্বাস, অথচ কেউ কারুর নয়
নামহীন চোখ, পরিচয়হীন হাত, মন-ছাড়া হাসি

এইভাবেই প্রতিদিন, দিব্যি চলে যাচ্ছে
একটুও অস্বাভাবিক মনে হয় না !

এক বনমানুষ

হাত ধরতে বলো, স্বেচ্ছায় হাত ধরবে না
পা মেলাতে বলো; পা মেলাবে না
একা সরে যাবে, লাফ দিয়ে ছোট্ট এক দ্বীপে
গুটিসুটি বসে থাকবে, ইচ্ছে মতো আঙুল পোড়াবে
কাছেই রয়েছে জল, তবু খুঁড়বে বালি
তার বুকের ক্ষতটি সে কারুকে দেখাবে না ।

দামামা বাজিয়ে ডেকে আনো, অজস্র দ্বীপের
নির্জনতা তছনছ করে ধরে আনো, তখন কথা শুনবে
এক তালে পায়ে পা মিলিয়ে গাইবে গান
আকাশের দিকে তুলবে মুষ্টিবদ্ধ শপথের হাত
শরীরের ঘাম দেবে, কত শত দেওয়াল বানাবে
এমনই বাধ্য যেন ঐকতানে লীন হতে চায়
অথচ রাত্তিরে বারান্দায় দ্যাখো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে
ও সেখানে নেই, হাতের শৃঙ্খলও আর নেই
জেগে উঠছে দ্বীপ, নিজস্ব গাছপালা ঘেরা দ্বীপ
তার মধ্যে এক বনমানুষ, বুকে জন্ম ক্ষত, চুঁইয়ে পড়ে রক্ত
স্নেহ নেই, মায়া নেই, সংসার চেনে না
শিরশিরে ব্যথার মতন একাকিত্বে হাত বুলোয়
তার সমস্ত বাসনা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে যায় বাতাসে
আবার সেই বাতাসই নিঃশ্বাসে টেনে নিয়ে বলে, আঃ
সে কারুকে চেনে না, তাকে কিছুতেই চেনা যাবে না
এ পাশে শিউলি-রঙা ভোর, ও পাশে করমচা-গোধূলি
তার বুকের ক্ষতটিতে ঝলসায় অনেকগুলো শতাব্দীর ব্যর্থতা !

এত চেনা

স্টেশন থেকে বেরিয়েই মনে হলো, এখানে আগে এসেছি
পাশাপাশি দুটি ঝাউগাছ, ওদের মাঝখানের সুরেলা দূরত্ব
খয়েরি পুকুর পাড়ে একটি দীর্ঘগ্রীব বক খুব চেনা
দেড়তলা বাড়িটির পাশ দিয়ে সরু রাস্তা,
এ রকমই তো থাকার কথা ছিল

ঠিক ভেবেছিলাম, দূরে শোনা যাবে গায়ে হলুদের গান
সকাল সাড়ে ন'টার আলোয় সব কিছুই
এত পরিচিত
ছেড়ে চলে গেল ট্রেন, আর একটিও যাত্রী নেই
আকাশে এত কিসের ব্যগ্রতা ?
কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি
এত চেনা, অথচ নাম জানি না, এই
জায়গাটা কোথায়
যেখানে আমিই একমাত্র যাত্রী ?

চলে যাবো ?

শুধু শুধু কত যে সময় নষ্ট, সুন্দরকে দেখি না

গরম ধুলোয় হাওয়ার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি
দু' পাশ দিয়ে কারা বাড়িয়ে দিচ্ছে অতৃপ্ত হাত
একটা পাথরের ঘুমভাঙা না দেখেই চলে যাবো ?
পশুরা মাটির দিকে চেয়ে চলে, মানুষই বা ক'বার তাকায়
আকাশের দিকে ?

পুকুরের জলে পড়লো ঢিল, কী অপূর্ব নিখুঁত বৃত্ত
একটার পর একটা
কোথাও থুতনিতে আঙুল দিয়ে ঘাটে বসে আছে জলকন্যা
তার স্তনবৃন্তে হিরেকুচি, জ্যোৎস্নামাখা চুল
আমি শুধু ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে শুনতে চলে যাবো ?

কত ভালোবাসা বাকি রয়ে গেল, চলে যাবো ?
বুকজোড়া ফাটল, শুধু মন খারাপের ঢালু পথ
ভালোবাসা হলো না, ভালোবাসা হলো না, চলে যাবো ?

নন্দনকাননে দ্রৌপদী

(একটি সংলাপ কাব্য)

[পদব্রজে হিমালয় অতিক্রম করে স্বর্গের সিংহদ্বারে এসে পৌঁছেছেন যুধিষ্ঠির। ধুলোমাখা শরীর, ললাটে অনেক দিনের ঘাম। একজন দেবদূত তাঁকে প্রত্যুদ্গমন করে নিয়ে আসছেন।]

যুধিষ্ঠির : এই স্বর্গ !
দেবদূত : ধর্মপুত্র, ঐ অদূরে আপনার ঈপ্সিত নগরী ।
যুধিষ্ঠির : এই স্বর্গ ?
দেবদূত : সহস্র বিদ্যুতে গড়া বৈদূর্য খচিত এই দ্বার
মেঘের ব্যজনে স্নিগ্ধ, কিছু দৃশ্য, খানিক অদৃশ্য
এই দ্বার পার হলে দেবসেব্য নন্দনকানন
এক পাশে শব্দহীন স্রোতস্বিনী মন্দাকিনী নদী
যুধিষ্ঠির : মায়া নয়, মতিভ্রম নয় ? এই তবে স্বর্গভূমি ?
দেবদূত : বিশ্বাস হচ্ছে না ?
যুধিষ্ঠির : অবিশ্বাস নয়, তার চেয়ে আরও প্রগাঢ় বিস্ময়....
জানতাম কল্পনার সঙ্গে ঠিক মেলে না বাস্তব
জাগ্রত দেখার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর স্বপ্নের নির্মাণ
কিন্তু স্বর্গ, সে যে সব বাস্তবের শেষতম রূপ
সে যে অসীমের চির স্থির এক সৌন্দর্য প্রতিমা
এই কি সে স্বর্গ, কেন মনে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত, সীমিত
আমার স্বপ্নের স্বর্গ যেন অন্য, যেন আরও দূরে ?
দেবদূত : হে পাণ্ডব কুলপতি, আপনার সন্দেহ সঠিক
স্বপ্নে দেখা স্বর্গে কেউ কোনোদিনও পৌঁছোতে পারে না
অথচ তা দূরে নয় । প্রকৃত স্বর্গও কিন্তু নয়
সম্পূর্ণ বাস্তব । এই সিংহদ্বার, নন্দনকানন
প্রতিদিন রূপ বদলায় । রূপের ভিতরে আরও
অসংখ্য রূপক ।
যুধিষ্ঠির : এই সেই ত্রিজগৎ সুবিদিত নন্দনকানন
প্রতিটি বৃক্ষ ও পুষ্প, লতাগুল্ম সম্পূর্ণ অচেনা

স্বপ্নেও দেখিনি আগে। দেবদূত, আমি জেগে আছি ?

দেবদূত : অসম্ভব এই যাত্রা আপনিই সম্ভব করেছেন
প্রথম মানুষ, এক শরীরী মানুষ, মনোবলে
সকল যুদ্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জয়ে মহান বিজয়ী
মৃত্যু অতিক্রম করে এসেছেন পার্থিব আকারে
এই স্বর্গে ! ধন্য ধন্য হে কৌন্তেয়, ধন্য ধরা ধাম।
পারিজাত মাল্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন দেবরাজ
সেই মাল্য স্পর্শে আপনার সর্ব ক্লান্তি দূর হবে

[দ্বারের কাছে দেখা গেল একজন সুপুরুষকে। তাঁর চোখে-মুখে কৌতূহল। তিনি উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন :]

দুর্যোধন : কে আসে, কে নতুন অতিথি ? দেবদূত, কে এসেছে ?

দেবদূত : যাঁকে খুঁজছেন তিনি নন, কিন্তু ইনিই সর্বোত্তম
স্বর্গের অতিথি।

যুধিষ্ঠির : কে ঐ দিব্যকান্তি, সৌম্য, ধীরোদাত্ত সুকণ্ঠ পুরুষ
কোন্ দেব উনি ?

দেবদূত : এখনো দেবতা নন, কিন্তু ব্যবহারে দেবোপম
আপনার ভ্রাতা, পূর্বজন্মে নরপতি দুর্যোধন

যুধিষ্ঠির : দুর্যোধন ?

দেবদূত : ক্লান্ত, ধূলিধূসরিত দেহ, দুই চক্ষুও আবিল
এখনই বিশ্রাম প্রয়োজন, ধর্মরাজ, তাই এমন বিভ্রান্তি
পুনরায় দেখে নিন, উনি কুরুরাজ দুর্যোধন !

যুধিষ্ঠির : দুর্যোধন, যাকে আমি ভগ্ন-উরু, ক্লেদাক্ত, নির্জীব
অবস্থায় শেষ দেখি, দুই চক্ষে ছিল বিষজ্বালা
পরাজয়ে হতমান, অন্তর্হিত বংশের মহিমা
তার এত প্রশান্ত শ্রী, এ যে অসম্ভব দেবদূত !

দেবদূত : হে রাজন, এ যে স্বর্গ, এখানে তো মুছে যায় সব
পার্থিব কলঙ্ক। মন্দাকিনী স্নাত পবিত্র সবাই
ন্যায় নিষ্ঠ ক্ষাত্র ধর্ম মেনেছেন যিনি আজীবন
সমস্ত সমরে শঙ্কাহীন, তিনি দেহান্তর মাত্র
স্বর্গ অধিকারী।

যুধিষ্ঠির : ন্যায় নিষ্ঠ ক্ষাত্র ধর্ম ? অভিমন্যু, নিষ্পাপ কিশোর
তার হত্যা, চরম কাপুরুষতা আরও কত শত

দেবদূত : এখন সে সব তর্ক বৃথা !
ভ্রাতৃহত্যা, বংশধর-সর্বনাশ মানুষেরই খেলা
হত্যার কুযুক্তি আর পঙ্কিল কাহিনী সমুচয়
ভুলে যান, মহারাজ !

[দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে চিনতে পারলেন। সাগ্রহে এগিয়ে এসে সপ্রেমে আলিঙ্গন করলেন ধর্মরাজকে। কিন্তু যুধিষ্ঠির সম-ব্যবহার করতে পারলেন না।]

দুর্যোধন : প্রিয় ভ্রাতা, যুধিষ্ঠির, আজ ধন্য আমি
তোমার স্পর্শের পুণ্যে ধন্য
তোমার সান্নিধ্যে শুধু সত্যের সৌরভ
সেই ঘ্রাণে ধন্য !

[যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের এই ভাষা বুঝতে পারলেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।]

দুর্যোধন : সমস্ত মানবকূলে তুমি অদ্বিতীয়
সশরীরে স্বর্গে এলে
আমরা সেই গৌরবের অংশভাক্।
আমাদের বহুদূর পিতামহ পুরুরবা
তোমার কীর্তির কাছে ম্লান
দেবদূত : এবার চলুন ধর্মরাজ !
দুর্যোধন : ক্ষণেক দাঁড়াও, দেবদূত !
যুধিষ্ঠির, চেয়ে দেখ, শিলাখণ্ডে আবিষ্ট আসীন
আমাদের সবার নমস্য, উনি প্রথম কৌন্তেয়
আমাদের, কুরু ও পাণ্ডব ভ্রাতাদের সর্ব জ্যেষ্ঠ
যুধিষ্ঠির : প্রথম কৌন্তেয় ?
দুর্যোধন : এখনো জানো না
যশস্বিনী জননী কুন্তীর তুমি
প্রথম সন্তান নও ?
যুধিষ্ঠির : জানি, হ্যাঁ, জেনেছি, তবে এমন সময়ে
যখন না জানা ছিল ভালো।
ভূপাতিত, স্থির নেত্র, প্রাণহীন সেই মহাবীর
যাঁকে আকৈশোর আমি চরম ঘৃণায়
ভয়ে ও বিদ্বেষে চিরশত্রু বলে মনে মনে জানি
তিনি পঞ্চ পাণ্ডবের সহোদর ? আমার অগ্রজ !
এই জানা কি কঠিনতম শাস্তি নয় ?
এ যেন মায়ের হাতে বিনা দোষে নির্দয় প্রহার !
দেবদূত : শান্ত হোন ! শান্ত হোন !
যুধিষ্ঠির : আমি দ্বিতীয় পাণ্ডব !
আমি সিংহাসন-অধিকারী নই, ভুল, সব ভুল
সকলই তো প্রাপ্য তাঁর, যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি বীর কর্ণ
তবে কেন এত হানাহানি, এত ব্যর্থ রক্তপাত
মহাকুরুক্ষেত্রব্যাপী আত্মীয়-বন্ধুর ছিন্ন শব

জায়া-জননীর হাহাকার !
ভাই দুর্যোধন, কী ভুল করেছি আমি, মিথ্যেই তোমাকে
স্বার্থান্বেষী, কূট ও কপট ভেবে, হৃদয়ে দিইনি স্থান
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো !

দুর্যোধন : ক্ষমার তো প্রশ্নই ওঠে না, ভাই, কারণ এখানে
কোনো ক্রোধ নেই
অনুতাপ, পরিতাপ অর্থহীন, কারণ এখানে
কেউ কারো শত্রু নয়
অসূয়া ও স্পর্ধাহীন অপার মিত্রতা
তারই নাম অবিমিশ্র সুখ, তারই নাম স্বর্গরাজ্য

দেবদূত : স্বর্গের সমস্ত সুখ বাসনা-সম্ভব
যার যার ইচ্ছেমত মুহূর্তে নির্মিত হবে গৃহ
কালস্রোত নেই তাই কোনো কিছু পুরোনো হয় না
রমণীরা সবাই স্বাধীনা, তারা স্বেচ্ছাপ্রণয়িনী
সম্পর্ক শৃঙ্খল নেই, অথচ প্রত্যেকে প্রত্যেকের ।
খাদ্য ও পানীয় সবই চোখের নিমেষ দিয়ে গড়া
এই সব কিছু আজ আপনার ভোগ্য, শুধু আগে
পবিত্র সলিলা মন্দাকিনী নদী স্পর্শ করে নিন ।
শরীর-চৈতন্য শুদ্ধ হবে ।

দুর্যোধন : যুধিষ্ঠির, মানবজীবনে যাঁকে প্রণাম করোনি
সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ, তাঁকে একবার
সম্ভাষণ না করেই চলে যাবে ?

[যুধিষ্ঠির সঙ্কোচ ও লজ্জায় উত্তর দিলেন না । এই সময় কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে ফিরলেন । জ্যোতির্ময় পুরুষ, তাঁর অঙ্গে কবচকুণ্ডল ফিরে এসেছে । কৌতুক-হাস্য মাখা মুখ ।]

কর্ণ : এসো যুধিষ্ঠির ।

[যুধিষ্ঠির তবুও নীরব]

দুর্যোধন : মনুষ্য শরীর, তাই এখনো যায়নি ওর
মানবিক দ্বিধা ।

কর্ণ : এসো যুধিষ্ঠির, স্বর্গে স্বাগতম্ তুমি
তোমার পায়ের স্পর্শে এই স্বর্গভূমি ধন্য হলো
আমার অনুজ, তবু চিরকাল তুমি
আমার শ্রদ্ধেয়
হে ধীমান, তুমি সকলের চেয়ে বড় বীর
ভূলোক-দ্যুলোক জয়ী তুমি

যুধিষ্ঠির : হে অগ্রজ, ক্ষমাপ্রার্থী আমি
দুর্যোধন : আগেই বলেছি ভাই, এখানে ক্ষমার প্রশ্ন নেই
ভূপৃষ্ঠের কর্মফল ভেবে আর উতলা হয়ো না
কর্ণ : পাথরে-কণ্টকে রুধিরাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত শরীর
আহা কত কষ্টে পার হয়েছো কঠিন হিমালয়
মানবকুলের শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী তুমি, সবার প্রণম্য
যাও, বিশ্রাম ভবনে।
দুর্যোধন : এখনো সম্পূর্ণ গ্লানি মুক্ত নয় যুধিষ্ঠির
তাই রুদ্ধবাক
দেবদূত, তুমি ওঁকে পুণ্য স্নানে নিয়ে যাও !

[যুধিষ্ঠির সত্যিই কর্ণের সামনে আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। দেবদূত তাঁকে নিয়ে চললেন নন্দনকাননের অন্য প্রান্তে।]

যুধিষ্ঠির : স্বর্গের এ সিংহদ্বারে রয়েছে আমারই দুই ভ্রাতা
আর কেউ নেই কেন ?
দেবদূত : সূক্ষ্মদর্শী যুধিষ্ঠির, এ প্রশ্ন সঠিক
এ এক অতুল কীর্তি, সশরীরে স্বর্গে পদার্পণ,
এর জন্য সুবিশাল সমারোহ, আনন্দ উৎসব
আয়োজিত হয়েছে এ স্বর্গভূমে আজ।
কিন্তু ইন্দ্র আর সব জ্যোতিরিন্দ্রগণ
অপেক্ষা করছেন কিছু দূরে !
যুধিষ্ঠির : কৌতূহল মার্জনা করুন, দেবদূত
কেন দূরে ? পুত্র অভিমন্যু, পিতামহ ভীষ্ম, জনক-জননী
এঁদের দেখার জন্য উতলা হয়েছি আমি। কিন্তু তাঁরা কেউ
অধমের জন্য ব্যস্ত নন বুঝি ? এই বুঝি স্বর্গের নিয়ম ?
দেবদূত : স্বর্গের নিয়ম নেই কিছু
এখানে রাজা ও প্রজা ভেদ নেই, প্রহরীও নেই
বাস্তব ও পরাবাস্তবতা কিছু নেই
শোষণ-শাসন নেই, তবু হানাহানি
নেই এ রাজত্বে, শুধু কল্পনার বাধাহীন লীলা।
পাণ্ডুপুত্র, আপনার পিতা ও পিতৃব্য, সন্তানাদি যত
সকলেই অধীর অপেক্ষারত রয়েছেন
স্বয়ং সস্ত্রীক ইন্দ্র, অন্যান্য দেবতাবৃন্দ ব্যাকুল প্রতীক্ষা নিয়ে
আছেন নন্দনকাননের অন্য প্রান্তদেশে।
সবাই জানেন আজ মহাত্মা কর্ণের অভিপ্রায়
তিনি এই সিংহদ্বারে সায়াহ্নবেলায়

প্রথম সাদর সম্ভাষণ জানাবেন দ্রৌপদীকে
কর্ণের সম্মানে তাই সকলেই কিছু দূরে সরে রয়েছেন।

যুধিষ্ঠির : দ্রৌপদী, আমার পত্নী, পুত্রের জননী....

দেবদূত : দ্রুপদনন্দিনী, যাজ্ঞসেনী
পৃথিবীর শেষতম ধ্বংসের নায়িকা
কথঞ্চিৎ নরক দর্শন সেরে তিনি আসবেন অচিরেই

যুধিষ্ঠির : বন্ধুর পার্বত্যপথে করেছি নিষ্ঠুর ভাবে যাকে পরিত্যাগ
যে আমার অত্যাগসহন
পঞ্চ পাণ্ডবের বক্ষমণি, সে আমার প্রাণাধিক
ত্রিলোকের সর্ব সুখ যার প্রাপ্য, সেই দ্রৌপদীকে
ভূমিশয্যা নিতে দেখে থামিনি একটুও, আমি
এমনই কঠিন।
এই নীতি নিষ্ঠা আজ তুচ্ছ মনে হয়
দেবদূত, আমি অনুতপ্ত, যেন সর্ব অঙ্গে সূচ
একটু দাঁড়াও, আমি পাণ্ডব বংশের
কুললক্ষ্মী, প্রতি মুহূর্তের স্মরণীয়া
দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে যাবো!

দেবদূত : এ কী কথা বলছেন, যুধিষ্ঠির!

যুধিষ্ঠির : অন্যায্য বলেছি কিছু দেবদূত?
দ্রৌপদী আমার পত্নী নয়? সে আমার
সঙ্গে যাবে, এটাই কি স্বতঃসিদ্ধ নয়?

দেবদূত : ধর্মরাজ, আপনার অবিদিত কিছু নেই
এমনই ধারণা ছিল। তবে কেন এ হেন বিভ্রম?
স্বর্গে পৃথিবীর কেউ কারো স্বামী কিংবা জায়া নয়
কেউ ভ্রাতা ভগ্নী নয়, সন্তান বা জন্মদাতা-দাত্রী নয়
নর-জীবনের সব সংস্কার মুছে দিতে হয়
এ যে চির যৌবনের রাজ্য, এই বিমূর্ত ভুবনে
প্রাক্তন সম্পর্ক যেন ছায়ামূর্তি, ধরা-ছোঁওয়া যাবে না কিছুতে
কর্ণ আজ দ্রৌপদীকে চেয়েছেন, এখানে অন্যের উপস্থিতি
মান্যযোগ্য নয় কোনোক্রমে। শুধু দুর্যোধন রয়েছেন
কর্ণের বয়স্য তিনি, দ্রৌপদীর দ্বিতীয় প্রণয়ী

যুধিষ্ঠির : আমার দক্ষিণ হাত অর্জুন কোথায়?
অর্জুন, অর্জুন!

দেবদূত : অর্জুন আসেননি, কিছু দেরি আছে
ঐ তো আসছেন, এসে পড়েছেন শ্রীময়ী দ্রৌপদী
নরক পেরিয়ে আসা, অঙ্গে কোনো গ্লানি-চিহ্ন নেই

যুধিষ্ঠির : দ্রৌপদী ! দ্রৌপদী !

[লঘু পায়ে স্বর্গদ্বার পার হলেন দ্রৌপদী। বহুবর্ণ প্রজাপতির মতন চঞ্চলা, স্বর্গে প্রবেশের জন্য ব্যস্ত। ছুটে নন্দনকাননের মধ্যে গিয়েও কর্ণ ও দুর্যোধনকে দেখে ফিরে দাঁড়ালেন।]

কর্ণ : পাঞ্চালী, কেমন আছো ? চিনতে পারো কি ?
স্বয়ম্বর সভাস্থলে যেমনটি ছিলে, ঠিক
তেমনই রয়েছো তুমি।

দ্রৌপদী : দানবীর কর্ণ ? চিনবো না কেন ? এই দিব্যকান্তি
কখনো কি ভুলে থাকা যায় ?
তুমিও পূর্বেরই মতো অভিমানে অনন্য রয়েছো।

দুর্যোধন : স্বাগত পাবক শিখা, দ্রুপদনন্দিনী
সামান্য নরকবাসে পাওনি তো তেমন যন্ত্রণা ?

দ্রৌপদী : ও কে, দুর্যোধন নয় ?
পারত্রিক কুশল তো ? না, না, আমি অত্যুত্তম আছি
নরক তেমন কিছু ভয়াবহ নয়, যে-রকম
রয়েছে রটনা।
নরকে সবাই বেশ লঘু ও আমোদপ্রিয়, খুবই সাবলীল
অনেকেই পরিচিত, কোনো অত্যাচার দেখিনি তো
এ যেন সবাই মিলে বনবাস, অচেনা ভুবনে
চেনা মুখ সম্মিলন

দুর্যোধন : এই স্বর্গে রয়েছেন কত দিব্যাঙ্গনা ও অপ্সরা
তবু তুমি, হে পাঞ্চালী, বিধাতার অপূর্ব নির্মাণ
তুমি এলে, স্বর্গ আরও আলোকিত হলো।

দ্রৌপদী : জানো নাকি এই স্বর্গ, এ আমার প্রাক্তন স্বদেশ
পৃথিবীতে অযোনিসম্ভূতা হয়ে কিছুদিন ভ্রমণে গিয়েছি
মানবলীলায় কিছু সুখ-শোক স্বাদ নেওয়া গেল
ফিরে এসে সব কিছু চেনা মনে হয়
পারিজাত পরিমলে সুস্নিগ্ধ বাতাস
এ ভূমির ধূলিকণা, প্রতিটি বৃক্ষের পাতা আমাকে চিনেছে।

[দ্রৌপদী ছুটে ছুটে গাছপালাদের আদর করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির কাতর ভাবে দূর থেকে দ্রৌপদীর নাম ধরে ডাকলেন, দ্রৌপদী শুনতে পেলেন না। বরং হাতছানি দিয়ে কর্ণকে ডাকলেন কাছে।]

কর্ণ : মানব জন্মের সব স্মৃতি তুমি অটুট এনেছো ?

দ্রৌপদী : সব নয়। তিক্ত-কটু-কষায়-কুৎসিত
স্মৃতিগুলি মুছে গেছে
স্মরণে রেখেছি শুধু মাধুর্য ও আনন্দের কথা

কর্ণ : স্বয়ম্বর সভাগৃহে আমাকে কঠোর প্রত্যাখ্যান
করেছিলে, তাও মনে নেই ?
তোমাকে প্রথম দেখা, সমস্ত দেখার শ্রেষ্ঠ দেখা
চকিতে মাথার মধ্যে শুরু হলো ঝড় ও অশনি
বিশ্ব চরাচর সব তুচ্ছ হয়ে গেল
চতুর্দিক অন্ধকার, যেন এক দ্বীপে শুধু তুমি
তুমি এক আলো দিয়ে গড়া মূর্তি, সত্য কিংবা মায়া
আমার চৈতন্যে শুরু হয়ে গেল তীব্র হাহাকার
মনে হলো, এক জন্মে আমার সমস্ত না-পাওয়ার
বিনিময়ে এই নারী, এ আমার, আর কারো নয়
লক্ষ্যভেদ অতি তুচ্ছ, প্রলয় সংহত করে আমি
এই বরবর্ণিনীকে পেতে চাই
আর তুমি ? আমার যোগ্যতা আছে কি না তার
প্রমাণও নিলে না ?
কটুবাক্যে ফেরালে আমাকে

দ্রৌপদী : প্রত্যাখ্যান করিনি তো, যৎসামান্য কৌতুক করেছি

দুর্যোধন : কৃষ্ণা, ভুলে গেলে, তুমি বলেছিলে, সূতজাতীয়কে
বরণ করবে না তুমি ?

কর্ণ : সামান্য মানবী নও তুমি, তবু তুচ্ছ জাত-পাত আর
বংশ পরিচয় মোহে ঢেকে নিলে মুখ
ব্যর্থ হলো আমার পৌরুষ !

দ্রৌপদী : ভেবেছি আঘাতে তুমি জ্বলে উঠবে দাবাগ্নির মতো
বীরশ্রেষ্ঠ, বাহুর দাপটে তুমি সকলকে প্রতিহত
করে দেবে, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণকুল ভয়ে মূর্ছা যাবে
সদর্পে হরণ করবে দয়িতাকে, আমি বীরভোগ্যা হবো ।

কর্ণ : সবলে নারীকে যারা পেতে চায়, তারা
প্রকৃত পৌরুষহীন, তারা ধিক !
ক্ষুধার্ত পশুরা চায় মাংসের শরীর
নারী যেন কাব্য রস, সুখদা স্বয়মাগতা হলে
অন্তরের রূপ খোলে, সেই রূপ পূর্ণ হয় প্রেমে
লক্ষ্যভেদ সেরে আমি তোমার সম্মুখে
প্রণয় প্রত্যাশী হয়ে দুরু দুরু বক্ষে দাঁড়াতাম

দ্রৌপদী : সূর্যপুত্র, সেদিন তোমাকে আমি নিমেষে চিনেছি
হাস্যমাখা ওষ্ঠ, চক্ষে ক্রোধ, তুমি চকিতে সূর্যের
দিকে চেয়েছিলে, মনে আছে, সব কথা মনে আছে !
সূর্যের সন্তান তুমি, প্রথম পাণ্ডব

আমার জন্মের গূঢ় মর্ম ছিল তোমার অজানা ?
ধৃষ্টদ্যুম্ন আর আমি, যজ্ঞের আগুন থেকে জাত
বড় বেশি অগ্নি আর তেজে গড়া, হৃদয়েও জ্বলন্ত আগুন
দ্রোণ আর দ্রৌণপন্থীদের ভস্মসাৎ করে দেওয়াই তো
আমার নিয়তি
দ্রোণ তোমাকেও দিয়েছেন শুধু অবহেলা, তিক্ত অপমান
তোমাকে পেতাম যদি, কর্ণ, তবে যুদ্ধের অনল
সহজেই নিবে যেত, সপার্ষদ ধ্বংস হতো কপট ব্রাহ্মণ
আমার পিতার ক্ষুব্ধ আত্মা শান্তি পেত

কর্ণ : এসব তো রাষ্ট্রনীতি, বংশের স্পর্ধার ইতিকথা
প্রণয়ের ব্যাকুলতা মহাকাল-ইতিহাস কিছুই মানে না
যাজ্ঞসেনী, তোমাকে চেয়েছি আমি
নিঃসঙ্গ এ হৃদয় জুড়োতে !

দ্রৌপদী : তুমি ফিরে গেলে তাতে আমিও কি প্রত্যাখ্যাতা নই ?
একটি বাক্যও তুমি বলোনি আমার দিকে চেয়ে
দু'চক্ষু অন্যত্রগামী । তুমি দাতা, সেই অহঙ্কারে
অর্জুনের হাতে তুলে দিয়ে গেলে কাম্য রমণীকে ।
কর্ণ, তবু সমস্ত জীবন আমি তোমাকে খুঁজেছি
ভেবেছি যে-কোনো দিন তুমি এসে দাঁড়াবে সহসা
কুন্তীর প্রথম পুত্র এবং আমার অগ্রগণ্য স্বামী হবে
শোনোনি কৃষ্ণের দৌত্যে আমার আহ্বান ?

কর্ণ : সে অনেক দেরি হয়ে গেছে
শুধুই জন্মের সূত্রে প্রণয়ের অংশভাগী হবো ?
কৃষ্ণ বহুদর্শী, তবু তার সে প্রস্তাব হাস্যকর !
তোমাকে দ্বিতীয় দেখি, একবস্ত্রা, দ্যূত ক্রীড়াপণ্যা, যেন দাসী
তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠি, নীচতা আক্রান্ত হয়ে আমি
তোমার উদ্দেশে বহু বিষময় কুকথা বলেছি
কিন্তু তা যে এক ব্যর্থ প্রণয়ীর গূঢ় আর্তনাদ
কেউ কি বোঝেনি ? কৃষ্ণা, তুমিও বোঝোনি ?

দুর্যোধন : স্ফুরিত অধরা, কৃষ্ণা, এখনো রয়েছে ক্রোধ বুঝি ?

দ্রৌপদী : না, না, কোনো ক্রোধ নেই । শুধু খেদ এই
যখন নীরব ছিল নতমুখে মহা শক্তিধর পঞ্চপতি
আশা ছিল, তখন কর্ণকে পাবো পাশে
যে আমার প্রথম প্রণয়ী !

কর্ণ : এখন তোমার পাশে, এত কাছে কখনো আসিনি
নীলোৎপল সৌরভমাখা বরতনু, এই সুচারুহাসিনী

নারী, তুমি, তুমি কি অলীক ?

[দ্রৌপদী হাত বাড়িয়ে কর্ণের অঙ্গ স্পর্শ করলেন। দূরে যুধিষ্ঠিরের মুখ বেদনায় কুঞ্চিত হয়ে গেল।]

দ্রৌপদী : কামনা বাসনাময়ী আমি এক নারী
আগুনে জন্মেছি তাই সর্ব অঙ্গে বড় বেশি জ্বালা

কর্ণ : দ্রৌপদী !

যুধিষ্ঠির : দ্রৌপদী !

[দ্রৌপদী এবার তাকালেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। ঈষৎ ভ্রুভঙ্গে হাসলেন। তারপর আবার ফিরলেন কর্ণের দিকে। দুর্যোধন একটু দূরে একটা শিলাখণ্ডে বসে পড়েছে।]

দ্রৌপদী : চলো, সখা, মন্দাকিনী সলিলে শরীর ধুয়ে নিই
আমার শ্রবণ উষ্ণ, চক্ষু উষ্ণ, শিরায় শিরায় দাবদাহ
আমার শৈশব নেই, তাই স্নেহ-মমতা জানি না
দেখিনি জননী ক্রোড়, তাই ঠিক মাতা হতে পারিনি কখনো
পায়ের আঙুল থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত যৌবনের আঁচ
আমি এরকম ভাবে গড়া
সেই আঁচ কিছুটা ভাসিয়ে দেবো স্বর্গনদী স্রোতে

কর্ণ : নদীকে যা দেবে তুমি, তা আমায় দাও
আমি প্রার্থী, আমি ধন্য হবো।

দ্রৌপদী : তুমি সূর্যপুত্র, তুমি আর কত আঁচ নিতে পারো ?

কর্ণ : এই নদী যত পারে, তার চেয়ে বেশি !

[দ্রৌপদী ততক্ষণে দৌড়ে চলে এসেছেন মন্দাকিনী তীরে। কর্ণ তার পাশে এসে দাঁড়াতেই দ্রৌপদী তাঁর দিকে জল ছুঁড়ে দিলেন। তারপর দু'জনেই খেলার কৌতুকে, নির্মল হাসিতে ভরিয়ে দিলেন দশ দিক।]

দেবদূত : এ কী ধর্মরাজ, আপনি অনড় প্রস্তরবৎ কেন
সম্মুখে চলুন, অতি বিশিষ্টরা প্রতীক্ষা-ব্যাকুল
ঢের দেরি হয়ে গেছে
পূর্বেই বলেছি, এই দৃশ্যখানি
আপনার না দেখাই ভালো ছিল, সুশোভন ছিল।

যুধিষ্ঠির : দেবদূত, আমি আর স্বর্গ অভিলাষী নই
ফিতে যেতে চাই

দেবদূত : এ কী অসম্ভব কথা। স্বর্গরাজ্য জয় করেছেন
সেই দার্ঢ্য, সেই কীর্তি, তার পুরস্কার চির স্বর্গসুখ

যুধিষ্ঠির : স্বর্গে কোনো স্বর্গসুখ নেই। সেই স্বপ্ন
আছে শুধু পৃথিবীতে। হায়, সব মিথ্যে হয়ে গেল !
হে সুভদ্র, আমাকে ফেরার পথ বলে দাও, কোন্ দিকে যাবো ?

দেবদূত : সশরীরে স্বর্গে তবু আসা যায়, ফেরে না তো কেউ

যুধিষ্ঠির : দ্রৌপদী, দ্রৌপদী !

দেবদূত : এ কী যুধিষ্ঠির, আপনার চোখে জল
ছি ছি, এই পুণ্যক্ষেত্রে ক্রন্দন করে না কেউ, দেখিনি কখনো
অশ্রুবিন্দু এখানে অচেনা, সে তো মর্ত্য, পৃথিবীর
লঘু দুর্বলতা

যুধিষ্ঠির : আমিও তো পৃথিবীর, আমিও মানুষ
হিংসা-ঈর্ষা-মোহ-মায়া সব কিছু মিলিয়ে মানুষ
ক্রোধ আছে, কান্না আছে, শরীরী নিয়ম সবই আছে

দেবদূত : ইন্দ্রের প্রসাদে
অচিরেই ইহলোক-চিহ্ন মুছে গিয়ে
দেবত্বে উন্নীত হয়ে অতি জ্যোর্তিময় কান্তি হবে আপনার

যুধিষ্ঠির : দেবত্ব চাই না আমি, আমাকে মানুষ থাকতে দাও
আমাকে মানুষ হয়ে বাঁচতে দাও
মানুষ, মানুষ !

[অদূরে কর্ণ ও দ্রৌপদীর জল খেলা ও প্রমোদের হাসি চলতেই থাকে। তার মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায় যুধিষ্ঠিরের কান্নার শব্দ।]

কাব্যপরিচয়

স্মৃতির শহর

চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬। কবিতা সংখ্যা ২৭, পৃষ্ঠা ৫৬, মূল্য ১৫.০০।
প্রথম সংস্করণ কলকাতা বইমেলা ১৯৮৩।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ: শ্রাবণী ও প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়কে।
বইয়ের প্রথমে লেখক জানিয়েছেন—

"এই বইয়ের ২১ থেকে ২৩ সংখ্যক কবিতা আমার পূর্ব প্রকাশিত 'দেখা হলো ভালবাসা বেদনায়' নামে একটি দীর্ঘ কবিতার কিছু অংশ। ২৫ সংখ্যক কবিতাটিও 'আমি ও কলকাতা' নামে 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' নামের কাব্যগ্রন্থে ছাপা হয়েছে। বিষয়-সাযুজ্যের জন্য ওই রচনা এই বইতে আনা হল। বাকি সব কবিতা নতুন। পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় যাবার পর জানতে পারলুম বন্ধুবর শামসুর রাহমন-এর এই নামে একটি বই আছে। তবে সে বইটি গদ্যে, ঢাকা শহর বিষয়ে এবং কিশোরদের জন্য। আশাকরি এ কারণে কোনো অসুবিধে হবে না।"

'দেখা হলো ভালবাসা বেদনায়' কবিতাটি ওই নামাঙ্কিত কাব্যগ্রন্থে—কবিতা সমগ্র ২-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'আমি ও কলকাতা' কবিতাটিও 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' নামের কাব্যগ্রন্থে—কবিতা সমগ্র ১-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।'

সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে

দ্বিতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৩৯৯। কবিতা সংখ্যা ৪৩ । পৃষ্ঠা ৬৪। মূল্য ১৫.০০।
প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৯২।
প্রচ্ছদ: সুনীল শীল। উৎসর্গ: শামসুর রাহমান বন্ধুবরেষু।

বাতাসে কিসের ডাক, শোনো

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৭। কবিতা সংখ্যা ৩৭, পৃষ্ঠা ৫৬, মূল্য ১০.০০।
প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন। উৎসর্গ: দীপা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-কে।
বইয়ে একটি ভূমিকা আছে:

"আমার আগের কবিতার বইটি বেরিয়েছিল ঠিক দু' বছর আগে। এই বইয়ের কবিতাগুলি সবই প্রায় হালফিলের লেখা। শুধু 'রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা' কবিতাটি ১৯৬০ সালে রচিত ও প্রকাশিত, আগে কোনো বইতে যায়নি, এখানে রাখা হলো নিছক একটি স্মৃতি-মমতাবশতঃ। এ ছাড়া সম্প্রতি হঠাৎ কৃত্তিবাস পত্রিকার ১৩৬৯ সালের চৈত্র সংখ্যাটি

আমার হাতে আসে। সংখ্যাটি এখন দুর্লভ। ঐ সংখ্যায় আমি অ্যালেন গীনস্‌বার্গের দুটি কবিতার অনুবাদ করেছিলাম। কলকাতার একটি অতি সস্তার হোটেলের স্যাঁতসেঁতে ঘরে অ্যালেনের সামনে বসেই এই আক্ষরিক অনুবাদ-কর্ম সম্পন্ন হয়েছিল, মনে পড়ে। অনুবাদ-কবিতাদুটি যাতে একেবারে হারিয়ে না যায় সেই জন্যই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলো।"

নীরা, হারিয়ে যেও না

দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ১৯৯১। কবিতা সংখ্যা ৩১। পৃষ্ঠা ৬৪। মূল্য ১৫.০০।
প্রথম সংস্করণ বইমেলা ১৯৮৯।
প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন। উৎসর্গ: রফিক আজাদ প্রিয়বরেষু।

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯১। কবিতা সংখ্যা ৪২। পৃষ্ঠা ৬৪। মূল্য ১৫.০০।
প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী। উৎসর্গ: বনি রায় ও কল্যাণ রায়-কে।

রাত্রির রঁদেভু

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫। কবিতা সংখ্যা ৪৪। পৃষ্ঠা ৭৪। মূল্য ২৫.০০।
উৎসর্গ: সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়-কে।

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
অতসী ফুল-রঙা ভোর,...	অপু	সুন্দরের মন খারাপ...	১৯৮
অনেক গোপন কথা আছে	মাত্র এই এক জীবনে	বাতাসে কিসের ডাক...	১০৮
অনেকখানি খোলা আকাশের...	উদ্যত ছুরি	সুন্দরের মন খারাপ...	১৯৫
অন্ধ, গলা-ভাঙা, অভিমানী	অন্ধ, গলা-ভাঙা,...	সাদা পৃষ্ঠা...	৬৯
অপরূপের নিভৃত নির্মাণের...	দেরি করা যাবে না	বাতাসের কিসের ডাক...	১১০
অর্জুন বৃক্ষটি থেকে একটি...	অন্য কেউ দেবে	বাতাসে কিসের ডাক...	৯৭
আংটির ভেতরে চাঁদ, সেই...	নিজস্ব বৃত্তে	রাত্রির রঁদেভু	২৫৬
আঙুল পুড়িয়ে মোম, একি...	দু'দিক জ্বালানো মোম	নীরা হারিয়ে যেও না	১৪৪
আকাশে এত নান্দনিক আলো...	সমুদ্রের এপারে...	নীরা হারিয়ে যেও না	১৪৯
আজ বহুদূর এসে কংক্রিট...	দিগন্ত কি কিছু কাছে	বাতাসে কিসের ডাক...	১০৯
আজ সারাদিন একটাও কথা...	আজ সারাদিন	নীরা হারিয়ে যেও না	১২৮
আটচল্লিশ হঠাৎ ঝাঁপ দিল...	স্মৃতির শহর ১৯	স্মৃতির শহর	৩৪
আত্মপ্রকাশ উপন্যাসখানা...	কবিতা গদ্য	রাত্রির রঁদেভু	২২৮
আমরা এ কোন ভারতবর্ষে...	আমরা এ কোন...	সাদা পৃষ্ঠা...	৬৮
আমরা কথা বলছি	এই আমাদের প্রেম	নীরা হারিয়ে যেও না	১২৯
আমরা যারা এই শহরে...	স্মৃতির শহর ২৩	স্মৃতির শহর	৩৮
আমাকে টান মারে রাত্রি-জাগা...	স্মৃতির শহর ১	স্মৃতির শহর	১৩
আমার ডান হাতের আঙ্গুলে...	তার আগে, আর আগে	বাতাসে কিসের ডাক...	১১৩
আমার দূরত্ব সহ্য হয় না...	নীরাকে দেখা	নীরা হারিয়ে যেও না	১২৭
আমার নিজস্ব শূন্যতা একটা...	মালা	সুন্দরের মন খারাপ	২০০
আমাদের ছিল প্রতিদিন...	নীরা, হারিয়ে যেও না	নীরা হারিয়ে যেও না	১২৯
আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের...	শিল্প-সমালোচক	সাদা পৃষ্ঠা	৭২
আমি এখনো কোনো পাখির...	নিজস্ব ভাষা	রাত্রির রঁদেভু	২৪১
আমি বন্দুক-পিস্তল ছুঁইনি...	প্রতিদ্বন্দ্বীরা	সুন্দরের মনখারাপ	১৯২
আমি পের লাসেজে...	আপলিনেয়ারের সমাধিতে	বাতাসে কিসের ডাক...	১২০
আর কিছু নয়, দু আঙুলের...	দাও সামান্য	বাতাসে কিসের ডাক...	৯৪
আরও একটু সামনে যেতে...	যার জন্য সারা জীবন	নীরা হারিয়ে যেও না	১৬৮

আসুন এই নদীর ধারে আমরা...	আশ্চর্য নদী	নীরা হারিয়ে যেও না	১৪৫
ইচ্ছেটাকে মোমের আলোর...	দাও	সুন্দরের মন খারাপ	১৮৫
উত্তর চল্লিশে হলো দেখা	স্মৃতির শহর ১১	স্মৃতির শহর	২৮
এ কোন নতুন দেশে বেড়াতে...	এলেম নতুন দেশে	সাদা পৃষ্ঠা...	৬২
এ ঘরের ভুল ওঘরে লুকিয়ে...	সরল গাছের ছায়া	বাতাসে কিসের ডাক	১১২
এ পৃথিবী জানে কারো কারো...	এ পৃথিবী জানে	সাদা পৃষ্ঠা	৮১
এই নাও আমার সমস্ত দৃষ্টিপাত	উৎসর্গ	সাদা পৃষ্ঠা	৫৩
এই পাহাড়ের আড়ালেই একটা...	সীমান্ত কাহিনী	সুন্দরের মন খারাপ	২০৬
এই প্রান্তরের উড়াল ছাড়িয়ে...	ডাকপুরুষের দর্পণ	সাদা পৃষ্ঠা	৫৭
এক এক দিন সুনিশ্চিত চোখ...	এক এক দিন	সাদা পৃষ্ঠা	৭৩
এক এক রকম অন্যায় আছে...	তবু আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা	বাতাসে কিসের ডাক...	৯১
এক একটা সুন্দর রাস্তায়...	স্থির চিত্র	সাদা পৃষ্ঠা	৭১
এক পশলা বৃষ্টি খেয়ে বেড়াতে...	বর্ষণমালা	রাত্রির রঁদেভু	২২০
এক পুলিশের দুই ছেলে	ছেলে মেয়েদের গল্প	রাত্রির রঁদেভু	২৫৫
এক মনোহরণ সকালবেলায়...	মানুষ রইলে না	বাতাসে কিসের ডাক	১০৯
এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে...	শেষ কথা	সুন্দরের মন খারাপ	১৮৩
একই বাড়িতে থাকি সবাই...	এইভাবেই প্রতিদিন	রাত্রির রঁদেভু	২৫৬
একজন দেখলো শুশুনিয়া...	দুটি মুখ	সাদা পৃষ্ঠা...	৬০
একজন মানুষ খোলা আকাশের...	এক বিশ্বব্যাপী...	বাতাসে কিসের ডাক...	৯৯
একটি বিন্দু হীরকদ্যুতি...	একটি বিন্দু হীরকদ্যুতি	নীরা হারিয়ে যেও না	১৪১
একটা ডালপালা মেলা গাছের...	আমার আমি	রাত্রির রঁদেভু	২৫৪
একটা প্রচণ্ড পরিব্যাপ্ততা...	এই সব দেখেশুনে	বাতাসে কিসের ডাক...	৯৮
একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা...	একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা	রাত্রির রঁদেভু	২৩৮
একদিন কেউ এসে বলবে	স্মৃতির শহর ১৫	স্মৃতির শহর	৩০
একবার চোখে চোখ, তারপর...	আমায় সে চিনেছিল,...	রাত্রির রঁদেভু	২১৯
একে একে নষ্ট করে চলে...	স্মৃতির শহর ২৪	স্মৃতির শহর	৪০
এখানে আগুন বেশ তরমুজের...	এই দৃশ্যে	নীরা হারিয়ে যেও না	১২৭
এত ফুল, এর কোনটাই...	মানুষের জন্য নয়	সাদা পৃষ্ঠা...	৮১
এত সুন্দর	তবু তোর নামে	সুন্দরের মন খারাপ	১৮৭
এদিকে ওদিকে বিপন্ন ঘরবাড়ি	যাওয়া না যাওয়া	সাদা পৃষ্ঠা...	৪৭
এবারের শীতে নিরুদ্দেশের...	এবারের শীতে	সাদা পৃষ্ঠা...	৬৬
এমনই রোদের তাপ,...	জ্বর	সাদা পৃষ্ঠা...	৬০
এলোমেলো বাতাসে ঘুরছে...	আমাকে যেতে হবে	রাত্রির রঁদেভু	২৪৪
এমন বাড়ি, দেওয়াল ভরা গর্ত	শব্দ ভাঙে	সুন্দরের মন খারাপ	১৯৪
এসো	শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত	সুন্দরের মন খারাপ	২১১
ওগো পরজন্ম, ওগো প্রিয়...	যৎসামান্য	সুন্দরের মন খারাপ...	১৭৯

ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরছে...	পিঁপড়ের এপিটাফ	বাতাসে কিসের ডাক...	১০৭
ওয়েলিংটনের মোড়ে গোল...	আমাদের সক্রেটিস	সাদা পৃষ্ঠা...	৫০
ওরা মেতে আছে কিসের...	বলে দিতে পারি স্পষ্ট...	রাত্রির রঁদেভু	২২৭
ওরে ও কুসুম বনের সাপ, একটু	পাগলে পাগলে খেলা	নীরা হারিয়ে যেও না	১৬২
কত না সহজ ভাবা গিয়েছিল	কত না সহজ বলে	সাদা পৃষ্ঠা...	৬৪
কফি হাউসে বসে আমরা...	স্মৃতির শহর ২০	স্মৃতির শহর	৩৪
কবিতা লেখার জন্য নদী আছে	ঋণ থাকে	সাদা পৃষ্ঠা...	৭০
কলকাতা আমার বুকে বিষম...	স্মৃতির শহর ২৫	স্মৃতির শহর	৪০
কাঁখে গাগরী, চলেছে নাগরী...	নির্মাণ খেলা—তিন	রাত্রির রঁদেভু	২৫০
কাঠের আগুন নিবু নিবু...	সে আর ফিরলো না	সুন্দরের মন খারাপ...	১৯৮
কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো...	আর যুদ্ধ নয়	সাদা পৃষ্ঠা...	৬৫
কারুর আসার কথা ছিল না	স্বপ্নের অন্তর্গত	সাদা পৃষ্ঠা...	৬৪
কিংশুক থেকে খসে পড়ছে রং	জন্মদাগ	সুন্দরের মন খারাপ	২১৩
কেন রবীন্দ্রনাথকে তুমি...	তিনি এবং আমি	নীরা হারিয়ে যেও না	১৩৯
কৈশোর ভেঙেছে তার একমাত্র...	স্মৃতির শহর ২২	স্মৃতির শহর	৩৮
কোনোদিন যে ভোর দেখে না...	দর্পণের মধ্যে	নীরা হারিয়ে যেও না	১৪০
কোলের ওপরে মাথা...	এ জন্মের উপহার	রাত্রির রঁদেভু	২৪৭
খাবি তো খা, খ! আর না...	বীজমন্ত্র	সুন্দরের মন খারাপ...	১৮৯
গঙ্গা তীরে এক তীর্থক্ষেত্রে...	দুই কবি...	সাদা পৃষ্ঠা...	৮২
গাছের ডাল ভাঙে, শুকনো...	একটি পাতা খসা	রাত্রির রঁদেভু	২৩১
ঘর শব্দটি কবিতার মধ্যে...	আঙুলের রক্ত	সাদা পৃষ্ঠা...	৫১
ঘাটের পৈঠায় বসে আছে...	বিকেলের বর্ণফেরা	নীরা হারিয়ে যেও না	১৭০
চলন্ত ট্রেন থেকে দেখা...	লালধুলোর রাস্তা	রাত্রির রঁদেভু	২৪৫
চাঁদের নীলাভ রং, ওইখানে...	নীরা তুমি কালের...	বাতাসে কিসের ডাক...	৯৮
চাঁপা গাছটি যুবতী না বুড়ি	সময়ের চিহ্নগুলি...	রাত্রির রঁদেভু	২৪০
চীনে পাড়ায় আমাদের বন্ধু...	স্মৃতির শহর ১০	স্মৃতির শহর	২৪
চোখে লেগেছিল কুমারী...	স্মৃতির শহর ১৮	স্মৃতির শহর	৩৩
চোখের সামনে এত আঠা...	আর কিছু না	সুন্দরের মন খারাপ...	১০৮
ছাতুবাবু বাজারের চড়কের...	স্মৃতির শহর ৪	স্মৃতির শহর	১৭
ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকার নিয়ে খেলা...	আরও গভীরে	নীরা হারিয়ে যেও না	১৪৫
ছোটখাট ঘুম ছড়িয়ে রয়েছে...	এত সহজেই	সাদা পৃষ্ঠা...	৭৮
জলকে ভয় কি, জল তো শুধুই...	জলকে ভয় কি...	রাত্রির রঁদেভু	২৩৮

জানলা ছুঁয়ে একটুখানি দেখিয়ে...	স্মৃতির শহর ৭	স্মৃতির শহর	২২
জানলার কাছে এসে ঝাপটা...	বাল্যস্মৃতির ঠোঁট	সুন্দরের মন খারাপ...	২১২
জোব চার্ণকের সমাধির ওপর...	স্মৃতির শহর ২৭	স্মৃতির শহর	৪২
টিলার ওদিক থেকে উঠে এলে...	মুহূর্তের দেখা	সাদা পৃষ্ঠা...	৪৮
টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে...	টেবিলগুলো জায়গা...	সুন্দরের মন খারাপ...	১৮৮
ট্রেন এলে চলে যাব, ততক্ষণ...	রামগড় স্টেশানে সন্ধ্যা	বাতাসে কিসের ডাক...	১১৬
ট্রেনে ধূপ বিক্রি করতে উঠলো...	বসুধৈব	নীরা হারিয়ে যেও না	১৩৮
ঠাণ্ডা ঘরে রিভলভিং চেয়ারে...	দুটি আহ্বান	নীরা হারিয়ে যেও না	১৬৪
তারপর একজন উঠে গেল...	জলের মধ্যে মিশে...	বাতাসে কিসের ডাক...	১১১
তালগাছের ডগায় শিরশির...	নির্মাণ খেলা	সুন্দরের মন খারাপ...	১৭৯
তুমি নিজের দেশের জন্য প্রাণ...	নিজের মাথার বালিশ	সুন্দরের মন খারাপ...	১৯৩
তুমিও তোমার বন্ধু, বন্ধুদের তুমি	অদৃশ্য কুসুম	সুন্দরের মন খারাপ...	১৯০
তেলীপাড়া লেনের ভুতের...	স্মৃতির শহর ৯	স্মৃতির শহর	২৩
তোমার এতই ভালো লাগছে...	মন্ত্র	নীরা হারিয়ে যেও না	১৭০
তোমার পায়ে কাঁটা ফুটেছিল...	কাঁটা	সুন্দরের মন খারাপ...	২১৩
দগ্ধ মাটির গর্ভ থেকে ফুটে...	সারা জীবন	নীরা হারিয়ে যেও না	১৩৭
দমকা হাওয়ায় এক ঝাঁক...	আর একরকম জীবন	সাদা পৃষ্ঠা...	৬২
দরজায় ঝনঝন শব্দ হলে ছুটে...	দরজার আড়ালে	সুন্দরের মন খারাপ...	২০৮
দীপেন বলে গেল জলটুঙ্গিতে...	স্মৃতির শহর ৫	স্মৃতির শহর	১৮
দু' আঙুলে নুন তোলার মতো...	অধরা	সুন্দরের মন খারাপ...	২০২
দুপুরে শুনশান হয়ে পড়ে থাকে...	স্মৃতির শহর ২	স্মৃতির শহর	১৬
দেয়ালই ছিল না ফাটলের কথা...	বান্ধবগড়ে ধ্বংসস্তূপে	বাতাসে কিসের ডাক...	৯৬
দেয়ালে নোনা দাগ মেঘের...	দেয়ালে নোনা দাগ	সাদা পৃষ্ঠা...	৭৪
দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া রাস্তার...	রূপকল্প	সুন্দরের মন খারাপ...	২০৯
ধরা যাক আজ থেকে আমি...	হাত	নীরা হারিয়ে যেও না...	১৩৪
নদী বন্ধন উদ্বোধনে এসেছেন...	অর্ধনারীশ্বর	সাদা পৃষ্ঠা...	৫৪
নদীটিকে বুকে তুলে নাও	শুধু যে হারিয়ে গেছে	বাতাসে কিসের ডাক...	১০৪
নদীটির নাম সাসকাচুয়ান	নদীমাতৃক	সাদা পৃষ্ঠা...	৭৬
নদীর কিনারে ছিল মাটির...	কৈশোরের ঘরবাড়ি	সাদা পৃষ্ঠা...	৫৩
না-লেখা কবিতাটির একটি শব্দ...	আবছায়াময় কেল্লার...	সুন্দরের মন খারাপ...	২০৫
নিছক জ্যোতিষী বলেই তুমি...	তোমার হাত	রাত্রির রঁদেভু	২৩৯
নিরালা নদীর প্রান্তে পড়ে আছে	নদী জানে	সাদা পৃষ্ঠা...	৭২
নীল রঙের গাড়িতে যে...	এক পলক অতীত	রাত্রির রঁদেভু	২৫২

নৌকোর গলুইতে পা ঝুলিয়ে...	স্মৃতির শহর ২১	স্মৃতির শহর	৩৫
পথটা যেখানে সমতল ছেড়ে...	দেখা হলো না	নীরা হারিয়ে যেও না	১৪৮
পশ্চিমের অবনত সন্ধ্যায় এক...	সে আসবে, সে আসবে	নীরা হারিয়ে যেও না	১৬৮
পাট পচা পাংশু জলে স্নান...	এক ঝলক	বাতাসে কিসের ডাক...	৯২
পাতলা কাচের গেলাশে জল...	স্মৃতির শহর ২৬	স্মৃতির শহর	৪১
পাঞ্জাবে রোজ খুন-খারাপি...	নীরা, গৌতমবুদ্ধ	বাতাসে কিসের ডাক...	১০৬
পাহাড় বিভঙ্গ করে উড়ে যায়...	সমস্ত শরীরময়	সুন্দরের মন খারাপ...	১৮৩
পাহাড় ভেঙে ভেঙে রাস্তা...	আমার নয়	সাদা পৃষ্ঠা...	৭৯
পিঠে এত অস্ত্রের আঘাত...	ব্যক্তিগত ইতিহাস	রাত্রির রঁদেভু	২৩৩
পিঠের চামড়ায় একটু একটু...	আড়ালে আড়ালে	বাতাসে কিসের ডাক...	৮৯
পুরনো দুঃখগুলো আজকাল...	স্মৃতির শহর ১২	স্মৃতির শহর	২৯
পৌঁছনো যাবে না ভেবে বাড়ি...	দ্বিধা	বাতাসে কিসের ডাক...	১১৩
প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি...	মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে...	বাতাসে কিসের ডাক...	১১৫
প্রশ্ন করলেই তুমি প্রশ্ন...	একটা উত্তর দাও	সাদা পৃষ্ঠা...	৫৯
প্রণামের ছলে খুব কাছে...	তিনটি প্রশ্ন	রাত্রির রঁদেভু	২৪৮
প্রথমে বন্দনা করি শুদ্ধ অন্ধকার	এক বিরহী ও...	রাত্রির রঁদেভু	২৩০
প্রয়োজনের মধ্যে বারুদ...	ভালোবাসতে চাই	বাতাসে কিসের ডাক...	১৪৪
ফিরে এসো ফিরে এসো,...	ফেরা না ফেরা	সাদা পৃষ্ঠা...	৭৯
বকুল গাছের নীচে যার জন্য...	বকুল, বকুল, কথা বলো	নীরা হারিয়ে যেও না	১৬৩
বাঁশি বাজানো শিখতে শুরু...	আত্মজীবনীর খসড়া	নীরা হারিয়ে যেও না	১৬৬
বাক্স ভর্তি একটা পারিবারিক...	ছবির মানুষ	সাদা পৃষ্ঠা...	৭৪
বাগানে নাম-না-জানা আগাছার...	কোথায় আমার দেশ	রাত্রির রঁদেভু	২৪৬
বাড়ি ফেরার পথে এখন আর...	আমি আসছি, আসছি	বাতাসে কিসের ডাক...	১১২
বারুদ রঙের এক বাড়ি, তার...	মুহূর্তের অস্থিরতা	রাত্রির রঁদেভু	২৪২
বিকেলের গা চুঁইয়ে গড়িয়ে...	দেরি	বাতাসে কিসের ডাক...	১১১
বিকেলের সাদা মেঘে নির্জন...	সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া...	সুন্দরের মন খারাপ...	২০৪
বুকের মধ্যে একটু আধটু দুঃখ...	দিব্যি আছি	সাদা পৃষ্ঠা...	৭৫
'বেণুবনে' বয়ে গেল হিল্লোল...	যারা হারিয়ে গেছে	রাত্রির রঁদেভু	২১৯
ব্রিজের ওপর থেকে নদী দেখা...	ব্রিজের ওপর থেকে নদী	বাতাসে কিসের ডাক	১০৬
ভাতের থালায় এত কাঁটাঝোপ...	ভাত	সুন্দরের মন খারাপ...	১৮১
ভালোবেসে সেই ভালোবাসাকে...	দেখা হলো কি দেখা...	নীরা হারিয়ে যেও না	১৩৫
ভুল স্টেশানে নেমে গেল...	ভুল স্টেশানে	রাত্রির রঁদেভু	২৪৭
ভেবেছিলাম অভ্র-আড়াল,...	ঘোরায় কেন একটি বিন্দু	বাতাসে কিসের ডাক...	১০৫
ভ্রমর ভ্রমর! কেন মনে হয়...	রাজসভায় মাধবী	নীরা হারিয়ে যেও না	১৪৯
মধ্যরাত্রির খটখটে জেগে ওঠার...	স্মৃতির শহর ৮	স্মৃতির শহর	২২
মনে করো এখানে কিছুই নেই...	চণ্ডালডাঙা	সাদা পৃষ্ঠা...	৫৬

মনে করো তুমি মধ্যরাত্রি...	একবার বুকখালি করে...	রাত্রির রঁদেভু	২৪৫
মনে পড়ে সেই সব গলি-ঘুঁজি...	তস্য গলি	সুন্দরের মন খারাপ...	২১০
মনে পড়ে সেই সুপুরি গাছের...	সাঁকোটা দুলছে	রাত্রির রঁদেভু	২২৩
মাঠের ভিতরে এত পরিশুদ্ধ...	স্মৃতির শহর ৬	স্মৃতির শহর	২১
মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখি...	পিছুটান	বাতাসে কিসের ডাক...	৯১
মাঝে মাঝে পূর্বপুরুষদেরও...	মাদারির খেলা এই...	নীরা হারিয়ে যেও না	১৩৫
মানুষের পাশাপাশি পাখি ও...	কতদূরে	বাতাসে কিসের ডাক...	১১৫
মেল ট্রেন থেকে নেমেই...	ফেরা	নীরা হারিয়ে যেও না	১৩৩
যখন তার বয়েস একুশ	স্টিফেন হকিং-এর প্রতি	রাত্রির রঁদেভু	২৫১
যদি কবিতা লিখে মাঠ-ভর্তি...	স্মৃতির শহর ১৪	স্মৃতির শহর	৩০
যুধিষ্ঠির: এই স্বর্গ	নন্দনকাননে দ্রৌপদী	রাত্রির রঁদেভু	২৫৯
যাও নতুন উপনিবেশে, নতুন...	বীর্য	বাতাসে কিসের ডাক...	৯৩
যাবে	বাতাসে কিসের ডাক,...	বাতাসে কিসের ডাক...	৯৫
যারা খুব কাছাকাছি তাদের...	কাছাকাছি মানুষের	বাতাসে কিসের ডাক...	৯২
যে আগুন দেখা যায় না...	যে আগুন দেখা যায় না	সাদা পৃষ্ঠা...	৭৮
যে গ্রামে আজি জন্মেছিলাম,...	অলীক মানুষের সন্তান	রাত্রির রঁদেভু	২২২
যেদিকে যাবার কোনো পথ নেই...	দু'চারটে পলাতক	সাদা পৃষ্ঠা...	৬৫
রজতশুভ্র রোদ্দুরের মধ্যে ঐ...	আমায় ডাকছে	বাতাসে কিসের ডাক...	১০৫
রতিকৌতুকে দোলে চন্দ্রমা...	নির্মাণ খেলা: দুই	রাত্রির রঁদেভু	২২৫
রবীন্দ্রনাথ সঠিক বলে...	একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে	সুন্দরের মন খারাপ...	২১৪
রাত্তিরে আড়িয়াল খাঁ-র গর্জনে...	জল যেন লেলিহান...	নীরা হারিয়ে যেও না	১৪১
রেল লাইনে মাথা পেতে যে...	সে	সাদা পৃষ্ঠা...	৮১
শনিবার, ৩১শে অক্টোবর,...	হায় ধর্ম	রাত্রির রঁদেভু	২৩৪
শব্দ যাকে ভাঙে তাকে তুলোর...	শব্দ যাকে ভাসায়	সাদা পৃষ্ঠা...	৪৭
শালিক পাখিটি বললো,...	ছবি	সুন্দরের মন খারাপ...	২০০
শালুক-বিল ইস্টিশানে থেকে...	থেমে থাকা যাত্রী	সুন্দরের মন খারাপ...	২০৩
শিল্পে গড়া আঙুল, তাই...	শিল্প নয়। তোমাকে চাই	রাত্রির রঁদেভু	২৫৩
শুকনো ডালে দুলছে আলোয়...	বুকের কাছে	রাত্রির রঁদেভু	২৪৯
শুকনো নদীতে ছিল দুঃখ	জ্বলতে থাকে আগুন	সুন্দরের মন খারাপ...	১৯০
শুধু শুধু কত যে সময় নষ্ট...	চলে যাবো	রাত্রির রঁদেভু	২৫৮
শ্রাবণ সন্ধ্যায় তুমি, তুমি পূর্ণ...	তুমি	রাত্রির রঁদেভু	২৩২
সকালবেলায় সেই দূত এলো...	ডানা-বদল	সুন্দরের মন খারাপ...	১৯৬
সকালবেলাতেই ঝড় বৃষ্টির...	ঝড়বৃষ্টির এমন হুল্লোড়	রাত্রির রঁদেভু	২৩১
সদ্য-তরুণটির প্রথম কবিতার...	স্মৃতির শহর ১৭	স্মৃতির শহর	৩২
সন্ধে নিচু হয়ে এসেছে,...	অরফিউস	সুন্দরের মন খারাপ...	১৮০

সবাই বললো, সামনে একটা...	সবাই বললো	সুন্দরের মন খারাপ...	১৮৬
সরল নির্জন রাস্তা মধ্যরাতের	অভিসার	রাত্রির রঁদেভু	২২৫
সরস্বতী হাইস্কুলের পেছনের...	স্মৃতির শহর ১৬	স্মৃতির শহর	৩২
সস্তায় পেলেন তাই যমজ...	স্মৃতির শহর ৩	স্মৃতির শহর	১৬
সাঁজোয়া গাড়ির সামনের দিকে...	সাঁজোয়া গাড়ির...	রাত্রির রঁদেভু	২৪২
সাতটা পঁচিশে তুমি নেমে এলে...	আমাদের কৈশোরের	নীরা হারিয়ে যেও না	১৪৩
সাদা দেওয়ালের সামনে...	সাদা দেওয়াল	সুন্দরের মন খারাপ...	১৯৯
সাদা পৃষ্ঠা তুমি এক দৃষ্টিতে...	সাদা পৃষ্ঠা	সাদা পৃষ্ঠা...	৫৫
সাড়ে পাঁচ বছর বয়সী মেয়েটির...	শান্তি শান্তি	বাতাসে কিসের ডাক...	১১০
সারা জীবন খোঁড়াখুড়ির...	একমাত্র উপমাহীন	সাদা পৃষ্ঠা...	৮০
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে...	রাশিয়ান রুলেৎ	নীরা হারিয়ে যেও না	১৪৮
সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল...	রাত্রির রঁদেভু	রাত্রির রঁদেভু	২২৭
সিমলে পাড়ার ছেলে নরেন...	কে কাকে টানছে	সুন্দরের মন খারাপ...	২০১
সীমান্ত এলাকার মানুষ গদ্যে...	স্মৃতির শহর ১৩	স্মৃতির শহর	২৯
সুদীর্ঘ সরল একটা সুড়ঙ্গের...	সুড়ঙ্গের ওপাশে	সাদা পৃষ্ঠা...	৬৭
সুন্দরের মন খারাপ,...	সুন্দরের মনখারাপ	সুন্দরের মন খারাপ...	২০৪
সেঁজানো গীনস্‌বার্গ, আমি...	মেস্কালীন	বাতাসে কিসের ডাক...	১১৭
সেই উজ্জ্বল দিনের শিয়র...	তাকে ঐ দিনটি দাও	সাদা পৃষ্ঠা...	৪৯
স্বপ্ন দেখার রাত, আচমকা...	এক জীবনে	রাত্রির রঁদেভু	২৩৩
স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি...	স্বয়মাগতা	বাতাসে কিসের ডাক...	৯৩
স্বাধীনতা শব্দটি কৈশোরে...	স্বাধীনতার জন্য	সাদা পৃষ্ঠা...	৫১
স্টেশন থেকে বেরিয়েই...	এত চেনা	রাত্রির রঁদেভু	২৫৮
স্টেশানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন...	পালাতে পারবে না	সাদা পৃষ্ঠা...	৭১
হাত ধরতে বলো, স্বেচ্ছায়...	এক বন মানুষ	রাত্রির রঁদেভু	২৫৭
হামবুর্গ শহরের অদূরে...	মৃত্যু থমকে গেছে...	সুন্দরের মন খারাপ...	১৯১
হিরণ্ময় পাত্রখানি এতটা উত্তপ্ত	হিরণ্ময় পাত্রখানি	সাদা পৃষ্ঠা...	৫৮
হে উদ্ভিন্ন চিৎকমল, শান্ত হও	অসীমের করতলে	সুন্দরের মন খারাপ...	১৮২
হে প্রিয়, হে নির্বাক কুসুম...	হে অদৃশ্য সকল...	সুন্দরের মন খারাপ...	১৭৫